

সাধারণ বিজ্ঞান

সপ্তম শ্রেণী



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

প্রথম অধ্যায়

তাপ

তাপ আমরা দেখতে পাই না। তাপের ওজন, রং বা গন্ধ নেই। কিন্তু তাপের অস্তিত্ব আমরা অনুভব করতে পারি। তুমি যদি রোদে যেয়ে দাঁড়াও, গরম অনুভব করবে। এক খণ্ড বরফকে স্পর্শ কর, ঠাণ্ডা অনুভব করবে। যে বাহ্যিক কারণে ঠাণ্ডা বা গরমের অনুভূতি হয়, তাকে তাপ বলে।

আবার আমরা জানি, তাপ এক রকম শক্তি। যা আমাদের ঠাণ্ডা বা গরমের অনুভূতি জাগায়। তাপ গ্রহণে বস্তু গরম হয়, বর্জনে ঠাণ্ডা হয়।

তাপের প্রকৃতি : ক্যালরিক ও গতিতত্ত্ব

প্রায় ২০০ বছর পূর্বেও মনে করা হত যে, তাপ এক রকম অদৃশ্য, ভরহীন, অবিনশ্বর তরল বা বায়বীয় পদার্থ। বিজ্ঞানীরা এ অদ্ভুত পদার্থের নাম দিয়েছিলেন ক্যালরিক। সকল বস্তুর মধ্যেই ক্যালরিক আছে বলে ধারণা করা হত। কোন বস্তুতে ক্যালরিক প্রবেশ করলে অর্থাৎ ক্যালরিক বেড়ে গেলে তা গরম হয়। ক্যালরিক বের হয়ে গেলে অর্থাৎ কমে গেলে বস্তুটি ঠাণ্ডা হয়। এ তত্ত্বকে ক্যালরিক তত্ত্ব বলে।

পরবর্তী সময়ে কাউন্ট রামফোর্ড (১৭৫৩-১৮১৪), জেমস জুল (১৮১৮-১৮৮৯) প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় ক্যালরিক তত্ত্ব টিকতে পারেনি। এমনিতেও দেখা যায় যে, ক্যালরিক যদি এক রকম পদার্থ হয়ে থাকে তার ওজন থাকবে কারণ সকল পদার্থের ওজন রয়েছে। ওজনহীন পদার্থ কল্পনা করা যায়, কিন্তু বাস্তবে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন বস্তু ঠাণ্ডা অবস্থায় এবং গরম অবস্থায় ওজন করে দেখা গেছে যে ওজনের কোন তারতম্য হয় না।

তাপের গতিতত্ত্ব

বর্তমানে তাপের প্রকৃতি সম্পর্কে যে মতামত প্রচলিত তা হল তাপের গতিতত্ত্ব। তোমরা জান প্রত্যেক পদার্থই অসংখ্য অণু দিয়ে গঠিত। অণুগুলো সবসময়ই গতিশীল। অণুগুলোর এ গতি বৃদ্ধি পেলে গতিশক্তিও বৃদ্ধি পায়। এ গতিশক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ফলে বস্তুটির তাপ বাড়ে অর্থাৎ তা গরম হয়। অপরপক্ষে, কোন কারণে বস্তুর অণুগুলোর গতি কমে গেলে গতিশক্তি কমে যায় তার তাপও কমে, অর্থাৎ তা ঠাণ্ডা হয়। মোট কথা, তাপ গতিশক্তির আর এক রূপ। অণুর গতির ফলে সৃষ্ট মোট গতিশক্তি পদার্থে তাপ শক্তিরূপে প্রকাশ পায়। এটাই তাপের গতিতত্ত্ব।

তাপের উৎস ও উৎপত্তি

আমরা জানি, শক্তি এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হয়। তাপ এক প্রকার শক্তি। তাই তাপ অন্য শক্তিতে এবং অন্য শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। তোমরা দুই হাত কয়েকবার ঘষো, দেখবে হাত গরম হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ হাতের ঘর্ষণের ফলে তাপ উৎপন্ন হয়। এখানে যান্ত্রিক শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আবার আমাদের বেঁচে থাকার জন্য তাপের প্রয়োজন। এ তাপ আমরা পাই আমাদের খাবার থেকে। খাবারের রাসায়নিক শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে আমাদের কাজ করার শক্তি যোগায়। রান্না করার জন্য তাপের প্রয়োজন। এ তাপ আমরা পাই কাঠ, কয়লা, গ্যাস, বা তেল পুড়িয়ে। এখানে তাপ উৎপন্ন হয়েছে কাঠ, গ্যাস বা তেলের (পেট্রোল, কেরোসিন, ডিজেল) রাসায়নিক শক্তি থেকে। এ তাপ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে রেলগাড়ি, মোটর গাড়ি, লঞ্চ, স্টিমার চালানো হয়। আবার বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে কলকারখানা, ঘরবাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। বিদ্যুৎ থেকেও আবার তাপ উৎপন্ন হয়। বৈদ্যুতিক হিটার, ইস্ত্রি, চুলা ইত্যাদি এর উদাহরণ।

এ পৃথিবীতে মানুষের এবং সকল জীবজন্তুর বেঁচে থাকার জন্য, গাছপালা জন্মাবার জন্য তাপের প্রয়োজন। এ তাপ আমরা পাই সূর্য থেকে।

সূর্যের তাপই পৃথিবীকে উত্তপ্ত রাখে। এ তাপ থেকে জীবজন্তু গাছপালা শক্তি সংগ্রহ করে। আবার গাছপালা বা জীবজন্তু মারা যাবার পর লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকার পর কয়লা, গ্যাস বা তেলে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ কয়লা, গ্যাস ও তেলের শক্তির উৎসও প্রকৃতিপক্ষে সূর্য। সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে কয়লা, গ্যাস ও তেলকে তাপের উৎস হিসেবে দেখা গেলেও প্রধান উৎস হল সূর্য।

অতএব আমরা বলতে পারি-

তাপের প্রধান উৎস হচ্ছে সূর্য, তাপের অন্যান্য উৎস হচ্ছে কাঠ, কয়লা, গ্যাস বা তেল (কেরোসিন, পেট্রোল, ডিজেল); অন্যান্য শক্তি; যেমন যান্ত্রিক শক্তি, রাসায়নিক শক্তি এবং বিদ্যুৎ শক্তি থেকে তাপ উৎপন্ন করা যায়।

তাপের প্রভাব

কোনো বস্তুতে তাপ প্রয়োগ করলে বস্তুর ধর্মের পরিবর্তন হয়। যেমন -

(১) উষ্ণতার পরিবর্তন : কোনো বস্তুতে তাপ প্রয়োগ করলে সাধারণত তার উষ্ণতা বাড়ে, তাপ অপসারণ করলে উষ্ণতা কমে।

(২) অবস্থার পরিবর্তন : তাপ প্রয়োগ করলে কঠিন পদার্থ সাধারণত তরলে এবং তরল পদার্থ বাষ্পে পরিণত হয়। আবার তাপ অপসারণ করলে বিপরীত ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ বাষ্প তরলে এবং তরল কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। যতক্ষণ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে ততক্ষণ উষ্ণতার পরিবর্তন হয় না।

ব্যতিক্রম : কর্পূর, আয়োডিন, ন্যাপথালিন, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ইত্যাদি কয়েকটি কঠিন পদার্থে তাপ প্রয়োগ করলে সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয়।

(৩) পদার্থের প্রসারণ : তাপ প্রয়োগে বস্তুর দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রফল ও আয়তনের প্রসারণ হয়। কঠিন পদার্থে তিন রকম প্রসারণই হতে পারে। তরল বা বায়বীয় পদার্থে শুধু আয়তনের প্রসারণ হয়।

(৪) ভৌত ধর্মের পরিবর্তন : তাপ প্রয়োগে চুম্বকের চৌম্বক ধর্ম নষ্ট হয়। ধাতব পদার্থের বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতা কমে যায়। তরলের দ্রবীভূত করার ক্ষমতার পরিবর্তন হয়। গ্যাসের চাপ বৃদ্ধি পায়।

(৫) রাসায়নিক পরিবর্তন : তাপ প্রয়োগে অনেক সময় রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। যেমন কার্বনকে গরম করলে বাতাসের অক্সিজেনের সাথে মিশে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয়।

(৬) দহন : তাপে দাহ্য বস্তুর দহন ঘটে। কেরোসিন, পেট্রোল, কাগজ, কাঠ প্রভৃতি পদার্থে তাপ প্রয়োগ করলে জ্বলে।

(৭) আলোকের উৎপত্তি : বেশি তাপ প্রয়োগে অনেক বস্তু উজ্জ্বল হয়। অর্থাৎ আলোর উৎপত্তি হয়। বৈদ্যুতিক বাল্বের তার উত্তপ্ত হয়ে আলো দেয়।

উষ্ণতা

তোমাকে এক গ্লাস পানি আর এক কাপ চা দেওয়া হল। পানির গ্লাসটি স্পর্শ কর ঠাণ্ডা লাগবে। চায়ের কাপটি স্পর্শ কর, গরম লাগবে। আমরা বলি চায়ের কাপের উষ্ণতা পানির গ্লাসের উষ্ণতা থেকে বেশি। গরম জিনিসের উষ্ণতা বেশি, ঠাণ্ডা জিনিসের উষ্ণতা কম। অর্থাৎ কোন বস্তু কতটুকু ঠাণ্ডা বা কতটুকু গরম তার মাত্রা বা পরিমাণ হচ্ছে উষ্ণতা বা তাপমাত্রা। অন্য কথায় উষ্ণতা বস্তুর তাপীয় অবস্থা।

এবার পানির গ্লাস থেকে কিছু পানি ফেলে দিয়ে কাপের চা গ্লাসে ঢাল। এখন গ্লাসটি স্পর্শ কর। দেখবে আগের থেকে গরম লাগছে। চায়ের উষ্ণতা পানির উষ্ণতা থেকে বেশি ছিল। পানির সাথে মেশাবার পর চা - এর তাপ পানিতে যেয়ে পানির উষ্ণতা বৃদ্ধি করেছে। একই রকম এক খণ্ড গরম লোহাকে যদি ঠাণ্ডা পানিতে ডোবানো হয়, তবে লোহার খণ্ডটি ঠাণ্ডা হয়, পানি গরম হয়। গরম অর্থাৎ বেশি উষ্ণতার লোহা থেকে ঠাণ্ডা বা কম উষ্ণতার পানিতে তাপ চলে যায় বলে

এটা হয়। লোহা তাপ ছেড়ে দিয়ে ঠাণ্ডা হয়েছে, পানি তাপ নিয়ে গরম হয়েছে। সাধারণভাবে, দুইটি বস্তুকে পরস্পরের সংস্পর্শে আনলে কোনটি তাপ ছাড়বে আর কোনটি তাপ গ্রহণ করবে তা নির্ভর করে বস্তু দুইটির উষ্ণতার পার্থক্যের ওপর। বেশি উষ্ণতার বস্তু থেকে কম উষ্ণতার বস্তুতে তাপ যায়। অতএব, বলা যায় উষ্ণতা বা তাপমাত্রা হল কোন বস্তুর তাপীয় অবস্থা। দুইটি বস্তুকে পরস্পরের সংস্পর্শে রাখলে কোনটি তাপ ছাড়বে আর কোনটি তাপ গ্রহণ করবে তা এ তাপীয় অবস্থা বা উষ্ণতাই নির্দেশ করে।

তাপ গ্রহণে বস্তুর উষ্ণতা বাড়ে, তাপ বর্জনে উষ্ণতা কমে। অর্থাৎ, তাপ হল কারণ এবং উষ্ণতা হল ফল।

এক বালতি গরম পানি থেকে এক কাপ পানি নাও। বালতির পানি এবং কাপের পানিতে উষ্ণতা একই। কিন্তু বালতির বেশি পানিতে তাপের পরিমাণ কাপের অল্প পানির তাপের পরিমাণ থেকে অনেক বেশি। সুতরাং দুইটি বস্তু একই উষ্ণতায় থাকলেও তাদের তাপের পরিমাণ ভিন্ন হতে পারে। আবার দুইটি বস্তুতে তাপের পরিমাণ সমান হলেও তাদের উষ্ণতা ভিন্ন হতে পারে।

তাপ ও উষ্ণতার পার্থক্য	
তাপ	উষ্ণতা
১) তাপ শক্তির একটি রূপ।	১) উষ্ণতা কোন বস্তুর তাপীয় অবস্থা
২) তাপ গ্রহণে বস্তুর উষ্ণতা বাড়ে, বর্জনে উষ্ণতা কমে। অর্থাৎ তাপ উষ্ণতার কারণ। [ব্যতিক্রম : গলন ও স্ফুটনের সময় তাপ প্রয়োগে উষ্ণতা বাড়ে না।]	২) উষ্ণতা তাপের ফল।
৩) এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে তাপের প্রবাহ তাপের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না।	৩) তাপ প্রবাহের দিক উষ্ণতার উপর নির্ভর করে।
৪) দুইটি বস্তুতে তাপের পরিমাণ সমান হলেও উষ্ণতা ভিন্ন হতে পারে।	৪) দুইটি বস্তুর উষ্ণতা এক হলেও তাপের পরিমাণ ভিন্ন হতে পারে।
৫) তাপ পরিমাপের যন্ত্রের নাম ক্যালরিমিটার।	৫) উষ্ণতা মাপক যন্ত্রের নাম থার্মোমিটার।
৬) সিজিএস পদ্ধতিতে তাপের এককের নাম ক্যালরি ; এস. আই. পদ্ধতিতে জুল।	৬) সিজিএস পদ্ধতিতে উষ্ণতার একক হল ডিগ্রী সেলসিয়াস ; এস. আই. পদ্ধতিতে কেলভিন।

উষ্ণতার পরিমাপ

পরীক্ষা : এ পরীক্ষাটি তোমরা নিজেদের বাড়িতেই করতে পার। তিনটি গামলা বা ঐ ধরনের পাত্র নাও। একটিতে ঠাণ্ডা পানি, একটিতে সামান্য গরম অর্থাৎ উষ্ণ পানি আর একটিতে হাতে সহ্য করতে পারা যায় এমন গরম পানি নাও। এখন তোমার এক হাত (ধর ডান হাত) গরম পানিতে এবং অপর হাত (বাম হাত) ঠাণ্ডা পানিতে ডোবাও। মনে মনে ষাট পর্যন্ত গণনা কর। এবার দুই হাত তুলে একই সংকেত উষ্ণ পানিতে ডোবাও। কী অনুভব করছো? দেখবে, একই পানি ডান হাতে ঠাণ্ডা এবং বাম হাতে গরম লাগছে।



চিত্র ১.১ : হাতের স্পর্শ সঠিক উষ্ণতা সম্পর্কে ভুল ধারণা দিতে পারে

সুতরাং, স্পর্শ করে কোন বস্তুর উষ্ণতা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। সঠিক পরিমাপের জন্য প্রয়োজন যন্ত্রের। উষ্ণতা পরিমাপের জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তার নাম থার্মোমিটার।

উষ্ণতা দেখা যায় না। তাই সরাসরি মাপাও যায় না। উষ্ণতার পরিবর্তনে তরল পদার্থের আয়তনের পরিবর্তন হয়। এ পরিবর্তন দেখা যায় এবং মাপাও যায়। তরল পদার্থের এ ধর্মকে কাজে লাগিয়ে পরোক্ষভাবে উষ্ণতা মাপা হয়। এলকোহল, পারদ ইত্যাদি তরলকে এ জন্য ব্যবহার করা হয়।

পারদ থার্মোমিটার

যে থার্মোমিটারে উষ্ণতা নির্দেশক তরল হিসেবে পারদ ব্যবহার করা হয় তাকে পারদ থার্মোমিটার বলে। এ থার্মোমিটারে খুব সরু ও সুসম হিঁদ্রযুক্ত একটি পুরো কাচ নল থাকে। নলটির এক প্রান্তে পাতলা দেয়াল বিশিষ্ট একটি বালু থাকে। অপর প্রান্ত প্রথমে খোলা থাকে। খোলা মুখ দিয়ে বিশুদ্ধ এবং শুষ্ক পারদ বালু ভরা হয়। পারদ ভরার জন্য বালুটিকে বারবার গরম ঠাণ্ডা করা হয়। বালুটি পূর্ণ করে নলেরও সামান্য অংশ পর্যন্ত পারদ ভরা হয়। এখন পারদ ভর্তি প্রান্তে এমনভাবে তাপ দেয়া হয় যেন, পারদ নলের গলার কাছাকাছি আসে। এ অবস্থায়, কিছু পারদসহ এর খোলা প্রান্তটি গরম করে কাচ গলিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়। এরপর নলটিকে ঠাণ্ডা করা হয়। ফলে, পারদ নীচে নেমে আসে। নলের বাকি অংশে খুব সামান্য পরিমাণ পারদ বাষ্প ছাড়া কিছু থাকে না। নলটির গায়ে উষ্ণতা পরিমাপের নির্দিষ্ট স্কেল অনুযায়ী দাগ কাটা হয়। থার্মোমিটারের নলে হিঁদ্র অত্যন্ত সরু। তাই বালবের উষ্ণতা অল্প বৃদ্ধি পেলেই পারদ উপরের দিকে অনেকখানি উঠে যায়। বালব এর দেয়াল পাতলা, যাতে তাপ তাড়াতাড়ি ঢুকতে পারে। নলটি পুরো যাতে তা মজবুত হয়।

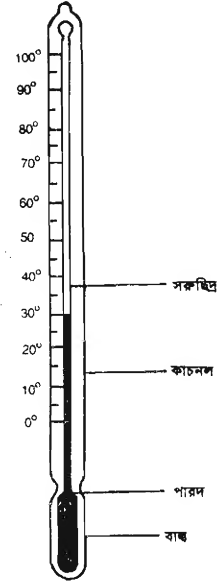
উষ্ণতা পরিমাপের স্কেল

তোমরা জান যে, কোনো কিছু পরিমাপের জন্য তার একটি নির্দিষ্ট অংশকে প্রথমে আদর্শ হিসেবে ধরে নেয়া হয়। উষ্ণতা পরিমাপের জন্যও দুইটি নির্দিষ্ট উষ্ণতাকে আদর্শ হিসেবে ধরা হয়। এদের স্থিরাজ্জ বলে। একটিকে নিম্ন স্থিরাজ্জ, অপরটিকে উর্ধ্ব স্থিরাজ্জ বলা হয়।

নিম্ন - স্থিরাজ্জ : স্বাভাবিক চাপে যে উষ্ণতায় বিশুদ্ধ বরফ গলে পানিতে পরিণত হয়, সেই উষ্ণতাকে নিম্ন স্থিরাজ্জ বলে।

উর্ধ্ব - স্থিরাজ্জ : স্বাভাবিক চাপে যে উষ্ণতায় বিশুদ্ধ পানি বাষ্পে পরিণত হয়, সেই উষ্ণতাকে উর্ধ্ব স্থিরাজ্জ বলে।

উর্ধ্ব - স্থিরাজ্জ এবং নিম্ন - স্থিরাজ্জের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে মৌলিক বা প্রাথমিক ব্যবধান বলে। এ ব্যবধান কতগুলো সমান অংশে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ভাগকে এক ডিগ্রী (1°) বলে। মৌলিক ব্যবধানকে বিভিন্ন সংখ্যক সমান অংশে ভাগ করলে উষ্ণতার বিভিন্ন স্কেল পাওয়া যায়। বর্তমানে উষ্ণতা পরিমাপের দুইটি স্কেল প্রচলিত - সেলসিয়াস স্কেল এবং ফারেনহাইট স্কেল।



চিত্র ১.২ : পারদ থার্মোমিটার

(১) **সেলসিয়াস স্কেল :** এ স্কেলে নিম্ন - স্থিরাজ্জকে 0° এবং উর্ধ্ব - স্থিরাজ্জকে 100° ধরা যায়। মধ্যবর্তী দূরত্বকে সমান ১০০ ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ভাগকে এক ডিগ্রী সেলসিয়াস (1° সে.) বলা হয়।

সুইডেনের বিজ্ঞানী সেলসিয়াস ১৭৪২ খ্রিষ্টাব্দে এ স্কেল উদ্ভাবন করেন। তাঁর নাম অনুসারে এ স্কেলকে সেলসিয়াস স্কেল বলা হয়। সব ধরনের বৈজ্ঞানিক কাজে এ স্কেল ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশসহ পৃথিবীর বহু দেশে এ স্কেল প্রচলিত। মধ্যবর্তী দূরত্বকে ১০০ ভাগে ভাগ করা হয় বলে একে সেন্টিগ্রেড স্কেলও বলা হয় (Centi অর্থ ১০০ এবং grade অর্থ ভাগ)।

(২) ফারেনহাইট স্কেল : এ স্কেলে নিম্ন স্থিরাজ্জকে 32° এবং উর্ধ্ব স্থিরাজ্জকে 212° ধরা হয়। মধ্যবর্তী ব্যবধানকে সমান ১৮০ ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ভাগকে এক ডিগ্রী ফারেনহাইট (1° ফা.) বলা হয়। ১৭১৪ খ্রিষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী ফারেনহাইট এ স্কেল প্রবর্তন করেন। এ স্কেল সাধারণত ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় গৃহস্থালি কাজে এবং প্রায় সব দেশে ডাক্তারি কাজে ও কলকারখানায় এ স্কেল ব্যবহার করা হয়।

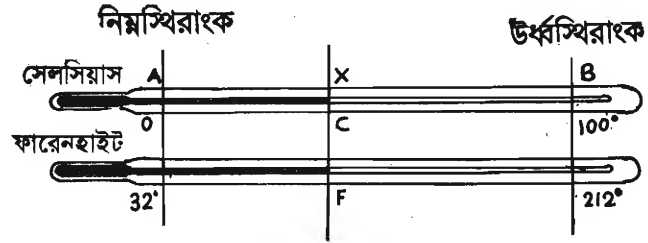
সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেলের মধ্যে সম্পর্ক

ধরা যাক, একই উষ্ণতার জন্য সেলসিয়াস স্কেলের পাঠ C এবং ফারেনহাইট স্কেল পাঠ F (চিত্র ১.৩)।

$$\frac{AX}{AB} = \frac{C - 0}{100} = \frac{F - 32}{180}$$

$$\text{অথবা, } \frac{C}{5} = \frac{F - 32}{9}$$

এটাই সেলসিয়াস এবং ফারেনহাইট স্কেলের মধ্যকার সম্পর্ক।



চিত্র ১.৩ : সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেলের মধ্যে সম্পর্ক

উদাহরণ : মানুষের দেহের স্বাভাবিক উষ্ণতা 98.6° ফা.। সেলসিয়াস স্কেলে এ উষ্ণতা কত হবে?

$$\frac{C}{5} = \frac{F - 32}{9} = \frac{98.6 - 32}{9}$$

$$\text{অথবা, } \frac{C}{5} = \frac{66.6}{9}$$

$$\text{অথবা, } C = \frac{66.6 \times 5}{9}$$

$$\therefore C = 37.0^\circ \text{ সে. (প্রায়)}$$

গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক

তোমরা জান পদার্থ সাধারণত তিন অবস্থায় থাকতে পারে। কঠিন, তরল ও বায়বীয়। এর সবচেয়ে সহজ উদাহরণ হল পানির তিন অবস্থা। বরফ, পানি এবং বাষ্প। বরফকে তাপ দিলে তা পানিতে পরিণত হয়। পানিকে তাপ দিলে বাষ্পে পরিণত হয়। আবার বিপরীতটাও হয়। শুধু পানির বেলাতেই যে এরকম হয় তা নয়। প্রায় সকল বস্তুই কঠিন, তরল বা বাষ্পীয় অবস্থায় থাকতে পারে, যদি তাকে যথেষ্ট গরম বা যথেষ্ট ঠাণ্ডা করা যায়। অক্সিজেন -183° সে. উষ্ণতায় তরলে পরিণত হয়। এমনকি -218° সে. উষ্ণতায় তা কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। লোহা 1538° সে. উষ্ণতায় তরল হয়, 3027° সে. উষ্ণতায় বাষ্পে পরিণত হয়।

তাপ প্রয়োগে কোন কঠিন পদার্থের তরলে পরিণত হওয়াকে গলন বলে। কোন কঠিন পদার্থকে তাপ দিলে প্রথমে তার উষ্ণতা বাড়তে থাকে। একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কঠিন পদার্থ গলে শুরু করে। যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত কঠিন পদার্থ গলে তরলে পরিণত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এ উষ্ণতা স্থির থাকে। এ নির্দিষ্ট উষ্ণতাকে কঠিন পদার্থের গলনাঙ্ক বলে।

এবার আরও তাপ দিলে তরল পদার্থের উষ্ণতা আবার বাড়তে শুরু করে। একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় তরল পদার্থ ফুটতে শুরু করে এবং বাষ্পে পরিণত হতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ তরল বাষ্পে পরিণত না হয় ততক্ষণ এ উষ্ণতা স্থির থাকে। এ নির্দিষ্ট উষ্ণতাকে তরল পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক বলে।

গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক চাপের ওপর নির্ভর করে। স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলের চাপে কয়েকটি পদার্থের গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক ছকে দেওয়া হল।

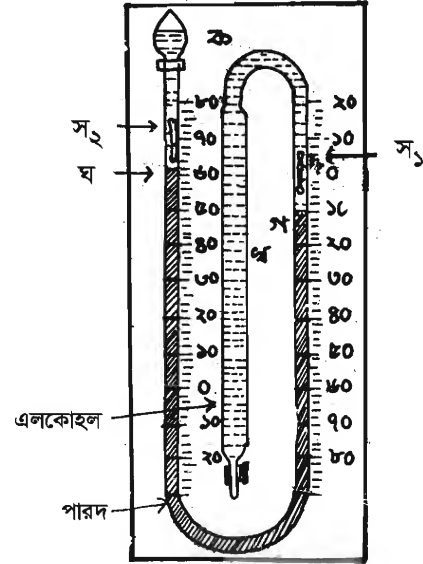
পদার্থের নাম	গলনাঙ্ক	স্ফুটনাঙ্ক
হাইড্রোজেন	২৫৯° সে.	২৫৩ ° সে.
অক্সিজেন	২১৯° সে.	১৮৩ ° সে.
পারদ	৩৯° সে.	৩৫৭° সে.
বরফ	০° সে.	১০০° সে.
সীসা	৩২৭° সে.	১৭৪৪° সে.
তামা	১০৮৩° সে.	২৫৯৫° সে.
লোহা	১৫৩৫ ° সে.	৩০২৭° সে.

সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন থার্মোমিটার

গত চব্বিশ ঘন্টার ঢাকায় সর্বোচ্চ উষ্ণতা ছিল ২৭° সে. এবং সর্বনিম্ন উষ্ণতা ছিল ১২.২° সে.। তোমরা রেডিও বা টেলিভিশনে এ ধরনের খবর শুনেছ বা খবরের কাগজে পড়েছ। একটি নির্দিষ্ট সময়ের এ সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন উষ্ণতা মাপার জন্য সারা দিনরাত একজনকে একটি থার্মোমিটার নিয়ে বসে থাকতে হয় কি? না, তা হয় না।

কারণ কোন নির্দিষ্ট সময়ের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন উষ্ণতা পরিমাপের জন্য বিশেষ এক ধরনের থার্মোমিটার বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন। এ থার্মোমিটারের নাম সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন থার্মোমিটার। এ থার্মোমিটার এমনভাবে গঠিত যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উষ্ণতা সময় শেষে একবার পাঠ নিয়েই জানা যায়।

সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উষ্ণতা দুইটি পৃথক বিশেষ থার্মোমিটার দিয়ে মাপা যায়। আবার একই থার্মোমিটার দিয়েও মাপা যায়। কোন নির্দিষ্ট সময়ের বায়ুমণ্ডলের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উভয় উষ্ণতাই এক সঙ্গে মাপা যায় এমন একটি থার্মোমিটারের নাম সিক্স এর থার্মোমিটার। এটি একটি U আকৃতির সরু কাচনল। কাচনলের দুপ্রান্তে দুইটি বাল্ব আছে ‘ক’ ও ‘খ’ (চিত্র ১.৪)। ‘ক’ বাল্বটি ছোট, ‘খ’ বাল্বটি বড় এবং লম্বা আকৃতির। ‘খ’ বাল্ব এবং নলের কিছু অংশে ‘গ’ পর্যন্ত এলকোহল ভরা রয়েছে। নলের ‘গ’ থেকে ‘ঘ’ পর্যন্ত অংশে পারদ রয়েছে। ‘ঘ’ এর উপরের অংশে এবং ‘ক’ বাল্বের কিছু অংশে আবার এলকোহল রয়েছে। ‘ক’ বাল্বের বাকি অংশ শূন্য, তবে সামান্য এলকোহলের বাষ্প থাকে। নলের দুই প্রান্তে দুইটি ধাতব সূচক স_১ ও স_২ আছে। সূচক দুইটিকে স্প্রিং দিয়ে নলের গায়ে চেপে লাগানো থাকে। যন্ত্রটি একটি কাঠের কাঠামোতে লাগিয়ে খাড়াভাবে রাখা হয়। দুদিকের নলের গায়ে দুইটি স্কেল লাগানো থাকে।



চিত্র ১.৪ : সিক্স এর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন থার্মোমিটার

যে সময় থেকে বায়ুমণ্ডলের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উষ্ণতা জানা প্রয়োজন সেই সময়ে বাইরে থেকে একটি শক্তিশালী চুম্বক দিয়ে সূচক দুইটিকে উপরে বা নিচে নামিয়ে পারদ স্তম্ভের সাথে স্পর্শ করিয়ে রাখা হয়। এখন উষ্ণতা বাড়লে বড় বাল্ব ‘খ’ এর এলকোহলের আয়তন বাড়ে। সুতরাং তা পারদ স্তম্ভকে ঠেলা দেয়। ফলে বাম দিকের পারদ স্তম্ভ উপরের দিকে উঠতে থাকে এবং তা সূচক স_২ কে ঠেলে উপরে তোলে। আবার, যখন উষ্ণতা কমে তখন ‘খ’ বাল্ব এর এলকোহলের আয়তন কমে। ফলে ডান দিকের সূচক স_১ কে ঠেলে উপরে তোলে। স্প্রিং দিয়ে লাগানো থাকে বলে স_২ কিন্তু আগের জায়গাতেই থেকে যায়। স্কেল থেকে স_১ ও স_২ এর অবস্থানের পাঠ নেওয়া হয়। স_১ এর পাঠ সেই সময়ের সর্বনিম্ন উষ্ণতা এবং স_২ এর পাঠ সর্বোচ্চ উষ্ণতা নির্দেশ করে।

এ ধরনের থার্মোমিটার সাধারণত আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার বা কৃষি গবেষণা কাজে ব্যবহৃত হয়।

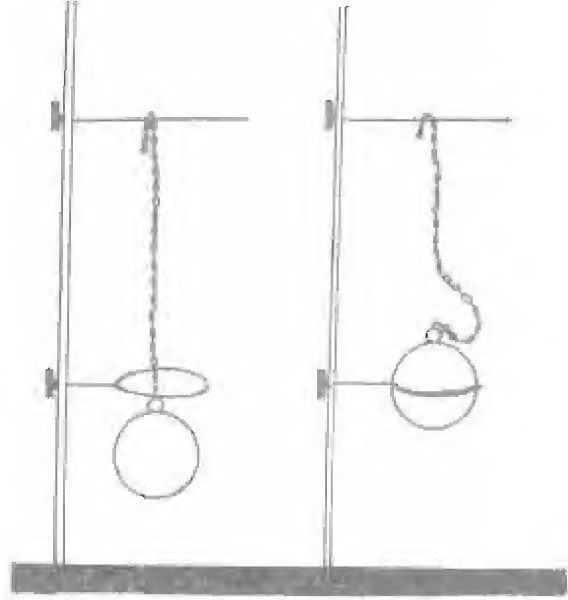
কঠিন পদার্থের প্রসারণ-প্রসারাজক

তাপ প্রয়োগ করলে অধিকাংশ কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রফল এবং আয়তন বাড়ে। এ বৃদ্ধি খুব কম বলে খালি চোখে দেখা যায় না। নিচের পরীক্ষাটি করলেই তুমি তার প্রমাণ পাবে।

পরীক্ষা : এ পরীক্ষার নাম রিং ও বল পরীক্ষা। পিতলের একটি বল এবং একটি রিং এমনভাবে তৈরি যে ঠাণ্ডা অবস্থায় বলটি রিং এর ভেতর দিয়ে ঠিক চলে যায়। বলটিকে কিছু দিয়ে বেশ করে গরম করে রিং এর উপর বসালে দেখা যায় যে সেটি আর রিং এর ভেতর দিয়ে যাচ্ছে না। তাপ প্রয়োগে বলের আয়তন বাড়ে বলেই এ রকম হয়। কিছুক্ষণ পর বলটি ঠাণ্ডা হলে দেখা যাবে যে সেটি রিং এর মধ্য দিয়ে চলে নিচে পড়ে গেছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থের প্রসারণ হয় এবং ঠাণ্ডা করলে সংকোচন হয়।

একই পরিমাণ তাপ প্রয়োগ করলেও সকল কঠিন পদার্থের প্রসারণ কিন্তু সমান হয় না। কোন পদার্থের প্রসারণ বেশি, কোনটির কম।

বিভিন্ন কঠিন পদার্থের প্রসারণের তুলনা করার জন্য প্রসারাংকের ধারণা আনা হয়েছে। এক ডিগ্রী উষ্ণতা বৃদ্ধিতে একক দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রফল বা আয়তনের যে প্রসারণ হয় তাকে প্রসারাজক বলে। কঠিন পদার্থের প্রসারাজক তিনটি :



চিত্র ১.৫ : রিং ও বল পরীক্ষা

(১) দৈর্ঘ্য প্রসারাজক : এক ডিগ্রী উষ্ণতা বৃদ্ধিতে একক দৈর্ঘ্যের কোন কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাকে ঐ পদার্থের দৈর্ঘ্য প্রসারাজক বলে। একে α (আলফা) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

(২) ক্ষেত্র প্রসারাজক : এক ডিগ্রী উষ্ণতা বৃদ্ধিতে একক ক্ষেত্রফলের কোন কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রফল যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাকে ঐ পদার্থের ক্ষেত্র প্রসারাজক বলে। একে β (বিটা) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

(৩) আয়তন প্রসারাজক : এক ডিগ্রী উষ্ণতা বৃদ্ধিতে একক আয়তনের কোন কঠিন পদার্থের আয়তন যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাকে ঐ পদার্থের আয়তন প্রসারাজক বলে। একে γ (গামা) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

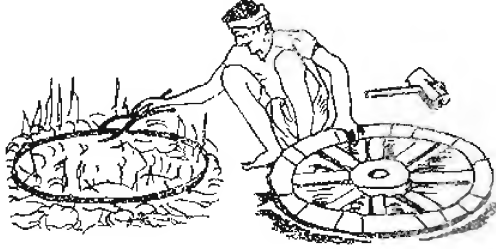
প্রসারাজক দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রফল বা আয়তনের এককের ওপর নির্ভর করে না। কেবলমাত্র উষ্ণতার স্কেলের ওপর নির্ভর করে। অর্থাৎ প্রসারাজকের একক হল প্রতি ডিগ্রী সেলসিয়াস ($^{\circ}$ সে.) অথবা প্রতি ডিগ্রী ফারেনহাইট ($^{\circ}$ ফা.)। লোহার দৈর্ঘ্য প্রসারাজক 0.000012° C বলতে আমরা বুঝি যে ১ মি. দৈর্ঘ্যের একটি লোহার দড়ের উষ্ণতা 1° সে. বৃদ্ধি করলে দড়টির দৈর্ঘ্য 0.000012 মি. বৃদ্ধি পায়।

কঠিন পদার্থের প্রসারণের বাস্তব প্রয়োগ

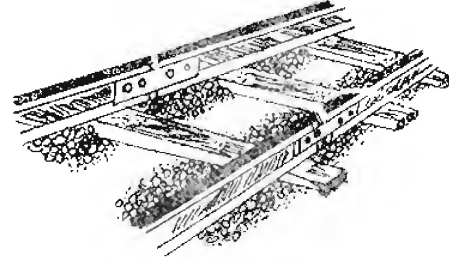
দৈনন্দিন জীবনে আমরা কঠিন পদার্থের তাপীয় প্রসারণের বহু প্রয়োগ করে থাকি।

(১) তোমরা দেখে থাকবে গরুর গাড়ির কাঠের চাকার উপরে একটি লোহার বেড় পরানো থাকে। এ বেড় কীভাবে পরায়? বেড়ের ব্যাস চাকার ব্যাস থেকে সামান্য কম রাখা হয়। বেড়টিকে আগুনে গরম করা হয়। ফলে সেটি প্রসারিত হয়। গরম অবস্থায় বেড়টিকে চাকার উপরে পরিয়ে পানি ঢেলে ঠাণ্ডা করা হয়। ঠাণ্ডায় সংকুচিত হয়ে বেড়টি চাকার গায়ে শক্তভাবে এঁটে যায়।

(২) কালির দোয়াত, ওষুধের শিশি বা অন্য কোন কাচের বোতল বা শিশির মুখ অনেক সময় এমনভাবে এঁটে থাকে যে খোলা যায় না। তখন তুমি কী করবে? শিশি বা বোতলের মুখ যদি কোন ধাতব পদার্থের হয় তবে তা একটু গরম কর, দেখবে তখন সহজেই ঢাকনাটি খোলা যাচ্ছে।



গরুর গাড়ির চাকার বেড় পরানো



রেল লাইন ও ফিসপ্রেট

চিত্র ১.৬ : কঠিন পদার্থের প্রসারণের বাস্তব প্রয়োগ দৃষ্টান্ত

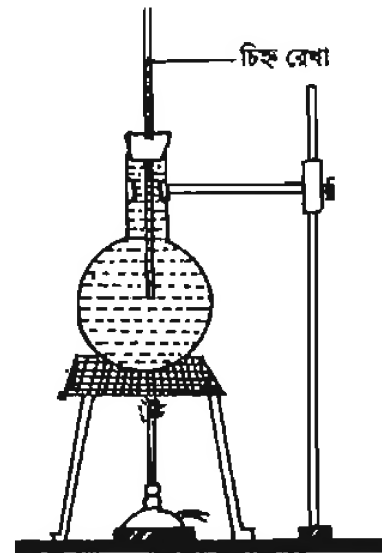
(৩) একটি মোটা কাচের গ্লাসে গরম পানি বা চা ঢাললে অনেক সময় গ্লাসটি ফেটে যায়। এর কারণ পানি বা চা এর গরমে গ্লাসের ভিতরের অংশ প্রসারিত হয়। বাইরের অংশ অতটা গরম ও প্রসারিত হয় না। ভেতরের এবং বাইরের অংশের অসমান প্রসারণের জন্য গ্লাসটি ফেটে যায়।

(৪) তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ রেললাইনের পর পর দুইটি লাইনের মাঝে কিছু ফাঁক থাকে। এর কারণ কী? একটি ট্রেন চলে যাবার পর রেল লাইনে হাত দিলে দেখবে সেটি বেশ গরম। লাইনের সাথে চাকার ঘর্ষণের ফলে লাইন গরম হয়ে যায়। ফলে লাইনের দৈর্ঘ্য বেড়ে যায়। ফাঁক না থাকলে রেল লাইন তখন বেঁকে যাবে। তাই দুইটি লাইনের মধ্যে ফাঁক রাখা হয়।

(৫) তোমরা আরো হয়তো খেয়াল করেছ যে টেলিভিশন, টেলিগ্রাফ বা বিদ্যুতের লাইনের তারগুলো ঢিলা করে ঝুলানো থাকে। ইচ্ছা করেই কিছু এ রকম করা হয়। কারণ শীতকালে বা রাতের বেলায় উষ্ণতা কমে যায়। তারের দৈর্ঘ্যও তাই ছোট হয়ে যায়। টানটান করে লাগানো থাকলে তখন তার ছিঁড়ে যেতে পারে।

তরল পদার্থের প্রসারণ

পরীক্ষা : একটি কাচের ফ্লাস্কে রঙিন পানি ভর্তি কর। ফ্লাস্কের মুখ ছিপি দিয়ে বন্ধ করে তার মধ্য দিয়ে একটি সরু কাচের নল ঢুকিয়ে দাও। দেখা যাবে কাচ নলের মধ্যে কিছুটা রঙিন পানি উঠে এসেছে। পানির মাথা বরাবর একটি দাগ দাও। এবার ফ্লাস্কটি গরম করতে থাক। দেখবে, সরু কাচনলের পানি প্রথমে নিচে নেমে আসে, তারপর উপরে উঠতে থাকে এবং প্রথম দাগ থেকেও উপরে উঠে যায়। এর কারণ কী? কারণ, ফ্লাস্ক প্রথম তাপ লাগে বলে সেটি প্রসারিত হয়ে তার আয়তন বেড়ে যায়। তাপ পানিতে তখনও পৌঁছায় না বলে প্রসারিত হয় না। ফলে প্রথমে পানির উচ্চতা নিচে নেমে আসে। এরপর পানি গরম হয়ে প্রসারিত হতে থাকে। ফলে পানির উচ্চতা বাড়তে থাকে। এ পরীক্ষা থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে একই উষ্ণতা বৃদ্ধিতে কঠিন পদার্থের চেয়ে তরলের প্রসারণ অনেক বেশি। তরলের কোন নির্দিষ্ট আকার নেই। শুধুমাত্র আয়তন আছে। তাই তরলের শুধুমাত্র আয়তন প্রসারণই হয়। তরলের প্রসারণকে কাজে লাগিয়ে থার্মোমিটার তৈরি করা হয়।

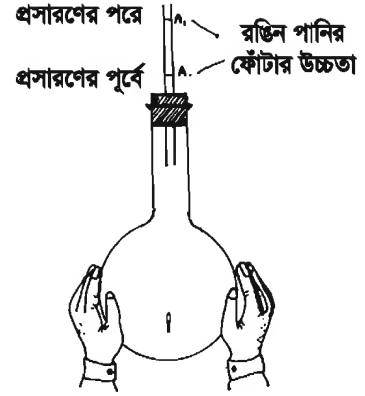


চিত্র ১.৭ : তাপে তরলের প্রসারণ

বায়বীয় পদার্থের প্রসারণ

পরীক্ষা : একটি বড় কাচের ফ্লাস্ক নাও। ফ্লাস্কের মুখ কর্ক দিয়ে বন্ধ কর। কর্কের মধ্য দিয়ে একটি সরু কাচনল ভেতরে ঢুকিয়ে দাও। নলের ভেতরে কয়েক ফোঁটা রঙিন পানি ঢুকিয়ে দাও। দেখবে যে পানির ফোঁটা নলের ভেতরে দিয়ে কিছুটা নেমে এক জায়গায় A স্থির হবে। এবার দুইহাত জোরে জোরে কয়েকবার ঘষে গরম করে ফ্লাস্কটি চেপে ধর। দেখবে রঙিন পানির ফোঁটা উপরের দিকে উঠে A₁ এসেছে। কারণ হাতের গরমেই ফ্লাস্কের ভেতরের বাতাস গরম হয়ে আয়তনে বেড়ে যায়। সেই বাতাসকে জায়গা দিতে রঙিন পানির ফোঁটা উপরে উঠে যায়।

একই উষ্ণতার পার্থক্যে কঠিন ও তরলের চেয়ে বায়বীয় পদার্থের প্রসারণ অনেক বেশি হয়। বায়বীয় পদার্থের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আয়তন প্রসারণ হয়।



চিত্র ১.৭ : তাপে বায়বীয় পদার্থের প্রসারণ

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- কোনটি শক্তি?

ক. কয়লা	খ. গ্যাস
গ. তাপ	ঘ. উষ্ণতা
- এক কেটলি গরম পানি থেকে এক কাপ গরম পানি নেওয়া হল। এর ফলে
 - কেটলির পানি ও কাপের পানির তাপের পরিমাণ সমান হবে
 - কেটলির পানি ও কাপের পানির তাপমাত্রা সমান হবে
 - কেটলির পানির তাপের পরিমাণ কাপের পানির তাপের চেয়ে বেশি হবে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |
- একই উষ্ণতা বৃদ্ধিতে কোন পদার্থের প্রসারণ বেশি?

ক. কঠিন পদার্থের	খ. তরল পদার্থের
গ. বায়বীয় পদার্থের	ঘ. সকল পদার্থেরই সমান প্রসারণ
 - দৈর্ঘ্য প্রসারণ কিসের ওপর নির্ভর করে?

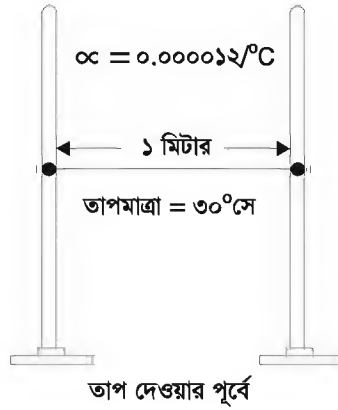
ক. দৈর্ঘ্যের এককের ওপর	খ. উষ্ণতার স্কেলের ওপর
গ. দৈর্ঘ্যের একক এবং উষ্ণতার স্কেল উভয়ের ওপর	ঘ. দৈর্ঘ্যের একক এবং উষ্ণতার স্কেল কোনটির ওপরই নির্ভর করে না

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. $\frac{C}{5} = \frac{F - 32}{9}$

- ক. উপরের সমীকরণ কীসের সম্পর্ক প্রকাশ করে ?
 খ. 32 দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে ?
 গ. সর্বোচ্চ তাপমাত্রার বরফের ক্ষেত্রে F এর মান কত ?
 ঘ. সমীকরণের আলোকে থার্মোমিটার দুইটির তুলনা কর ?

২.



- ক. দৈর্ঘ্য প্রসারাজক কাকে বলে ?
 খ. তারটি ঝুলে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর ?
 গ. তারটির দৈর্ঘ্য কতটুকু বৃদ্ধি পেল ।
 ঘ. ঘটনাটির আলোকে দুইটি রেললাইনের মাঝখানে ফাঁক রাখার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভরল পদার্থের চাপ

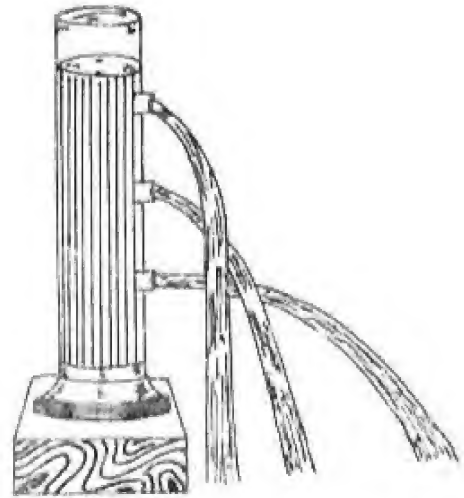
যদি শ্রেণীতে তোমরা জেনেছ যে, কোন বস্তুর ওজন হচ্ছে বস্তুটির ওপর পৃথিবীর আকর্ষণ বল। আরো জেনেছ যে, একক ক্ষেত্রফলের ওপর প্রযুক্ত বলকে চাপ বলে। সুতরাং যে কোন বস্তু যার ওজন আছে সে চাপ প্রয়োগ করে। ভরল পদার্থের ওজন আছে। সুতরাং ভরল পদার্থও চাপ প্রয়োগ করে। ভরল পদার্থের মধ্যে কোন বিন্দুর চারপাশের একক ক্ষেত্রফলের ওপর ভরল লম্বভাবে যে বলপ্রয়োগ করে তাকে ভরলের চাপ বলে।

ভরল পদার্থকে সব সময়ই কোন পাত্রে রাখতে হয়। ভরল পদার্থ এ পাত্রের পায়ে এবং ডলদেশে চাপ প্রয়োগ করে।

ভরল পদার্থের চাপের বৈশিষ্ট্য

ভরল পদার্থের চাপের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কঠিন পদার্থ শুধুমাত্র নিচের দিকে চাপ প্রয়োগ করে, কিন্তু ভরল পদার্থ নিচের দিকে ছাড়াও উপরের দিকে এবং পাশের দিকেও চাপ প্রয়োগ করে। কয়েকটি পরীক্ষা করে আমরা এ বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে জানতে পারি।

পরীক্ষা : একটি লম্বা টিনের কৌটা বা পাত্র লও। একটি লোহার পেরেক দিয়ে উপর থেকে নিচে একই রেখা বরাবর বিভিন্ন উচ্চতায় তিনটি ছিদ্র কর। ছিদ্রগুলো মোম দিয়ে বন্ধ করে পাত্রটি পানি দিয়ে ভর্তি কর। এবার সবগুলো ছিদ্র এক সঙ্গে খুলে দাও। লক্ষ করলে দেখবে যে, ছিদ্রগুলো হতে পানির খারা পাত্রের দেয়ালের সাথে লম্বভাবে বের হয়ে আসছে। অবশ্য লম্বভাবে পানির খারা বেশি দূর পর্যন্ত যেতে পারছে না। কারণ পৃথিবীর আকর্ষণ তাকে নিচের দিকে টানছে। আরো দেখবে যে, সবচেয়ে উপরের ছিদ্র দিয়ে পানি বেরিয়ে আসছে সবচেয়ে কম বেগে এবং পড়ছে পাত্রের সবচেয়ে কাছে। সবচেয়ে নিচের ছিদ্র দিয়ে পানি সবচেয়ে বেশি বেগে বেরিয়ে এসে সবচেয়ে দূরে গিয়ে পড়ছে। এর কারণ কী? এর কারণ হল, পানির মধ্যে কোন বিন্দুতে চাপ পানির উপরিভাগ থেকে সেই বিন্দুর গভীরতার ওপর নির্ভর করে। সবচেয়ে উপরের ছিদ্রের গভীরতা সবচেয়ে কম। তাই সেই সমতলে পানির চাপ কম। উপরের ছিদ্র দিয়ে তাই পানি আস্তে বেরিয়ে আসে এবং পাত্রের কাছে পড়ে। সবচেয়ে নিচের ছিদ্রের গভীরতা সবচেয়ে বেশি। সেই সমতলে পানির চাপও তাই বেশি। সুতরাং ঐ ছিদ্র দিয়ে সবচেয়ে জোরে পানি বেরিয়ে আসে এবং সবচেয়ে দূরে গিয়ে পড়ে।



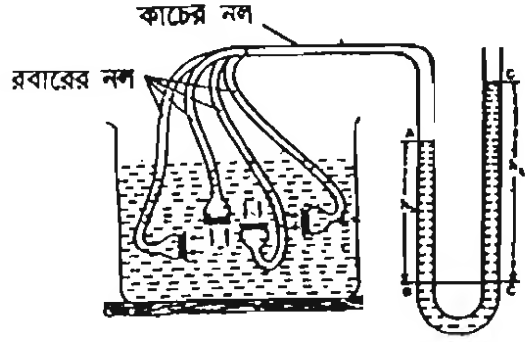
চিত্র ২.১ : গভীরতার সাথে ভরলের চাপ বাড়ছে

এ পরীক্ষা থেকে আমরা কী জানলাম? আমরা জানলাম যে, ভরলের চাপ গভীরতার ওপর নির্ভর করে। গভীরতা যত বাড়তে চাপও তত বাড়তে। আবার তিনটি ছিদ্র দিয়েই পানি পাশের দিক দিয়ে বেরিয়ে আসে। সুতরাং ভরল পার্শ্বচাপ দেয়। পাত্রের দেয়ালের উপর ভরল লম্বভাবে পার্শ্বচাপ দেয়।

পানি আটকানোর বাঁধ তৈরি করার সময় বাঁধের নিচের অংশ উপরের অংশের চেয়ে বেশি চতুর্ভু করা হয়। কেন এমন করা হয় বলতো?

পরীক্ষা ২ : একটি কাচের ফানেল নাও। ফানেলের মুখ পাতলা রবার দিয়ে টেনে বন্ধ কর। একটি রবারের নল দিয়ে তার এক দিক ফানেলের নলের সাথে এবং অপর দিক একটি ম্যানোমিটারের সাথে যুক্ত কর। ম্যানোমিটার হুচ্ছে চাপ মাপার একটি সরল যন্ত্র। এটি একটি U আকৃতির কাচ নল। কাচনলের ভিতরে কিছু তরল, যেমন পানি বা পারদ ঢোকানো হয়। ম্যানোমিটারের গায়ে একটি স্কেল লাগানো থাকে। দুই দিকের তরলের উচ্চতার পার্থক্য স্কেল দিয়ে মাপা যায়।

এখন একটি বড় বিকার বা কাচের পাত্রে পানি ভর্তি কর। ফানেলের মুখ নিচের দিকে করে ঐ পানির মধ্যে ডোবাও। ম্যানোমিটারের দিকে লক্ষ কর। কী দেখবে? দেখবে যে, ম্যানোমিটারের যে বাহুর সাথে ফানেলটি রবার নলের সাহায্যে যুক্ত হয়েছে, সেই বাহুর অর্থাৎ বাম বাহুর তরলের স্তর নিচে নেমে গেছে এবং অপর বাহুর তরলের স্তর পানির উপরে উঠে গেছে। এর কারণ কী? এর কারণ, পানি ফানেলের মুখে আটকানো রবারের উপর চাপ দেয়। ফলে ফানেলের ভেতরের বাতাসের ওপর চাপ পড়ে। ঐ বাতাস আবার ম্যানোমিটারে তরলের ওপর চাপ দেয়। ফলে তরলের স্তর নিচে নেমে যায়। স্কেলের পাঠ নিয়ে দুই বাহুর তরলের উচ্চতার পার্থক্য জানা যায়।



চিত্র ২.২ : তরলের কোন বিন্দুতে চাপ সবদিকে সমান

এখন একই গভীরতায় রেখে ফানেলটির মুখ সবদিক অর্থাৎ পাশের দিকে, নিচের দিকে এবং উপরের দিকে ঘোরাও। সব সময় ম্যানোমিটারের দিকে নজর রাখবে। দেখবে যে তরলের উচ্চতার কোন পরিবর্তন হল না। এর থেকে কী প্রমাণিত হয়? প্রমাণিত হয় যে, তরল পদার্থ নিম্নচাপ, পার্শ্বচাপ এবং উর্ধ্বচাপ দেয় এবং তরলের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট বিন্দুতে চাপ সবদিকে সমান।

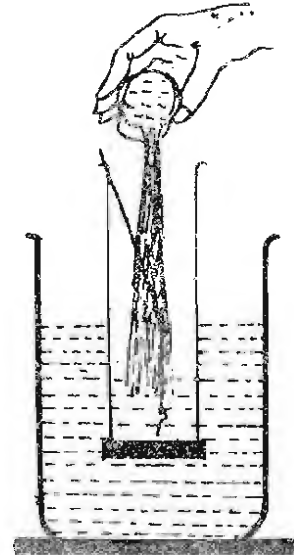
ফানেলটিকে এখন পানির আরো গভীরে ডোবালে দেখা যাবে যে ম্যানোমিটারের দুই বাহুর তরলের উচ্চতার পার্থক্য বাড়ছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, গভীরতা যত বাড়ে, তরলের চাপ তত বাড়ে।

এবার ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে বিভিন্ন ঘনত্বের তরল নিয়ে একই পরীক্ষা কর। দেখবে, একই গভীরতায় তরল পদার্থের চাপ তরলের ঘনত্বের ওপর নির্ভর করে। ঘনত্ব যত বেশি হয়, চাপও তত বেশি হয়।

পরীক্ষা-৩ : দুই মুখ খোলা একটি কাচের চোঙ নাও। আংটা লাগানো একটি পাতলা ধাতব চাকতি নাও, যা দিয়ে চোঙের নিচের মুখ বন্ধ করা যায়। আংটাতে সুতা বেঁধে চাকতিটা উপরের দিকে টেনে চোঙের নিচের মুখ বন্ধ কর। এ অবস্থায় চোঙটিকে খাড়াভাবে একটি পানিভর্তি পাত্রে আংশিক ডোবাও। সুতা ছেড়ে দাও। লক্ষ রাখতে হবে চাকতির ফাঁক দিয়ে যেন পানি চোঙের মধ্যে না ঢুকে যায়।

দেখা যাবে যে, সুতা ছেড়ে দিলেও চাকতিটা নিচে পড়ে যায় না, চোঙের নিচের মুখে আটকে থাকে। এর কারণ কী? এর কারণ হল পানির উর্ধ্বচাপ চাকতিকে উপরের দিকে ঠেলে চোঙের মুখ আটকে রাখে।

এখন একটি পাত্রে কিছু রঙিন পানি নিয়ে ধীরে ধীরে চোঙের মধ্যে ঢালতে থাক। দেখবে যে, চোঙের ভেতরের ও বাইরের পানির তল একই সমতলে এলে চাকতিটা চোঙের মুখ থেকে খুলে



চিত্র ২.৩ : তরলের উর্ধ্বচাপ ও নিম্নচাপ সমান

নিচে পড়ে গেল। এর কারণ কী? এর কারণ চোঙের ভেতরের পানি চাকতির উপর নিম্নচাপ দেয়। আর পাত্রের পানি দেয় উর্ধ্বচাপ। চোঙের ভেতরের আর বাইরের পানির তল একই সমতলে এলে চাকতির উপর পানির উর্ধ্বচাপ এবং নিম্নচাপ সমান হয়। ফলে চাকতিটি নিজের ভারে পড়ে যায়। সুতরাং দেখা গেল যে, একই গভীরতায় তরল পদার্থের কোন বিন্দুতে তরলের উর্ধ্বচাপ ও নিম্নচাপ সমান।

উপরের পরীক্ষাগুলো থেকে তরল পদার্থের যে সকল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা জানলাম তা হল :

- (১) স্থির তরলের মধ্যে কোন বিন্দুতে চাপ বিন্দুটির গভীরতার ওপর নির্ভর করে। গভীরতা বাড়লে চাপ বাড়ে, গভীরতা কমলে চাপ কমে।
- (২) সব তরলই উর্ধ্বচাপ, নিম্নচাপ ও পার্শ্বচাপ দেয়।
- (৩) স্থির তরলের মধ্যে যে কোন বিন্দুতে তরল সবদিকে সমান চাপ দেয়।
- (৪) স্থির তরলের কোন বিন্দুতে চাপ তরলের ঘনত্বের ওপর নির্ভর করে। তরলের ঘনত্ব বেশি হলে চাপ বেশি হয়, ঘনত্ব কম হলে চাপ কম হয়।
- (৫) স্থির তরলে কোন বিন্দুতে উর্ধ্বচাপ ও নিম্নচাপ সমান।

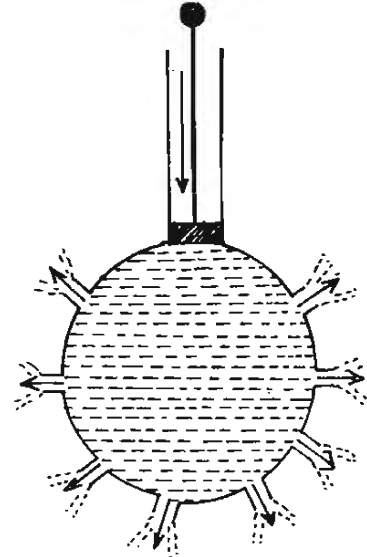
প্যাসকেলের সূত্র

ফরাসী বিজ্ঞানী প্যাসকেল তরলের চাপ নিয়ে বেশ কিছু পরীক্ষা করেন। একটি পরীক্ষার জন্য তিনি বিশেষ ধরনের একটি পিচকারি তৈরি করেন। এ পিচকারির এক দিকে একটি ফাঁকা গোলাকৃতি পাত্র যুক্ত থাকে। পাত্রটির গায়ে কয়েকটি ছোট ছোট সমান ছিদ্র করে মোম দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। পাত্রটি পানিপূর্ণ করে একটি পিন দিয়ে মোম খুলে ফেলে পিস্টনে চাপ দেওয়া হয়। দেখা যায় যে, সব ছিদ্র দিয়ে একই বেগে পানি বের হচ্ছে। এর থেকে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, পিস্টনের চাপ পানির ভেতরে সমানভাবে সবদিকে সঞ্চারিত হয়। তিনি তার এ সিদ্ধান্ত একটি সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করেন। তার নাম অনুসারে এ সূত্রের নাম দেওয়া হয় প্যাসকেলের সূত্র।

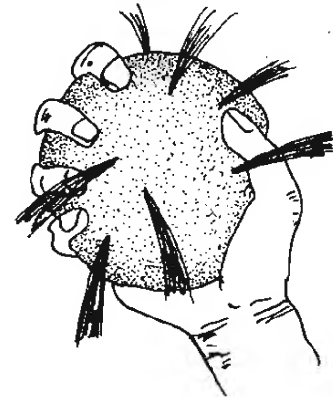
প্যাসকেলের সূত্র : কোন আবদ্ধ পাত্রে স্থির তরলের কোন অংশে চাপ প্রয়োগ করলে সেই চাপ কিছুমাত্র না কমে ঐ তরলের সবদিকে সমভাবে সঞ্চারিত হয় এবং তরল সংলগ্ন পাত্রের দেয়ালের উপর লম্বভাবে কাজ করে।

প্যাসকেলের সূত্রের পরীক্ষামূলক প্রমাণ

পরীক্ষা : একটি রবারের বল নাও। বলের গায়ে ছোট একটি ছিদ্র করে তার মধ্যে দিয়ে বলের মধ্যে পানি ভর্তি কর। পিন দিয়ে বলের গায়ে কতগুলো ছোট ছিদ্র কর। এবার প্রথম ছিদ্রটি আঙুল দিয়ে বন্ধ করে বলের গায়ে বিভিন্ন জায়গায় চাপ দাও। দেখবে যে, সকল ছিদ্র দিয়ে পানি বলের দেয়ালের সাথে লম্বভাবে একই বেগে বের হচ্ছে। অতএব, প্রমাণিত হল যে, স্থির তরলের কোন অংশে চাপ প্রয়োগ করলে সেই চাপ তরলের সবদিকে সমভাবে সঞ্চারিত হয়, মানে অপরিবর্তিত থাকে এবং পাত্রের দেয়ালের উপর লম্বভাবে কাজ করে।



চিত্র ২.৪ : প্যাসকেলের পরীক্ষা



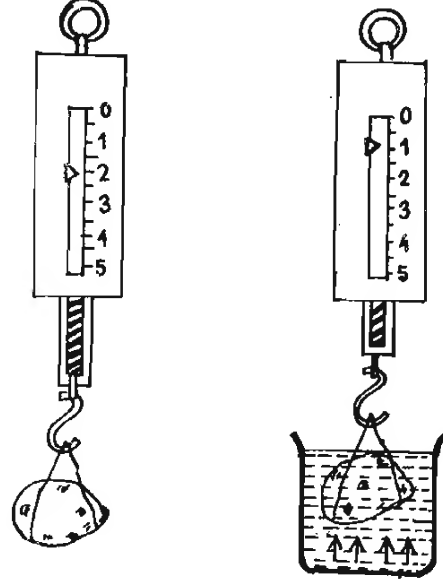
চিত্র ২.৫ : প্যাসকেলের সূত্রের প্রমাণ

উর্ধ্বচাপে ওজন কমে

একটি ফুটবল নিয়ে এক বালতি পানিতে ডুবিয়ে ধরে রাখ। মনে হবে, কে যেন নিচ থেকে বলটিকে উপরের দিকে ঠেলেছে। তোমার হাত সরিয়ে ফেল, দেখবে ফুটবলটি লাফ দিয়ে উপরে উঠে আসবে। তারপর পানিতে ভাসতে থাকবে। এর কারণ কী বলতো? এর কারণ পানির উর্ধ্বচাপ। একটি মগ বালতির পানিতে ডুবিয়ে পানি ভর্তি কর। দেখবে, পানিভর্তি মগটি যখন পানির মধ্যে থাকে তখন সেটাকে অনেক হালকা মনে হয়। ওজন প্রায় নেই বললেই চলে।

একই বকম, একটি ইটকে একটি দড়ি দিয়ে বেঁধে পানিতে ডোবালে সেটিকে বেশ হালকা মনে হয়। পানি থেকে উপরে তুললে ভারী লাগে। ওজন অনেক কমে গেছে বলে মনে হয়। পানিতে ডোবালে বস্তুটির ওজন কতটুকু কমে তা নিচের পরীক্ষাটি করে জানা যায়।

পরীক্ষা : এক খণ্ড পাথর বা ইটকে স্প্রিং নিক্তির সাথে বোলাও। স্প্রিং নিক্তির পাঠ নিয়ে এটির ওজন কত জান। এবার কানায় কানায় পানিতে ভর্তি একটি পাত্রে (চিত্র ২.৬ দেখ) এটিকে ডোবাও। কিছু পানি উপচে পড়ে যাবে। এ পানি আরেকটি পাত্রে ধরে রাখ। এ উপচে পড়া পানির আয়তন বস্তুটির আয়তনের সমান। পানিতে ডোবানো অবস্থায় স্প্রিং নিক্তির পাঠ থেকে বস্তুটির ওজন নেয়া হলে দেখা যাবে, এ ওজন আগের ওজনের চেয়ে কম। এবার উপচেপড়া অর্থাৎ অপসারিত পানির ওজন নিলে দেখা যাবে, এ ওজন পানিতে ডোবানোর ফলে বস্তুটির যতটুকু ওজন কমেছে তার সমান। অর্থাৎ অপসারিত পানির ওজন = পানির উর্ধ্বমুখী বল = বস্তুটির আপাত হারানো ওজন।



চিত্র ২.৬ : তরলে বস্তুটির ওজন হ্রাস

অতএব, দেখা গেল যে, কোনো কঠিন বস্তুকে কোনো স্থির তরলে নিমজ্জিত করলে কঠিন বস্তুটির উপর তরল পদার্থ একটি উর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করে। ফলে বস্তুটি কিছু ওজন হারায় বলে মনে হয়। বস্তুটির এ আপাত হারানো ওজন বস্তুটি দ্বারা অপসারিত তরল পদার্থের ওজনের সমান। এটাই আর্কিমিডিস এর সূত্র নামে পরিচিত। বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক আর্কিমিডিস প্রায় ২২০০ বছর পূর্বে এ সূত্রটি আবিষ্কার করেন।

কোন বস্তু পানিতে ডোবে, কোন বস্তু পানিতে ভাসে

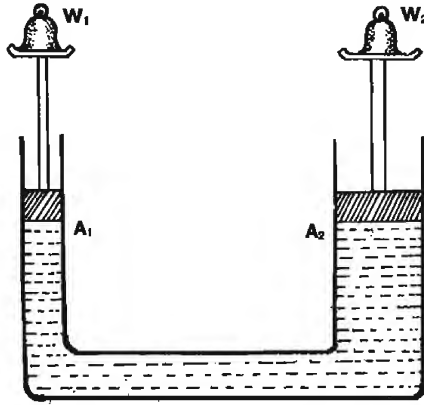
কোনো বস্তুকে কোনো তরলে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করলে বস্তুটির উপর দুইটি বল কাজ করে। একটি বস্তুটির ওজন, যা খাড়া নিচের দিকে কাজ করে, অপরটি তরলের উর্ধ্বমুখী বল যা খাড়া উপরের দিকে কাজ করে। বস্তুটির ওজন যদি তরলের উর্ধ্বমুখী বলের চেয়ে কম হয়, তবে উর্ধ্বমুখী বল বস্তুকে উপরের দিকে ঠেলে রাখে। ফলে বস্তু আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় ভেসে থাকে। আর বস্তুটির ওজন যদি তরলের উর্ধ্বমুখী বলের চেয়ে বেশি হয়, তবে নিচের দিকে বল বেশি হওয়ায় বস্তু ডুবে যায়। বস্তুটির ওজন যদি তরলের উর্ধ্বমুখী বলের সমান হয় তখন কী হবে? তখন বস্তু তরলের উপরে ভাসবেও না, তরলের মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবেও যাবে না। সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় তরলের যে কোনো স্থানে ভাসতে থাকবে।

তরলের উর্ধ্বমুখী বল বস্তু দ্বারা অপসারিত তরলের ওজনের সমান। সুতরাং, বস্তুটির নিমজ্জিত অংশ দ্বারা অপসারিত তরলের ওজন, যখন বস্তুটির ওজনের সমান হয় তখন বস্তু আংশিক ডুবন্ত অবস্থায় তরলে ভাসে। আর অপসারিত তরলের ওজন যখন বস্তুটির ওজনের চেয়ে কম হয়, তখন বস্তু তরলে ডুবে যায় এবং অপসারিত তরলের ওজন যখন বস্তুটির ওজনের সমান হয় তখন বস্তুটি সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় তরলের যে কোনো অবস্থানে ভাসবে।

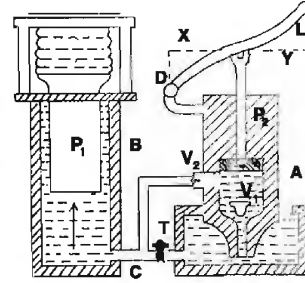
এখন বলতো এক খণ্ড লোহা পানিতে ডুবে যায়, অথচ লোহার তৈরি জাহাজ পানিতে ভাসে কেন? এর কারণ, এক খণ্ড লোহাকে পানিতে ডোবালে সেটি তার আয়তনের সমান পানি অপসারিত করে। লোহার খণ্ডটির ওজন সমআয়তন অপসারিত পানির ওজনের চেয়ে বেশি বলে সেটি ডুবে যায়। জাহাজ লোহার তৈরি হলেও এর তলা খুব চওড়া আর ফাঁপা। তাই জাহাজ পানিতে নামালে অনেক বেশি আয়তনের পানি অপসারণ করে। জাহাজের নিমজ্জিত অংশ দ্বারা অপসারিত পানির ওজন জাহাজের ওজনের চেয়ে অনেক বেশি, তাই জাহাজটি ভেসে থাকে। একই আয়তনের তরলের ওজন তার ঘনত্বের ওপর নির্ভর করে। ঘনত্ব বাড়লে ওজনও বাড়ে। এখন বলতো, কোন জাহাজ সমুদ্র থেকে নদীতে প্রবেশ করলে জাহাজটি বেশি ডুবে যাবে, না কম ডুবন্ত অবস্থায় ভাসবে?

হাইড্রোলিক প্রেস

হাইড্রোলিক প্রেস হচ্ছে প্যাসকেলের সূত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত। তোমরা জান যে একই বল ছোট ক্ষেত্রের ওপর প্রয়োগ করলে চাপ বাড়ে, আবার বড় ক্ষেত্রের ওপর প্রয়োগ করলে চাপ কমে। প্যাসকেলের সূত্রের সাহায্যে দেখানো যায় যে, একই চাপ যদি বড় ক্ষেত্রফলের ওপর প্রয়োগ করা যায় তবে বল বাড়ে। অর্থাৎ আবশ্য তরলের কোন এক স্থানে অল্প বল প্রয়োগ করে অন্য স্থানে বেশি বল পাওয়া যায়। বল বৃদ্ধির এ নীতি চিত্র ২.৭ এ দেখানো হয়েছে। এটি একটি U আকৃতির পানিপূর্ণ চোঙাকৃতি পাত্র। এর এক বাহু সরু এবং অপর বাহু মোটা। উভয় বাহুতেই একটি করে পানিরোধী পিস্টন লাগানো আছে। ধরা যাক সরু বাহুর প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল ১০ বর্গ সেমি এবং মোটা বাহুর প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল ১০০০ বর্গ সেমি।



চিত্র ২.৭ : বল বৃদ্ধির নীতি



চিত্র ২.৮ : হাইড্রোলিক প্রেস

আমরা জানি, চাপ = বল/ক্ষেত্রফল। সুতরাং সরু বাহুর পিস্টনের উপর ১০ নিউটন ওজন চাপালে, তরলের ওপর নিম্নমুখী চাপ = $10/10 = 1$ নিউটন/বর্গ সেমি। প্যাসকেলের সূত্র অনুযায়ী এ চাপ অপরিবর্তিত অবস্থায় তরল দ্বারা সবদিক সঞ্চালিত হবে। অর্থাৎ এ চাপ মোটা পিস্টনের উপরে উর্ধ্বমুখে কাজ করবে। অতএব, মোটা পিস্টনের উপর উর্ধ্বমুখী বল = চাপ \times ক্ষেত্রফল = $(1 \text{ নিউটন/বর্গ সেমি}) (1000 \text{ বর্গ সেমি}) = 1000$ নিউটন। সুতরাং ছোট পিস্টনে ১০ নিউটন বল প্রয়োগ করে বড় পিস্টনে ১০০০ নিউটন অর্থাৎ ১০০ গুণ বেশি বল পাওয়া গেল। বল বৃদ্ধির এ নীতির উপর ভিত্তি করেই হাইড্রোলিক প্রেস নির্মাণ করা হয়।

হাইড্রোলিক প্রেস : L লিভার দ্বারা (চিত্র ২.৮) P_2 পিস্টনকে উপরে টেনে তুলতে V_2 ভালব বন্ধ থাকে, কিন্তু V_1 ভালব খুলে যাওয়ায় তরলাধার হতে পানি A পাত্রে এসে জমা হয়। এখন আবার L লিভারে সাহায্যে P_2 পিস্টনকে নিচে নামালে V_1 ভালব বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু পানির চাপে V_2 ভালব খুলে যায়। ফলে ধাতব নল দিয়ে পানি A পাত্র হতে B পাত্রে সঞ্চালিত হয়ে উক্ত পাত্রের পিস্টন P_1 এর উপর বল প্রয়োগ করে। যেহেতু P_1 পিস্টনের প্রস্থচ্ছেদ P_2 এর প্রস্থচ্ছেদ অপেক্ষা বেশি, সে জন্য P_2 এর উপর প্রযুক্ত বল অপেক্ষা P_1 এর উপর প্রযুক্ত বল অনেক বেশি হবে। ফলে P_1 এর পাটাতন তার উপর রক্ষিত বস্তুকে উপরের পাতের সাহায্যে প্রবল জোরে চেপে সংকুচিত করবে। একদফা কাজ হয়ে গেলে তরলাধার ও ধাতব নলের সংযোগস্থলের ছিপি T খুলে দেওয়া হয়। এতে P_1 পিস্টনটি নিচে নেমে আসে ও নলের ভেতর দিয়ে B পাত্রের পানি তরলাধারে ফিরে যায়। এ যন্ত্র, পাট, তুলা, কাপড় ইত্যাদির গাঁটে প্রচণ্ড চাপ দেওয়া, বীজ থেকে তেল নিষ্কাশন করা ইত্যাদি নানারকম কাজে ব্যবহৃত হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. তরল পদার্থ কী ধরনের চাপ দেয় ?

ক. শুধু নিম্নচাপ দেয়	খ. শুধু পার্শ্বচাপ দেয়
গ. শুধু উর্ধ্বচাপ দেয়	ঘ. নিম্নচাপ, উর্ধ্বচাপ ও পার্শ্বচাপ দেয়
২. তরলের গভীরতা বাড়লে কোনটি ঘটে ?

ক. নিম্নচাপ বাড়ে, উর্ধ্বচাপ কমে	খ. উর্ধ্বচাপ বাড়ে, নিম্নচাপ কমে
গ. উর্ধ্বচাপ ও নিম্নচাপ দুটিই বাড়ে	ঘ. উর্ধ্বচাপ ও নিম্নচাপ উভয়ই কমে
৩. কোন বিন্দুতে তরলের চাপের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক ?

ক. নিচের দিকে বেশি চাপ দেয়	খ. উপরের দিকে বেশি চাপ দেয়
গ. পাশের দিকে বেশি চাপ দেয়	ঘ. সবদিকে সমান চাপ দেয়
৪. নিচের কোন বিবৃতিটি সঠিক ?

ক. তরলে সকল বিন্দুতে উর্ধ্বচাপ ও পার্শ্বচাপ সমান থাকে।
খ. সাঁতার কাটার সময় অপসারিত পানির ওজন ব্যক্তির ওজনের সমান হয়।
গ. স্থির পাথরের কোন বিন্দুতে চাপ স্থির পানির চেয়ে কম হয়।
ঘ. বস্তু ঘনত্ব বাড়লে ওজন কমে যায়।

নিচের তথ্য থেকে ৫নং ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

সুমন এবং রহিম দুই বন্ধু নৌকা ভ্রমণে বের হল। হঠাৎ ঝড় উঠলে নৌকা ডুবে যায়। সাঁতার জানে না বলে রহিম পানিতে ডুবে যায় কিন্তু সুমন সাঁতার কেটে তীরে উঠে আসে। এলাকাবাসী রহিমকে উদ্ধার করে।

৫. রহিম পানিতে ডুবে যায় কারণ রহিমের ওজন অপসারিত পানির ওজনের চেয়ে

ক. এক চতুর্থাংশ ছিল	খ. অর্ধেক ছিল
গ. সমান ছিল	ঘ. বেশি ছিল
৬. সাঁতার কাটার সময় অপসারিত পানির ওজন

i. সুমনের ওজনের সমান ছিল
ii. সুমনের ওজনের চেয়ে বেশি ছিল
iii. সুমনের ওজনের চেয়ে কম ছিল

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|--------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i, ii ও iii |
৭. ডুবন্ত অবস্থায় লোহার বালতি সহজেই টেনে তুলে যায়। কিন্তু পানির ওপরে টেনে তুলতে কষ্ট হয় কারণ

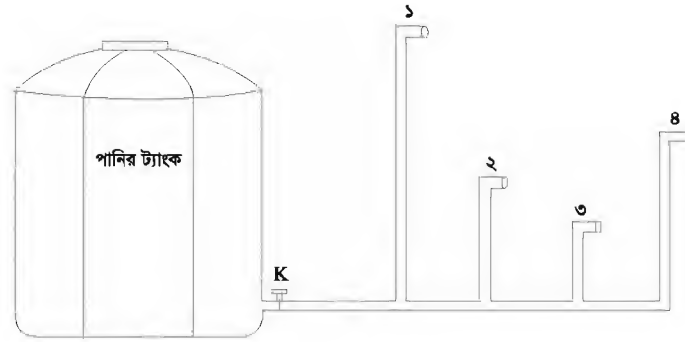
i. পানির ওপর বালতির ওজন প্রকৃত ওজন
ii. পানির ওপর বালতির ওজন বেশি
iii. ডুবন্ত অবস্থায় বালতির ওজন কম মনে হয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.



চাবি K খুলে দেওয়া হল।

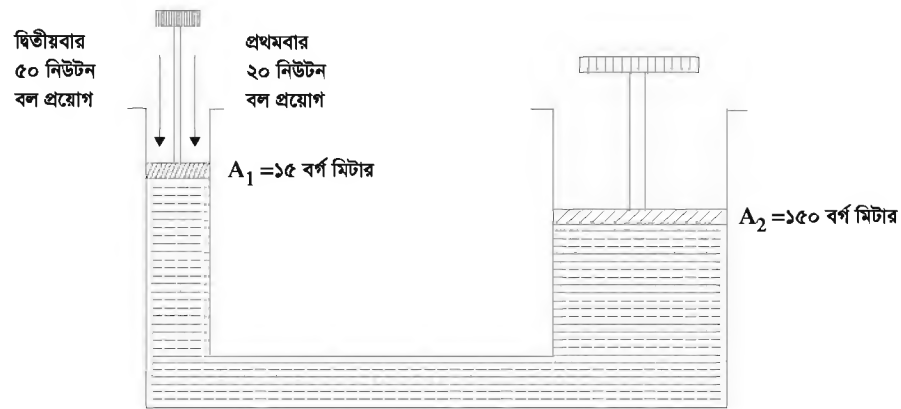
ক. কোন পাইপ দিয়ে পানি বের হবে না।

খ. পাইপটি দিয়ে পানি বের না হওয়ার কারণ লিখ।

গ. ২, ৩ ও ৪ নং পাইপ তিনটি বন্ধ করে দেওয়া হলে কী হবে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. পাইপগুলো দিয়ে বেরিয়ে আসা পানির গতিবেগের তুলনা কর।

২.



ক. চিত্রটি কোন সূত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগ?

খ. চিত্রটির সাহায্যে বল বৃদ্ধির নীতি ব্যাখ্যা কর।

গ. ২০ নিউটন বলের জন্য মোটা পিস্টনের ওপর উর্ধ্বমুখী চাপ নির্ণয় কর।

ঘ. A_1 পিস্টনে ৫০ নিউটন বল প্রয়োগে A_2 পিস্টনে চাপের ক্রিয়া ২০ নিউটন বলের সাথে তুলনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

বায়ুমণ্ডল

বায়ুমণ্ডল কী

বায়ু কী, সে সম্পর্কে তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে জেনেছ। বায়ু একটি পদার্থ। পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে বায়ু। বলা যায়, আমরা এক বিশাল গভীর বায়ু সমুদ্রের তলদেশে বাস করছি।

মাটি থেকে তুমি যদি উড়োজাহাজে করে উপরের দিকে উঠতে থাক, তবে কি একই রকম বায়ু পাবে? বায়ুর ঘনত্ব, উপাদান, উষ্ণতা কি একই রকম থাকবে? বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, যত উপরে উঠা যায় বায়ু তত হালকা হতে থাকে, বায়ুর উষ্ণতা, বায়ুর মধ্যে যে সব গ্যাস থাকে তাদের পরিমাণের পরিবর্তন হয়। অবশেষে বায়ুর অস্তিত্ব আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ঠিক কতদূর উচ্চতা পর্যন্ত বায়ু আছে তা এখনো সঠিকভাবে জানা যায়নি।

পৃথিবীকে ঘিরে বায়ুর এ যে বিশাল অদৃশ্য আবরণ আছে, তাকে বায়ুমণ্ডল বলে। পৃথিবীর আকর্ষণ বল বায়ুমণ্ডলকে তার পৃষ্ঠে ধরে রেখেছে। পৃথিবীর আবর্তনের সাথে সাথে সংলগ্ন বায়ুমণ্ডলও ঘুরছে।

বায়ুমণ্ডলের স্তর

বায়ুর উপাদান, ঘনত্ব, উষ্ণতা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বায়ুমণ্ডলকে পাঁচটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। তারা হল (১) ট্রোপোস্ফিয়ার বা ঘন মণ্ডল, (২) স্ট্রাটোস্ফিয়ার বা শান্তমণ্ডল, (৩) ওজোনোস্ফিয়ার বা ওজোনমণ্ডল, (৪) আয়নোস্ফিয়ার বা আয়নমণ্ডল, (৫) এক্সোস্ফিয়ার এবং ম্যাগনেটোস্ফিয়ার।

(১) ট্রোপোস্ফিয়ার বা ঘনমণ্ডল : এ স্তরটি বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে নিচের স্তর। ভূপৃষ্ঠকে স্পর্শ করে রেখেছে। বায়ুমণ্ডলের অধিকাংশ বায়ু ওজন হিসেবে শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ, এ স্তরে রয়েছে। এ স্তরের বায়ুতে ধূলিকণা, জলীয় বাষ্প, মেঘ থাকে। বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টি, ঝড় ও বজ্রপাত ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনা এ স্তরেই ঘটে। সেজন্য এ স্তরকে আবহাওয়া স্তরও বলে। এ স্তরের বায়ুর মধ্যে উষ্ণতার পার্থক্য দেখা যায়। ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরে উঠা যায় এ স্তরের বায়ুর ঘনত্ব ও উষ্ণতা তত কমে। প্রতি কিলোমিটার উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য প্রায় 10° সে. উষ্ণতা কমে। এ স্তরের সর্বনিম্ন উষ্ণতা -56° সে.। সবচেয়ে নিচে আছে বলে এ স্তরের বায়ুর চাপ ও ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। তাই এ স্তরকে ট্রোপোস্ফিয়ার বা ঘনমণ্ডল বলে। এ স্তর ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৬ কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত। আমরা এ স্তরেই বাস করি। দিনের বেলায় সূর্য রশ্মির প্রচণ্ড তাপ থেকে এ স্তর আমাদের রক্ষা করে। আবার এ স্তরের জন্যই রাতের বেলায় ঠাণ্ডা বেশি তীব্র হতে পারে না। আকাশ থেকে আসা বিভিন্ন মারাত্মক রশ্মি থেকেও এ স্তর আমাদের রক্ষা করে।

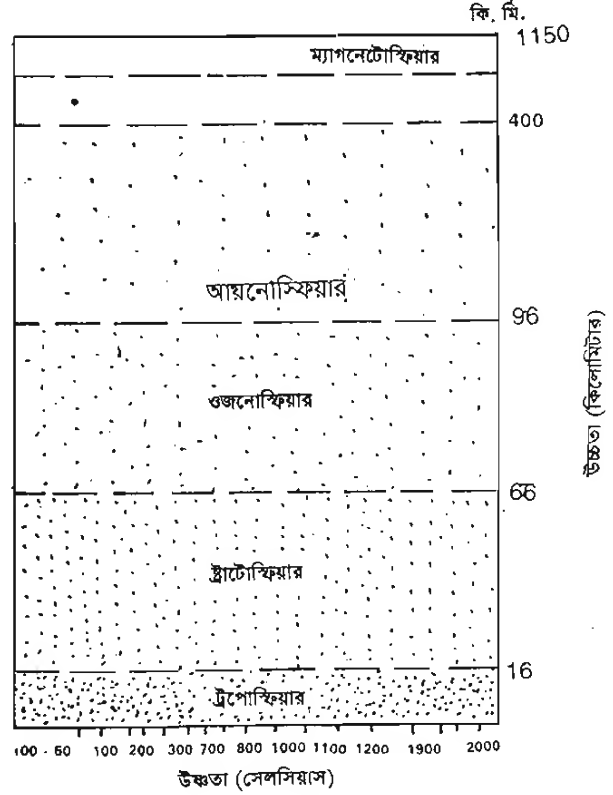
(২) স্ট্রাটোস্ফিয়ার বা শান্তমণ্ডল : ট্রোপোস্ফিয়ারের উপরের স্তরের নাম স্ট্রাটোস্ফিয়ার। এ স্তরের বিস্তৃতি প্রায় ৫০ কি.মি। এ অঞ্চলের বায়ু খুব পাতলা, জলীয় বাষ্প প্রায় নেই বললেই চলে। ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাতও হয় না। তাই এ স্তরকে শান্তমণ্ডল বলে। এ অঞ্চল খুব ঠাণ্ডা। উষ্ণতা প্রায় -56° সে. থেকে -60° সে.। উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে উষ্ণতা ধীরে ধীরে বাড়ে। সর্বোচ্চ অংশের উষ্ণতা বেড়ে 0° সে. হয়। এ স্তর দিয়ে সাধারণত জেট প্লেন উড়ে যায়।

(৩) ওজোনোস্ফিয়ার বা ওজোনমণ্ডল : এ স্তর স্ট্রাটোস্ফিয়ারের ঠিক উপর থেকে ৩০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এ স্তরে প্রধানত রয়েছে ওজোন গ্যাস। তাই একে ওজোনমণ্ডল বলে। ওজোন গ্যাসের তাপ শোষণ করার ক্ষমতা অনেক বেশি। সূর্যের তাপ এবং অতিবেগুনী রশ্মি এ স্তর শোষণ করে। ফলে এ স্তরের উষ্ণতা বেশি। সর্বোচ্চ উষ্ণতা প্রায় 20° সে.। উপরের শেষ অংশে আবার উষ্ণতা কমে প্রায় -90° সে. হয়। উপরের দিকে ওজোন গ্যাস হালকা হয়ে যায় বলে উষ্ণতা কমে। অতিবেগুনী রশ্মি জীব জগতের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এ স্তর অতিবেগুনী রশ্মি শোষণ করে পৃথিবীর জীব জগতকে রক্ষা করে।

(৪) আয়নোস্ফিয়ার বা আয়নমণ্ডল : ওজোনমণ্ডলের উপরের স্তরের নাম আয়নমণ্ডল। ওজোনমণ্ডলের শেষ থেকে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত এ স্তর বিস্তৃত। এ স্তরের বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম প্রভৃতি হালকা গ্যাসের কণা চার্জিত অবস্থায় থাকে। চার্জিত কণাকে আয়ন বলে। তাই এ স্তরের নাম আয়নমণ্ডল। এ স্তরের বিশেষত্ব হচ্ছে, এ বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত করতে পারে।

রেডিও স্টেশন থেকে প্রচারিত বেতার তরঙ্গ এ স্তরে প্রতিফলিত হয়ে অনেকদূর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। তাই তোমরা যারা রেডিও স্টেশন থেকে অনেক দূরে আছো, তারাও রেডিও অনুষ্ঠান তোমাদের রেডিওতে ধরে শুনতে পার। এ স্তরে মেবুজ্যোতি দেখা যায়। সূর্য থেকে আসা বিভিন্ন রশ্মি শোষণ করে বলে এ স্তরের উষ্ণতা অনেক বেশি। গড় উষ্ণতা প্রায় 1100° সে। এ স্তরে উষ্ণতা পাত হয়।

(৫) এক্সোস্ফিয়ার এবং ম্যাগনেটোস্ফিয়ার : আয়নমণ্ডলের উপরের এ দুইটি বায়ুমণ্ডলের সর্বোচ্চ স্তর। এর পরেই মহাশূন্যের শুরু। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪০০ কিমি উপর থেকে এ স্তর ৭৫০ কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত। এ স্তরে বায়ু একেবারেই হালকা। প্রধানত হাইড্রোজেন গ্যাস আয়নিক অবস্থায় থাকে। নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন নেই। উষ্ণতা প্রায় 2000° সে।



চিত্র ৩.১ : বায়ুমণ্ডলের স্তর

বায়ুমণ্ডলের চাপ

আমরা জানি বায়ুর ওজন আছে। তাই কোনো নির্দিষ্ট বায়ু স্তরের উপর তার উপরের সব স্তরের বায়ুর ওজন পড়ে। ওজনের জন্য বায়ু নিচের দিকে বল প্রয়োগ করে। ফলে চাপের সৃষ্টি হয়। এভাবে বায়ুমণ্ডল তার সংলগ্ন যে কোন তলে যে চাপ দেয় তাকে বায়ুমণ্ডলের চাপ বলে।

চাপ বলতে একক ক্ষেত্রফলের ওপর প্রযুক্ত বলের মান বুঝায়। সুতরাং কোন স্থানে বায়ুমণ্ডলের চাপ বলতে একক ক্ষেত্রফলের ওপর বায়ুমণ্ডল কর্তৃক প্রযুক্ত বলের মান বুঝায়। এ বল একক ক্ষেত্রফলের ওপর বায়ুমণ্ডলের যে ওজন লম্বভাবে পড়ে তার সমান।

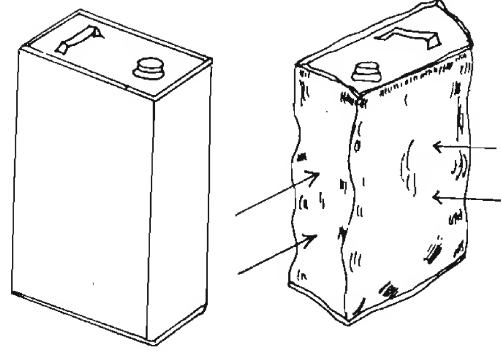
বায়ু খুব হালকা। বায়ুর ঘনত্ব পানির ঘনত্বের প্রায় ১০০০ ভাগের এক ভাগ। কিন্তু বায়ুমণ্ডল ভূপৃষ্ঠের উপরে শত শত কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এ বিশাল গভীর বায়ুমণ্ডল আমাদের উপর অনেক চাপ দেয়। প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে এ চাপ প্রায় ১০ নিউটন অর্থাৎ ১ কিলোগ্রাম ওজনের সমান। আমরা সবসময় এ চাপের মধ্যে থেকে অভ্যস্ত হয়ে গেছি বলে সাধারণত বুঝতে পারি না। তা ছাড়া আমাদের শরীরের ভেতরেও বায়ু আছে। শরীরের ভেতরের বায়ুর চাপ বাইরের চাপের সাথে সমতা রক্ষা করে। আমাদের রক্তেও চাপ আছে। এ চাপ বায়ুমণ্ডলের চাপের চেয়ে সামান্য বেশি। ভূপৃষ্ঠ বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে নিচে অবস্থিত। তাই ভূপৃষ্ঠের উপর বায়ুমণ্ডলের চাপ সবচেয়ে বেশি। যত উপরে ওঠা যায় চাপ তত কমতে থাকে, কারণ উপরে বায়ুর পরিমাণ কম।

বায়ু সবদিকে চাপ দেয়

বায়ু শুধু নিচের দিকে চাপ দেয় না। তরলের মত বায়ু সবদিকেই চাপ দেয়। কয়েকটি পরীক্ষা করলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

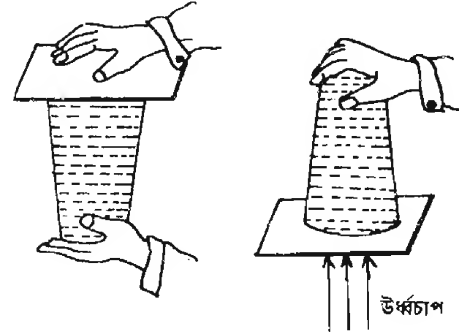
পরীক্ষা ১ : বায়ু পার্শ্ব চাপ দেয়। একটি পাতলা টিনের পাত্র নাও। দেখে নিতে হবে পাত্রের মুখ যেন শক্ত করে আটকানো যায়। প্রথমে মুখ খুলে টিনে অল্প পরিমাণ পানি ভর। কোন কিছু দিয়ে গরম করে পানি ফোটাও।

পানি ফুটে বাষ্প হয়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবে। কিছুক্ষণ পর প্রায় সবটুকু পানি বাষ্প হয়ে বেরিয়ে যাবার আগে তাপ দেওয়া বন্ধ কর। তাড়াতাড়ি টিনের মুখ শক্ত করে আটকাও যাতে বাইরের বায়ু ভিতরে ঢুকতে না পারে। এবার পানি ঢেলে পাত্রটিকে ঠাড়া কর। দেখবে পাত্রটি যত ঠাড়া হচ্ছে ওর চারপাশের দেয়াল তত ভেতরের দিকে ঢুকে যাচ্ছে। এর কারণ কী?



চিত্র ৩.২ : বায়ুর পার্শ্বচাপ

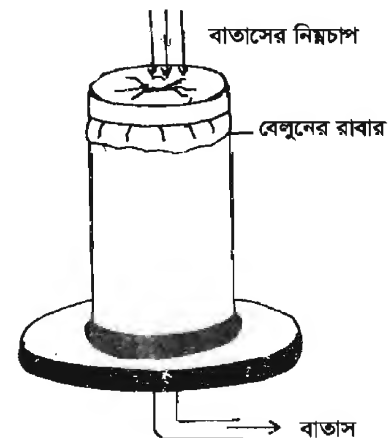
পরীক্ষা ২ : বায়ুর উর্ধ্বচাপ আছে। একটি কাচের গ্লাস কানায় কানায় পানি ভর্তি কর। একটি কার্ড গ্লাসের মুখ এমন ভাবে বসাও যেন ভেতরে কোন বায়ু না থাকে। এক হাত দিয়ে কার্ডটি চেপে ধরে অন্য হাত দিয়ে গ্লাসটি উল্টে দাও। এবার কার্ডটি ছেড়ে দাও। দেখবে, কার্ডটি গ্লাসের মুখে লেগেই আছে, নিচে পড়ে যাচ্ছে না। এ পরীক্ষা থেকে কী প্রমাণিত হল?



চিত্র ৩.৩ : বায়ুর উর্ধ্বচাপ

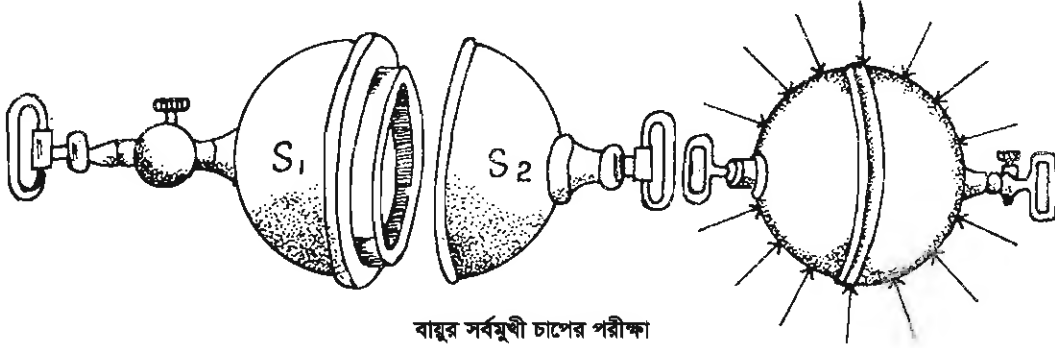
পরীক্ষা ৩ : বায়ুর নিম্নচাপ আছে। এক মুখ খোলা একটি টিনের পাত্র নেওয়া হল। পাত্রের নিচের দিকে একটি নল যুক্ত আছে। পাত্রের মুখ একটি পাতলা রবারের পর্দা দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হল, যাতে বায়ু ভেতরে ঢুকতে না পারে। নিচের নল একটি বায়ু নিষ্কাশন পাম্পের সাথে যুক্ত করা হল।

এখন পাম্পের সাহায্যে পাত্রের বায়ু বের করতে থাকলে দেখা যাবে যে রবারের পর্দাটি ভিতরের দিকে ঢুকে যাচ্ছে। এক সময় সেটি সশব্দে ফেটে যাবে। বায়ুর নিম্নচাপের কারণেই এরূপ ঘটে। প্রথমে পাত্রের ভেতরে বায়ু ছিল, বাইরে বায়ু ছিল। পর্দার দুই পাশেই বায়ুর চাপ সমান ছিল বলে পর্দা টান হয়ে ছিল। পরে ভেতরের বায়ু বের করে নেওয়ার ফলে ভেতরের বায়ুর চাপও কমে যায়। বাইরের বায়ুর নিম্নচাপের ফলে তখন পর্দা ভেতরের দিকে ঢুকে যায় এবং একসময় ফেটে যায়। সুতরাং এ পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হল যে বায়ুর নিম্নচাপ আছে।



চিত্র ৩.৪ : বায়ুর নিম্নচাপ

পরীক্ষা ৪ : বায়ু সবদিকে চাপ দেয় ম্যাগডেবার্গ এর অর্ধগোলক পরীক্ষা : ১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে জার্মানীর ম্যাগডেবার্গ শহরের মেয়র অটো ভন গেরিক বায়ু চাপের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য এ পরীক্ষাটি করেন। তিনি দুইটি শক্ত ধাতব ফাঁপা অর্ধগোলক ব্যবহার করেন। অর্ধগোলক দুইটি এমন মাপে তৈরি যে মুখে মুখে বায়ুরোধীভাবে লাগানো যায়। একটি অর্ধগোলকের সাথে একটি নল লাগানো ছিল। এ নলের ছিদ্র দিয়ে গোলকের ভিতরের বাতাস বের করে নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। অর্ধগোলক দুইটিকে মুখেমুখে লাগিয়ে বায়ু নিষ্কাশন পাম্পের সাহায্যে তিনি গোলকের বায়ু বের করে নেন। দেখা যায় যে হাতল ধরে অনেক জোরে টান দিয়েও অর্ধগোলক দুইটিকে পৃথক করা যাচ্ছে না। এর কারণ হল, গোলকের ভেতরের প্রায় সব বায়ু বের করে ফেলায় ভেতরের বায়ু চাপ প্রায় ছিল না বললেই চলে। ফলে বাইরের বায়ুর চাপ সবদিকে থেকে অর্ধগোলক দুইটিকে সজোরে চেপে ধরে। গোলকের ভেতরে বায়ু থাকলে কিন্তু অর্ধগোলক দুইটিকে সহজেই পৃথক করা যায়। কারণ তখন ভেতরের এবং বাইরের বায়ুর চাপ সমান থাকে। এ পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয় যে বায়ুমণ্ডল সবদিকে চাপ দেয়।



চিত্র ৩.৫ : ম্যাগডেবার্গ এর অর্ধগোলক পরীক্ষা

গেরিক তার মূল পরীক্ষায় প্রায় ৬০ সেমি ব্যাসের দুইটি অর্ধগোলক ব্যবহার করেন। বায়ুশূন্য অবস্থায় এক এক দিকে আটটি করে দুই দিকে মোট ষোলটি ঘোড়া দিয়ে টেনেও অর্ধগোলক দুইটিকে পৃথক করা যায় নাই। সুতরাং চিন্তা করে দেখ বায়ুমণ্ডলের চাপ কত বেশি।

টরিসেলির পরীক্ষা

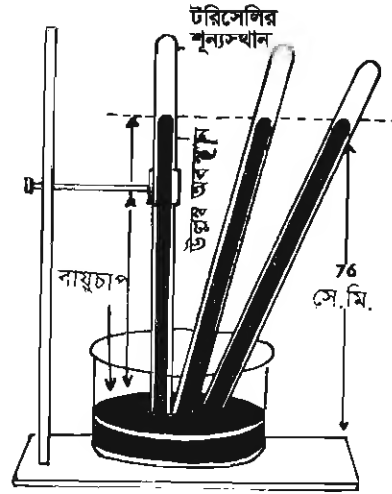
টরিসেলি একজন ইটালীর বিজ্ঞানী ছিলেন। ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনিই সর্বপ্রথম বায়ুমণ্ডলের চাপ পরিমাপ করেন। তিনি এক সেন্টিমিটার ব্যাসের একমুখ বন্ধ এক মিটার লম্বা একটি শক্ত কাচ নল পারদ দিয়ে কানায় কানায় ভর্তি করেন। নলের খোলা মুখ বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে বন্ধ করে উন্টিয়ে নলটিকে একটি পারদপূর্ণ পাত্রে ডোবান। কাচনলটিকে খাড়াভাবে ধরে রেখে খোলামুখ থেকে আঙ্গুল সরিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পারদের উচ্চতা কিছুটা নেমে যায়। পাত্রের পারদতল থেকে নলের পারদের উচ্চতা কমবেশি ৭৬ সেমি এ এসে স্থির হয়। নলের মধ্যে পারদের উপরের ফাঁকা অংশে কোন বায়ু নেই। বায়ুশূন্য এ অংশকে টরিসেলির শূন্যস্থান বলে।

এ ঘটনার ব্যাখ্যাস্বরূপ টরিসেলি বলেন যে, পাত্রের খোলা পারদের উপর বায়ুমণ্ডল নিচের দিকে চাপ দেয়। এ চাপ প্যাসকেলের সূত্রানুসারে অপরিবর্তিত থেকে নলের ভেতরের দিকে সম্ভালিত হয় এবং নলের মধ্যে পারদের উপরে উর্ধ্ব দিকে চাপ দেয়। এ চাপ নলের মধ্যের পারদের ওজনকে ধরে রাখে।

এমনিতেও দেখা যায় যে, নলের মধ্যে পারদস্তম্ভের উপরের ফাঁকা অংশ বায়ুশূন্য। অতএব সেখানে কোন বায়ু চাপ নেই। সুতরাং পাত্রের পারদের তলে নলের ভেতর চাপ শুধুমাত্র পারদস্তম্ভের চাপ। একই পারদ তলে নলের বাইরের চাপ হল বায়ুমণ্ডলের চাপ। এ চাপ সমান হওয়ায় একে অন্যকে সাম্য অবস্থায় রাখে। সুতরাং বায়ুমণ্ডলের চাপই নলের মধ্যে পারদস্তম্ভকে ঠেলে ধরে রাখে। বায়ুর চাপ না থাকলে অভিকর্ষের টানে নলের মধ্যের পারদস্তম্ভ নিচে নেমে যেত। টরিসেলির শূন্যস্থান যে বায়ুশূন্য তা সহজেই প্রমাণ করা যায়। কাচনলটির খোলামুখ পারদের মধ্যে ডোবানো



চিত্র ৩.৬ : টরিসেলির পরীক্ষা



চিত্র ৩.৭ : টরিসেলির শূন্য স্থান

অবস্থায় একে ধীরে ধীরে কাত করলে দেখা যাবে, শূন্যস্থানের দৈর্ঘ্য কমে যাচ্ছে, কিন্তু পারদস্তম্ভের উচ্চতা একই থাকছে। নলকে আরো কাত করলে দেখা যাবে যে, শূন্যস্থানের সবটাই পারদ দিয়ে পূর্ণ হয়েছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে টরিসেলির শূন্য স্থানে বায়ু থাকে না। প্রকৃতপক্ষে ঐ স্থান একেবারে শূন্য নয়। সামান্য পারদ বাষ্প থাকে।

কাচনলটির খোলামুখ পারদের মধ্যে রেখে নলটি ধীরে ধীরে নিচে নামালে বা উপরে উঠালে দেখা যায় যে, টরিসেলির শূন্যস্থানের দৈর্ঘ্য কমছে বা বাড়ছে। নলের মধ্যের পারদস্তম্ভের উচ্চতার কোন পরিবর্তন হয় না। এ থেকে বোঝা যায় যে, পারদস্তম্ভের উচ্চতা নির্ভর করে বায়ুমণ্ডলের চাপের ওপর। বায়ুমণ্ডলের চাপ যতটুকু ধরে রাখতে পারে পারদ ঠিক ততটুকু উপরে ওঠে।

টরিসেলির পরীক্ষা থেকে তাহলে আমরা কী কী জানলাম? আমরা জানলাম যে

- ১) একটি বায়ুশূন্য একমুখ খোলা নলে পারদ বায়ুমণ্ডলের চাপে উপরে ওঠে।
- ২) পারদের উচ্চতা ঠিক ততটুকু হবে যতটুকু বায়ুমণ্ডলের চাপ ধরে রাখতে পারে।
- ৩) নলের পারদস্তম্ভের চাপ বায়ুমণ্ডলের চাপের সমান।

টরিসেলি তার পরীক্ষায় পারদ ব্যবহার করলেও যে কোন তরল দিয়েই এ পরীক্ষা করা যায়। ফলাফল একই হবে। তবে তরলের উচ্চতা নির্ভর করবে তরলের ঘনত্বের ওপর। কম ঘনত্বের তরল হলে উচ্চতা বাড়বে। যেমন পানি ব্যবহার করলে নলে পানির উচ্চতা হবে ১০ মিটারেরও বেশি। কারণ পানির ঘনত্বের তুলনায় পারদের ঘনত্ব ১৩.৬ গুণ বেশি।

বায়ুমণ্ডলের চাপের পরিমাপ

টরিসেলির পরীক্ষায় আমরা দেখলাম যে, বায়ুমণ্ডলের চাপ নলের পারদস্তম্ভের চাপের সমান। পারদস্তম্ভের উচ্চতা যদি ৭৬ সেমি হয় তবে বায়ুমণ্ডলের চাপ ৭৬ সেমি পারদস্তম্ভের চাপের সমান। অর্থাৎ একক ক্ষেত্রফলের ৭৬ সেমি উচ্চতা বিশিষ্ট পারদস্তম্ভের যা ওজন তার সমান। এভাবেই টরিসেলি সর্বপ্রথম বায়ুমণ্ডলের চাপ পরিমাপ করেন। এ জন্য সাধারণত কোন স্থানের বায়ুমণ্ডলের চাপ পারদস্তম্ভের উচ্চতায় প্রকাশ করা হয়। যেমন বায়ুমণ্ডলের চাপ ৭৬ সেমি পারদ। এর অর্থ, চাপ হল, ৭৬ সেমি উচ্চতা বিশিষ্ট পারদস্তম্ভের চাপ।

স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় চাপ

ভূ-পৃষ্ঠের সব জায়গায় বায়ুমণ্ডলের চাপ সমান নয়। উচ্চতা, অক্ষাংশ এবং বায়ুর উষ্ণতার ওপর কোন স্থানের বায়ুমণ্ডলের চাপ নির্ভর করে। তাই একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায়, নির্দিষ্ট অক্ষাংশে এবং নির্দিষ্ট উষ্ণতায় বায়ুমণ্ডলের চাপকে আদর্শ হিসেবে ধরা হয়। এ নির্দিষ্ট উচ্চতা হল সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা, নির্দিষ্ট অক্ষাংশ ৪৫° এবং নির্দিষ্ট উষ্ণতা ০° সে.। অর্থাৎ ৪৫° অক্ষাংশের সমুদ্র পৃষ্ঠে ০° উষ্ণতায় ৭৬ সেমি বিশুদ্ধ শুষ্ক পারদস্তম্ভের চাপকে আদর্শ বা স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বলে। এ চাপ কে এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বা এক 'বার' বলে।

ব্যারোমিটার

বায়ুমণ্ডলের চাপ পরিমাপের জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তার নাম ব্যারোমিটার। ব্যারোমিটার বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। কোনটিতে তরল ব্যবহার করা হয়। যেমন : পারদ ব্যারোমিটার, পানি ব্যারোমিটার। আবার কোনটি তরলহীন। যেমন : অ্যানেরয়েড ব্যারোমিটার। সূক্ষ্ম পরিমাপের জন্য যে ব্যারোমিটার ব্যবহার করা হয় তার নাম ফরটিন ব্যারোমিটার। এ ব্যারোমিটারের গঠন কিছুটা জটিল। তোমরা উপরের শ্রেণীতে জানবে।

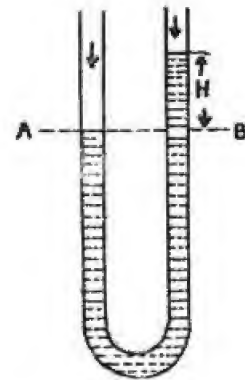
টরিসেলি তার পরীক্ষায় যে যন্ত্রটি ব্যবহার করেছিলেন সেটি একটি সরল পারদ ব্যারোমিটার। অর্থাৎ এটি এক বর্গ সেন্টিমিটার ব্যাসের একটি এক মিটার লম্বা এক মুখ বন্ধ পুরু দেয়ালের কাচনল। নলটি পারদ দিয়ে ভর্তি করা হয়। লম্ব রাখা হয় যেন ভেতরে কোন বাতাসের বুদবুদ না থাকে। এরপর আঙ্গুল দিয়ে খোলামুখ বন্ধ করে উপড় করে ঝাড়াভাবে একটি পারদ পূর্ণ পাত্রে ডুবিয়ে আঙ্গুল সরিয়ে নেওয়া হয়। নলের মধ্যে পারদ কিছুটা নিচে নেমে যেখানে স্থির হয়, পাত্রের পারদস্তল থেকে তার উচ্চতাই বায়ুমণ্ডলের চাপ। উচ্চতা মাপার জন্য একটি স্কেল লাগানো থাকে। যেখানে বায়ুমণ্ডলের চাপ খুব সূক্ষ্মভাবে জানার প্রয়োজন হয় না, সেখানে চাপ মাপার জন্য সরল পারদ ব্যারোমিটার ব্যবহার করা হয়। বায়ুর চাপ বাড়লে পারদস্তম্ভের উচ্চতা বাড়ে, চাপ কমলে উচ্চতা কমে।



চিত্র ৩.৮ : সরল পারদ ব্যারোমিটার

ম্যানোমিটার

ম্যানোমিটার হল চাপের পার্থক্য পরিমাপের একটি কৌশল। এটি একটি U আকৃতির দুই মুখ খোলা কাচনল। নলটি কোন তরল দিয়ে আংশিক পূর্ণ থাকে। চাপের বেশি পার্থক্য মাপার জন্য পারদ, আর কম পার্থক্য মাপার জন্য তেল, এলকোহল বা পানি ব্যবহার করা হয়। নলের দুই মুখই যখন খোলা থাকে তখন বায়ুর চাপ দুইদিকেই সমান। সুতরাং তরলের উচ্চতাও দুই দিকে সমান। এখন যদি একদিকে চাপ বৃদ্ধি করা যায়, ধর ফুঁ দিয়ে, তাহলে সেদিকে তরলের উচ্চতা কমে যাবে। অপর দিকের উচ্চতা বেড়ে যাবে। যেমন : চিত্রে দেখানো হয়েছে। তরলের স্থির অবস্থায় A এবং B একই তলে অবস্থিত। সুতরাং A এবং B তে চাপও সমান। B তে চাপ হল বায়ুমণ্ডলের চাপ ও H উচ্চতার তরলের চাপের যোগফলের সমান। কাচনলের দুই দিকের চাপের পার্থক্য H এর উচ্চতা থেকে বের করা যায়।



চিত্র ৩.৯ : ম্যানোমিটার

বায়ুর চাপ ও আবহাওয়ার পরিবর্তন

“বজ্রোপসাগরে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রভাবে উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় হতে পারে”। এ ধরনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস হয়তো তোমরা রেডিও, টেলিভিশনে শুনে থাকবে বা খবরের কাগজে পড়ে থাকবে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য বায়ুর চাপ জানা একান্ত প্রয়োজন। বায়ুর চাপের ওপর আবহাওয়ার অবস্থা নির্ভর করে। কারণ বায়ুর চাপ নির্ভর করে বায়ুর উষ্ণতা এবং বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণের উপর। বায়ুর উষ্ণতা বাড়লে বায়ু হালকা হয়ে যায়। তাই বায়ুর চাপ কমে। জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়লেও বায়ুর চাপ কমে, কারণ জলীয় বাষ্পের ওজন শুষ্ক বায়ুর ওজনের চেয়ে কম। সুতরাং কোন স্থানে বায়ু চাপের পরিবর্তন লক্ষ করে আবহাওয়া সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়া যায়।

বায়ুচাপ ধীরে ধীরে কমতে থাকলে বুঝতে হবে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে গেছে। সুতরাং বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বায়ুচাপ হঠাৎ করে কমে গেলে বুঝতে হবে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং চারদিক থেকে বায়ু দ্রুতগতিতে ঐ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা ঝড় বা ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস।

বায়ুচাপ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকলে বুঝতে হবে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমছে। অর্থাৎ আবহাওয়ার উন্নতি হচ্ছে। আবহাওয়া শুষ্ক এবং আকাশ পরিষ্কার থাকবে। এভাবে বায়ুচাপ থেকে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া যায়। বায়ুচাপ জানা যায় ব্যারোমিটারের পাঠ থেকে। ব্যারোমিটারে পারদস্তম্ভের উচ্চতা বাড়া মানে চাপ বাড়া, উচ্চতা কমা মানে চাপ কমা।

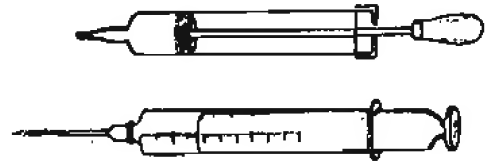
বায়ুচাপের ব্যবহার

দৈনন্দিন জীবনে বায়ুচাপের অনেক ব্যবহারিক প্রয়োগ রয়েছে। কোকাকোলা, সেভেন আপ বা অন্য কোন পানীয় পান করতে আমরা অনেক সময় প্লাস্টিকের সরু নল বা স্ট্র ব্যবহার করি। সে সময় আমরা কী করি? নলের এক প্রান্ত পানীয়তে ডুবিয়ে অপর প্রান্ত দিয়ে নলের ভিতরের বাতাস মুখ দিয়ে টেনে নিই। ফলে নলের ভেতর বায়ুর চাপ কমে যায়। বাইরের বায়ুচাপ তখন পানীয়কে নলের ভেতর দিয়ে ঠেলে আমাদের মুখে পাঠিয়ে দেয়।



চিত্র ৩.১০ : স্ট্র - এর সাহায্যে পান করা

ভূমি কি কখনো কোন ডাক্তারকে ইনজেকশন দিতে দেখেছে? ডাক্তাররা ইনজেকশন দেয়ার জন্য যে সিরিঞ্জ ব্যবহার করেন তার মুখে একটি সরু ছিদ্রযুক্ত সূচ থাকে। সূচ তরল ঔষধে ডুবিয়ে পিস্টনটি উপরের দিকে টান দিলে পিস্টনের নিচের অংশে নলের ভিতরে আংশিক বায়ুশূন্য হয়। (পিস্টন নলের গায়ে আঁটা থাকে, তার ভিতর দিয়ে বায়ু ঢুকতে পারে না) ফলে নলের ভেতরের চাপ কমে যায়। বাইরের বেশি বায়ুচাপে তখন তরল নলে প্রবেশ করে। সূচটি তরল থেকে বের করে আনলেও বায়ুচাপের কারণে তরল সূচের ছিদ্র বের হয়ে আসতে পারে না। সূচ শরীরে ঢুকিয়ে পিস্টনে চাপ দিলে সেই চাপ বেশি হওয়ায় তখন তরল ঔষধ সূচের মুখ দিয়ে বেরিয়ে শরীরে প্রবেশ করে। পিচকারিও একই নীতিতে কাজ করে।



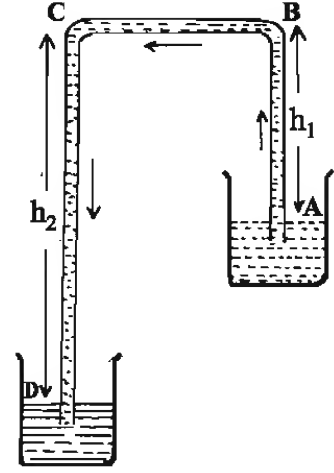
চিত্র ৩.১১ : পিচকারি ও সিরিঞ্জ

সাইফন

পাত্রকে না সরিয়ে এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে তরল স্থানান্তরের কৌশলকে সাইফন বলে। এটা একটি দুই মুখ খোলা রবার, কাচ বা প্লাস্টিকের U আকৃতির (h_1 , h_2) নল। নলের দুই বাহুর দৈর্ঘ্য অসমান। যে তরল স্থানান্তরিত করতে হবে সেই তরল দিয়ে নলটি পূর্ণ করে ছোট বাহুকে যে পাত্র থেকে তরল স্থানান্তরিত করতে হবে সেই পাত্রে ডুবানো হয়। লম্বাবাহু অন্য পাত্রে রাখা হয়। প্রথম পাত্র দ্বিতীয় পাত্র থেকে উচুতে রাখতে হবে। দেখা যাবে যে উপরের পাত্র থেকে নিচের পাত্রে তরল নলের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে স্থানান্তরিত হচ্ছে।

সাইফনের অনেক ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে। যেমন একটি বড় ড্রাম থেকে ছোট টিনে তেল ভরার জন্য সাইফন কৌশল ব্যবহার করা যায়। আধুনিক টয়লেটের ফ্লাশ একই নীতিতে কাজ করে।

বাইসাইকেল পাম্প এবং ভ্যাকুয়াম পাম্প বায়ু চাপের ব্যবহারিক প্রয়োগের আরো দুইটি উদাহরণ। তোমার যদি সাইকেল থেকে থাকে বা তুমি যদি ফুটবল খেল, তবে বাইসাইকেল পাম্প হয়ত তুমি নিজেই ব্যবহার করেছ। ভ্যাকুয়াম পাম্পের নীতি অনেক সময় গাড়ির ব্রেকে ব্যবহার করা হয়।



চিত্র ৩.১২ : সাইফন

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হবে?

ক. ঘনমণ্ডল	খ. শান্তমণ্ডল
গ. ওজোনমণ্ডল	ঘ. আয়নমণ্ডল
২. প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক চাপ কত?

ক. ১০ নিউটন	খ. ১০০ নিউটন
গ. ১০০০ নিউটন	ঘ. ১০,০০০ নিউটন
৩. টরিসেলির শূন্যস্থানে কী থাকে?

ক. কিছুই থাকে না	খ. বায়ু থাকে
গ. সামান্য পারদ বাষ্প থাকে	ঘ. জলীয় বাষ্প থাকে

নিচের ভথের আলোকে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

পাতলা প্লাস্টিকের একটি বোতলের অর্ধেক হালকা গরম পানিতে ভর্তি করা হল। বোতলটি ফ্রিজে রেখে দেওয়া হল। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল বোতলটি চুপসে গেছে। কিন্তু অর্ধ বোতল ঠান্ডা পানি রাখলে ঘটনাটি দেখা যায় না।

৪. বোতলটি চুপশে যাওয়ার কারণ

ক. বোতলের বাহিরের ও ভেতরের বায়ুর চাপ অসমান হওয়া
খ. ফ্রিজের নিজস্ব বায়ুচাপের জন্য
গ. হঠাৎ করে ঠান্ডা করার জন্য
ঘ. ফ্রিজে আবদ্ধ রাখার জন্য
৫. ঠান্ডা পানি রাখলে ঘটনাটি দেখা যায় না। কারণ এ ক্ষেত্রে

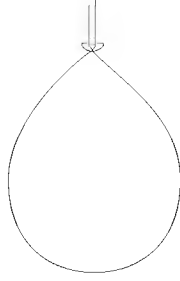
i. পানিতে জলীয় বাষ্প থাকে না
ii. বোতলের ভেতরের এবং বাহিরের বায়ুর চাপ সমান থাকে
iii. বোতলের ভেতরে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ নগণ্য হওয়ায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |
৬. শান্তমণ্ডলের সর্বোচ্চ স্তরে যদি এক গ্রাস পানি রাখা হয় তাহলে পানির তাপমাত্রা হবে

ক. 56°C	খ. 30°C
গ. 0°C	ঘ. 80°C

৭.



প্রথম বেলুন



দ্বিতীয় বেলুন

চিত্রের দ্বিতীয় বেলুনটি চূপসে যাওয়ার কারণ

- | | |
|----------------------|------------------------|
| ক. বায়ুর পার্শ্বচাপ | খ. বায়ুর উর্ধ্বচাপ |
| গ. বায়ুর নিম্নচাপ | ঘ. বায়ুর সর্বদিকে চাপ |

সৃজনশীল প্রশ্ন

- এক মিটার লম্বা একটি কাচনল নেওয়া হল। যার একমুখ বন্ধ অন্য মুখ খোলা। খোলা মুখের ক্ষেত্রফল ১ বর্গ সেন্টিমিটার। নলটিকে বায়ুশূন্য করে একটি পারদপূর্ণ পাত্রে প্রথম লম্বভাবে ডুবানো হল। পারদ কাচনলের ভেতর দিয়ে উপরে উঠল। এরপর একই আকৃতির অপর একটি বায়ুপূর্ণ কাচনল ডুবানো হল।
 - কী কারণে পারদ ওপরে উঠল ?
 - পারদ সম্ভাব্য কতটুকু ওপরে উঠবে যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।
 - বায়ুপূর্ণ কাচনলটি ডুবানোর পর পারদের অবস্থান ব্যাখ্যা কর।
 - এ ক্ষেত্রে পারদের পরিবর্তে পানি ব্যবহার করা যায় কিনা তোমার মতামত দাও।
- ছলিমের খুব জ্বর হওয়ায় মাথায় পানি ঢালার প্রয়োজন হয়। মা কাজে ব্যস্ততার কারণে একটি বালতিতে কিছু পানি নিয়ে বালতিটি ঝুলিয়ে দিল। তাতে একটি রাবারের নল লাগিয়ে নলের মাধ্যমে কিছু পানি মুখ দিয়ে শুষে নিয়ে পানি ঢালার ব্যবস্থা নিলেন।
 - পানি ঢালার ব্যবস্থাটির নাম কী ?
 - শুরুতে মা নল দিয়ে কিছু পানি শুষে নিলেন কেন ?
 - পানি ঢালার সম্ভাব্য কৌশলটি ব্যাখ্যা কর।
 - আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এ পদ্ধতিটির ব্যবহার আলোচনা কর।
- হিমালয় পর্বতের উচ্চতা প্রায় ৭ কিলোমিটার। পর্বতের চূড়ায় বরফ আবৃত। এপ্রিল মে মাসে যখন হিমালয়ের পাদদেশে তাপমাত্রা ৪০° সেলসিয়াস। তখন একদল পর্বতারোহী হিমালয়ে আরোহণ শুরু করল।
 - হিমালয় পর্বতটি বায়ু মণ্ডলের কোন স্তরে অবস্থিত ?
 - আরোহণের সময় আরোহীর কী ধরনের বায়ুচাপ অনুভব করবে ব্যাখ্যা কর।
 - পর্বতের সর্বোচ্চ চূড়ার তাপমাত্রা নির্ণয় কর।
 - পর্বতের কত উচ্চতা থেকে বরফ পড়া শুরু হবে প্রতি কিলোমিটারে তাপমাত্রার পরিবর্তন উল্লেখ করে নির্ণয় কর।

চতুর্থ অধ্যায়

অক্সিজেন

অক্সিজেন বায়ুর একটি উপাদান

ষষ্ঠ শ্রেণীতে আমরা জেনেছি যে বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ। বায়ুর দুইটি প্রধান উপাদান হল অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন। এ ছাড়াও বায়ুর মধ্যে মিশ্রিত আছে কার্বন ডাই অক্সাইড, জলীয় বাষ্প, নিষ্ক্রিয় গ্যাস ও ধূলিকণা। আয়তন ও ওজন হিসেবে বায়ুর উপাদানগুলোর শতকরা পরিমাণ তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে জেনেছ। বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা জেনেছি যে বাতাসের পাঁচভাগের একভাগ অক্সিজেন এবং প্রায় চার ভাগই নাইট্রোজেন। সুতরাং একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে বায়ুর দুইটি প্রধান উপাদানের মধ্যে একটি অক্সিজেন এবং অপরটি নাইট্রোজেন।

অক্সিজেন সম্পর্কে সাধারণ ধারণা

১৭৭৪ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী জোসেফ প্রিস্টলি সর্বপ্রথম অক্সিজেন আবিষ্কার করেন। তিনি পারদের একটি অক্সাইডকে (Mercuric Oxide) তাপের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে এ গ্যাস প্রস্তুত করেছিলেন। প্রায় একই সময়ে সুইডিশ বিজ্ঞানী কার্লশীলে ও ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিঁয়ে পৃথক পৃথকভাবে পরীক্ষা চালিয়ে এ গ্যাস আবিষ্কার করেন। ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিঁয়ে এ গ্যাসের অনেকগুলো ধর্ম পরীক্ষা করে এর নাম দেন অক্সিজেন। অক্সিজেন কথাটির অর্থ অগ্নি উৎপাদক। বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিঁয়ে মনে করতেন যে অক্সিজেন প্রায় সকল অগ্নি বা এসিডের একটি উপাদান। তাই তিনি এর নাম দিয়েছিলেন অক্সিজেন।

অক্সিজেনের প্রস্তুত প্রণালি

যে সমস্ত যৌগিক পদার্থে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন আছে তাদের যে কোন একটিকে উত্তপ্ত করে পরীক্ষাগারে অক্সিজেন প্রস্তুত করা যেতে পারে। ষষ্ঠ শ্রেণীতে আমরা জেনেছি যে সামান্য সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত পানির মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালিয়ে অক্সিজেন পাওয়া যায়। তবে এটি অক্সিজেন প্রস্তুতের ভাল উপায় নয়। কারণ এতে খুব ধীরগতিতে সামান্য অক্সিজেন উৎপন্ন হয় এবং খরচও বেশি। সাধারণ বিদ্যালয়ে পরীক্ষাগারে দুইটি পদ্ধতিতে অক্সিজেন তৈরি করা হয়। যথা:

(১) হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ও ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড মিশিয়ে।

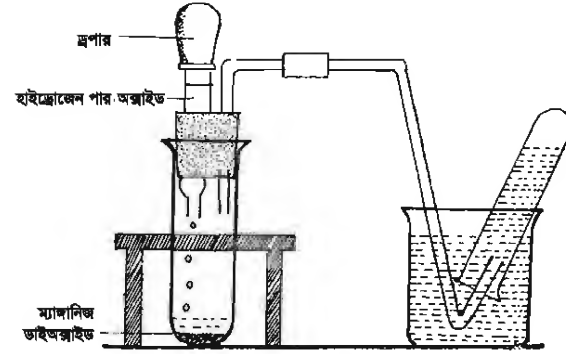
(২) পটাশিয়াম ক্লোরেট ও ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইডের মিশ্রণকে উত্তপ্ত করে।

এসো, পরীক্ষাগারে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ও ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড মিশিয়ে অক্সিজেন প্রস্তুত করি।

পরীক্ষা : এ পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন একটি মোটা টেস্টটিউব, গ্যাস সংগ্রহের জন্য ৫/৬ টি ছোট টেস্টটিউব, একটি ড্রপার, একটি নির্গম নল, একটি পানি ভর্তি বিকার, টেস্টটিউব স্ট্যান্ড, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড, ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড। পরীক্ষার মোটা টেস্টটিউবের মধ্যে সামান্য পরিমাণ (একটি পঞ্চাশ পয়সা মুদ্রার উপর যতটুকু ধরে) ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড নাও।

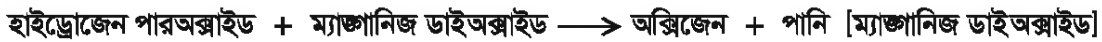
টেস্টটিউবটির মুখ দুই ছিদ্র বিশিষ্ট রবার বা কাঠের কর্ক দ্বারা বন্ধ কর। ড্রপারে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড নাও এবং ড্রপারটি কর্কের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে টেস্টটিউবে ঢুকাও। কর্কের অন্য ছিদ্রটির মধ্য দিয়ে একটি নির্গম নল প্রবেশ করাও এবং নির্গম নলের শেষ প্রান্তটি পানি ভর্তি বিকারের মধ্যে স্থাপন কর। ড্রপার ও নির্গম নলের গোড়ায় কর্কের উপর ভাল করে মোম দিয়ে বন্ধ কর। একটি পানিপূর্ণ টেস্টটিউব নির্গম নলের উপর এমনভাবে উপুড় করে ধর যেন নির্গম নলের শেষ প্রান্ত টেস্টটিউবের মধ্যে থাকে।

ড্রপারে চাপ দিয়ে কয়েক ফোঁটা হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের উপর ফেল এবং ভালভাবে লক্ষ কর। কী দেখছ? টেস্টটিউবের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু হয়েছে। নির্গম নলের মধ্য দিয়ে এসে টেস্টটিউবের মধ্যে গ্যাসের বুদবুদ উঠছে এবং টেস্টটিউবের পানি ধীরে ধীরে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। টেস্টটিউবের পানি যখন সম্পূর্ণ নেমে যাবে তখন বুঝবে টেস্টটিউবটি গ্যাসে ভরে গেছে। গ্যাসপূর্ণ টেস্টটিউবটির মুখ খুব সাবধানে বন্ধ আঙ্গুলের সাহায্যে বন্ধ করে তুলে আনো এবং ছিপি দিয়ে বন্ধ করে টেস্টটিউব স্ট্যান্ডে রেখে দাও। এভাবে অক্সিজেন গ্যাসের বিভিন্ন ধর্মগুলো পরীক্ষা করার জন্য ৫/৬ টি টেস্টটিউব গ্যাস দ্বারা পূর্ণ করে মুখে কর্ক লাগিয়ে বন্ধ করে রেখে দাও এবং টেস্টটিউবে সংগৃহীত গ্যাস দিয়ে অক্সিজেন গ্যাসের ধর্মগুলো পরীক্ষা কর।



চিত্র ৪.১ : হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড থেকে অক্সিজেন প্রস্তুতি

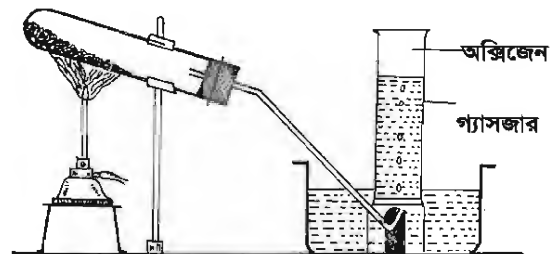
তোমরা লক্ষ করেছ পানিপূর্ণ টেস্টটিউবের পানিকে নিচের দিকে ঠেলে নামিয়ে দিয়ে টেস্টটিউব গ্যাস দ্বারা পূর্ণ হয়েছে। এভাবে গ্যাস সংগ্রহ করার পদ্ধতিকে পানির নিম্নস্থরী অপসারণ প্রক্রিয়া বলে। এ পরীক্ষায় আমরা মোটা টেস্টটিউবটির মধ্যে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ও ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড নিয়েছিলাম। এ দুইটি রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটেছে কি? হ্যাঁ, রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটেছে। বিক্রিয়াটিকে আমরা কথার মাধ্যমে নিম্নরূপে প্রকাশ করতে পারি।



তোমরা লক্ষ করেছ হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ভেঙে গিয়ে পানি ও অক্সিজেন তৈরি হয়েছে। ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেনি। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যখন অংশগ্রহণ করেনি তখন ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড ব্যবহারের কারণ কী? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা একটু পরে জানব। তার পূর্বে পরীক্ষাগারে যদি হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড না থাকে তাহলে কীভাবে অক্সিজেন গ্যাস প্রস্তুত করা যায় তা জানব।

বিদ্যালয়ে যদি হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড না থাকে তবে পটাশিয়াম ক্লোরেট ও ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের মিশ্রণকে তাপ দিয়ে অক্সিজেন গ্যাস প্রস্তুত করা যায়। শুধু পটাশিয়াম ক্লোরেটকে তাপ দিলেও অক্সিজেন পাওয়া যায়। তবে এতে অনেক বেশি সময় লাগে এবং অধিক তাপের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সামান্য পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড পটাশিয়াম ক্লোরেটের সাথে মিশিয়ে নিলে অনেক কম তাপে এবং অল্প সময়ে অক্সিজেন উৎপন্ন হয়।

পরীক্ষা : ৫ ভাগ পটাশিয়াম ক্লোরেট ও ১ ভাগ ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড একত্রে ভালভাবে মেশাও। মিশ্রণটি একটা চওড়া শক্ত টেস্টটিউবে নাও। টেস্টটিউবের মুখ এক ছিদ্রবিশিষ্ট একটি রবারের কর্ক দ্বারা বন্ধ কর ও একটি নির্গমন নল সংযুক্ত কর। এবার টেস্টটিউবটি একটি স্ট্যান্ডের সাথে চিত্র ৪.২ এর মত করে আটকাও। নির্গম নলের বাইরের মুখটি একটি পানিপূর্ণ পাত্রের মধ্যে ডুবাও।



চিত্র ৪.২ : পটাশিয়াম ক্লোরেট থেকে অক্সিজেন তৈরি

এখন টেস্টটিউবে আস্তে আস্তে তাপ দাও। নির্গম নলের মুখ দিয়ে বুদবুদের আকারে অক্সিজেন বের হয়ে আসবে। প্রথমে কিছু গ্যাস বের হতে দাও। কেন বলতে পার? এতে টেস্টটিউবের ভেতরের বায়ুও বের হয়ে আসবে।

এবার পানি ভরা টেস্টটিউব নির্গম নলের মুখে উপুড় করে ধরে অক্সিজেন সংগ্রহ কর। এখানে যে রাসায়নিক বিক্রিয়াটি ঘটেছে তা হল :



অনুঘটক বা প্রভাবক

হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড কিংবা পটাশিয়াম ক্লোরেট থেকে অক্সিজেন প্রস্তুতের সময় আমরা ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করেছি। আমরা লক্ষ করেছি পরীক্ষা শেষে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড অপরিবর্তিত রয়েছে এবং ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেনি। আমরা পূর্বেই বলেছি শুধুমাত্র পটাশিয়াম ক্লোরেটকে তাপ দিলেই অক্সিজেন তৈরি হয়। তাতে অনেক বেশি সময় ও তাপের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সামান্য পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড মিশিয়ে নিলে খুব অল্প তাপে অনেক কম সময়ে অক্সিজেন তৈরি হয়। অনুবৃত্তভাবে, আলোর উপস্থিতিতে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ভেঙে অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। কিন্তু এ বিক্রিয়াটি খুব ধীর গতিতে কয়েক মাস ধরে চলে। সামান্য ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের উপস্থিতিতে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড খুব দ্রুত ভেঙে অক্সিজেন উৎপন্ন করে। উপরের কোন ক্ষেত্রেই ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড সরাসরি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেনি। এভাবে যে সব পদার্থ সরাসরি বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না, কিন্তু ঐ পদার্থের উপস্থিতি রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিকে ত্বরান্বিত অথবা হ্রাস করে এবং বিক্রিয়া শেষে পদার্থটি অপরিবর্তিত থাকে তাকে অনুঘটক বা প্রভাবক বলে। অক্সিজেন তৈরির ক্ষেত্রে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড একটি অনুঘটক। এটি নিজে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করে বিক্রিয়ার গতিকে বৃদ্ধি করতে পারে। বিষয়টি হয়তো তোমাদের ভাবিয়ে তুলেছে তা কেমন করে হয়? ধর, তুমি আবাহনী ও মোহামেডান দলের ফুটবল খেলা দেখার জন্য মাঠে গিয়েছ। এ দুইটি দলের মধ্যে তুমি একটি দলকে সমর্থন কর। তোমার মত ঐ দলের আরও অনেক সমর্থক অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে চিৎকার করছে, হাততালি দিয়ে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করছে। এতে কিন্তু খেলোয়াড়দের মনোবল বেমন বেড়ে যায়, খেলার গতি তেমনি বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে তোমরা নিজেরা খেলায় অংশগ্রহণ করনি, কিন্তু তোমাদের উপস্থিতি ও উৎসাহ খেলার গতিকে ত্বরান্বিত করতে পেরেছে। তোমরাও কিন্তু এক্ষেত্রে অনুঘটক বা প্রভাবকের কাজ করছ।

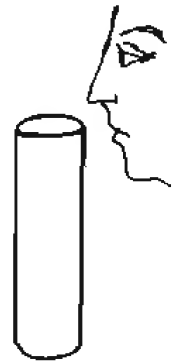
অক্সিজেনের ধর্ম

উপরের যে কোন একটি পদ্ধতিতে তোমরা ৫/৬ টি টেস্টটিউবে যে গ্যাস সংগ্রহ করেছ তা ব্যবহার করে অক্সিজেন গ্যাসের ধর্মগুলো পরীক্ষা কর।

(১) সংগৃহীত গ্যাসের একটি টেস্টটিউব হাতে নিয়ে ভাল করে পর্যবেক্ষণ কর। কী দেখছ? এ গ্যাসের কোন রং বা বর্ণ দেখা যাচ্ছে না। তাহলে বলা যায় অক্সিজেন একটি বর্ণহীন গ্যাস।

(২) গ্যাস ভর্তি টেস্টটিউবের মুখ খুলে গন্ধ নাও। কোন গন্ধ পেলো কী? কোন গন্ধ পাওয়া গেল না। অক্সিজেন গন্ধহীন গ্যাস।

(৩) গ্যাস ভর্তি টেস্টটিউবের মুখ খুলে শ্বাস গ্রহণ কর। কোন শ্বাস পেলো কী? কোন শ্বাস পাওয়া গেল না। অক্সিজেন শ্বাসহীন গ্যাস।



চিত্র ৪.৩ : অক্সিজেন বর্ণ ও গন্ধহীন গ্যাস

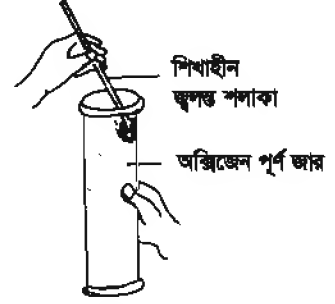
(৪) পানির নিয়মুখী অপসারণ দ্বারা এ গ্যাস সংগ্রহ করা হয়েছে। অক্সিজেন পানি অপেক্ষা হালকা এবং পানিতে সামান্য পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। এ জন্য প্রায় সম্পূর্ণ গ্যাস বুদবুদ আকারে উপরে উঠে এসে টেস্টটিউবে জমা হয়। অক্সিজেন পানিতে দ্রবীভূত থাকে। এ দ্রবীভূত অক্সিজেনের সাহায্যে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীরা শ্বাসকার্য নির্বাহ করে থাকে। মাছ ও অন্যান্য জলচর প্রাণীরা কুলকার সাহায্যে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করে।

(৫) ক. একটি জ্বলন্ত মোমবাতি কাচের গ্লাস দিয়ে ঢেকে দাও। কিছুক্ষণ জ্বলার পর মোমবাতিটি নিভে যাবে। গ্লাসের মধ্যে বায়ুর অক্সিজেন যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ মোমবাতিটি জ্বলেছে। দহনের ফলে অক্সিজেন যখন শেষ হয়ে যাবে তখনই মোমবাতিটি নিভে যাবে।

খ. একটি জ্বলন্ত পাটকাঠি ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে ফেল। এ পাটকাঠিটি লাল থাকতে অক্সিজেন ভর্তি গ্যাসজারের মধ্যে ঢুকাও। কী দেখছ? কাঠিটি আবার জ্বলে উঠেছে। তাহলে বলা যায় অক্সিজেন দহনে সাহায্য করে।

গ. একটি চামচে এক টুকরা লাল তন্ত কয়লা নাও। এটাকে একটি অক্সিজেন পূর্ণ গ্যাসজারে ঢুকাও। কী দেখছ? এটি আবার উজ্জ্বলভাবে জ্বলে উঠলো। অতএব অক্সিজেন দহনে সাহায্য করে।

(৬) একটি জ্বলন্ত পাটকাঠি বা দিয়াশলাই এর কাঠি গ্যাসপূর্ণ টেস্টটিউবের মুখে ধর। দেখবে, কাঠিটি আরও উজ্জ্বল হয়ে জ্বলেছে। কিন্তু টেস্টটিউবের ভিতরের গ্যাস জ্বলেছে না। এ পরীক্ষা থেকে বোঝা যায় অক্সিজেন নিজে জ্বলে না, কিন্তু দহনে সাহায্য করে।



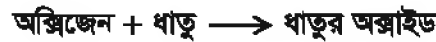
নিখাহীন জ্বলন্ত শলাকা অক্সিজেন
গ্যাসে উজ্জ্বল শিখার জ্বলে
চিত্র ৪.৪ : অক্সিজেন নিজে জ্বলে না,
দহনে সাহায্য করে।

(৭) অক্সিজেন পূর্ণ টেস্টটিউব একটি বায়ুপূর্ণ খালি টেস্টটিউবের উপর উপুড় করে ধর। কিছুক্ষণ ধরার পর একটি ঈষৎ জ্বলন্ত কাঠি দ্বিতীয় টেস্টটিউবে ঢুকাও। কী ঘটল? ঈষৎ জ্বলন্ত কাঠিটি উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠল। এ থেকে বোঝা যায় অক্সিজেন উপরের টেস্টটিউব থেকে নিচের টেস্টটিউবে এসে জমা হয়েছে এবং নিচের টেস্টটিউব থেকে বাতাস উপরের টেস্টটিউবে জমা হয়েছে। অতএব বলা যায় অক্সিজেন বায়ু অপেক্ষা সামান্য ভারী।

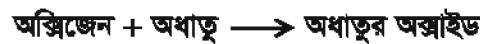
দহনে অক্সিজেন

অক্সিজেন দহনে সহায়ক। অক্সিজেন নিজে জ্বলে না। কিন্তু অক্সিজেন ছাড়া আগুন জ্বালানো সম্ভব নয়। ষষ্ঠ শ্রেণীতে আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি যে একটি জ্বলন্ত মোমবাতির উপর গ্লাস উপুড় করে দিলে অক্সিজেনের অভাবে মোমবাতিটি আস্তে আস্তে নিভে যায়। দহন প্রক্রিয়া অক্সিজেন সংযোগ ছাড়া আর কিছু নয়। কাঠ বা কয়লা পোড়ার সময় দ্রুত অক্সিজেন সংযোগের ফলে প্রচুর তাপ ও আলো উৎপন্ন হয়।

অক্সিজেন অত্যন্ত সক্রিয় মৌল। এটি লোহা, তামা, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি ধাতুর সাথে যুক্ত হয়ে ধাতব অক্সাইড তৈরি করে। ধাতব অক্সাইড সাধারণত ক্ষারধর্মী।



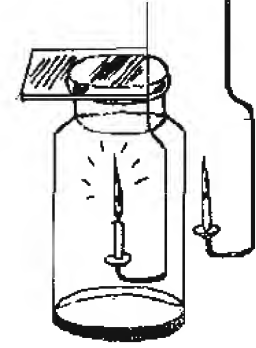
অনুরূপভাবে অক্সিজেন, কার্বন, সালফার, ফসফরাস ইত্যাদি অধাতুর সাথে যুক্ত হয়ে অধাতুর অক্সাইড তৈরি করে। সাধারণত অধাতুর অক্সাইড অম্লধর্মী।



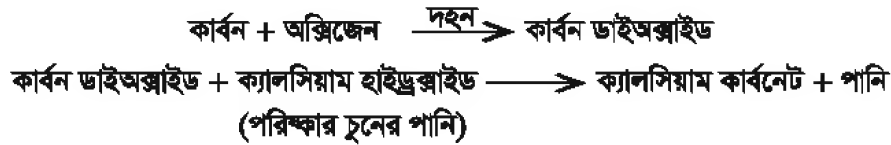
অধাতুর সাথে অক্সিজেনের দহন

কাঠ, কয়লা, কেরোসিন, মোমবাতি ইত্যাদি সবগুলোই অধাতুর যৌগ। আগুনে পোড়ানোর সময় এগুলোর অণুর সাথে অক্সিজেনের সংযোগ হয়। এ সংযোগের প্রকাশ দেখা যায় তাপ ও আলোর আকারে। মোমবাতি, কয়লা, কাঠ, কেরোসিনের মত দাহ্য পদার্থ এর মধ্যে যে কার্বন থাকে তার সাথে অক্সিজেন যুক্ত হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়।

পরীক্ষা : একটি দহন চামচে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি নাও। এটাকে একটি অক্সিজেনপূর্ণ পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করাও। কী দেখছ? মোমবাতিটি আগের চেয়ে তীব্রভাবে জ্বলছে। কিছুক্ষণ জ্বলার পর দহন চামচসহ মোমবাতিটি বের করে আন এবং মোমবাতি দম্ব জ্বারের মুখ বন্ধ কর এবং এর মধ্যে পানিতে ভেজা নীল লিটমাস কাগজ ছেড়ে দাও। লিটমাস কাগজের রঙের কোন পরিবর্তন হয়েছে কী? সামান্য লাল রং হয়েছে। অম্ল বা এসিডের একটি ধর্ম হল এটি নীল লিটমাসকে লাল করে। তাহলে আমরা বলতে পারি অক্সিজেনপূর্ণ জ্বরে মোমবাতির দহনের ফলে অম্লধর্মী দ্রব্য তৈরি হয়েছে। এবার মোমবাতি দম্ব জ্বারের মধ্যে সামান্য পরিমাণ পরিষ্কার চূনের পানি নিয়ে নাড়তে থাক। কোন পরিবর্তন ঘটেছে কী? পরিষ্কার চূনের পানি ঘোলা হয়ে গেছে। অক্সিজেনের মধ্যে দহনের ফলে মোমবাতির কার্বন ও অক্সিজেন যুক্ত হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করেছে। তোমরা জান, কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিষ্কার চূনের পানিকে ঘোলা করে। বিষয়টিকে আমরা নিম্নরূপভাবে প্রকাশ করতে পারি।



চিত্র ৪.৫ : অক্সিজেনের মধ্যে মোমবাতির দহন



এবার একটি অধাতু গন্ধক বা সালফারের গুঁড়া অক্সিজেনে দহন করে দেখ কী ঘটে।

পরীক্ষা : তোমাদের বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারে নিশ্চয়ই গন্ধক বা সালফারের গুঁড়া আছে। একটি দহন চামচে কিছুটা সালফারের গুঁড়া নিয়ে তাতে আগুন ধরাও। এবার দহন চামচটি অক্সিজেনপূর্ণ গ্যাস জ্বরে প্রবেশ করাও। কী দেখছ? সালফার নীলাভ শিখাসহ জ্বলছে। দহনের পর গ্যাস জ্বারটিতে নীল লিটমাস কাগজ ভিজিয়ে দহন জ্বরে ছেড়ে দাও। কী দেখছ? নীল লিটমাস লাল হয়েছে কি? সালফার অক্সিজেনের মধ্যে দহনের ফলে সালফার ও অক্সিজেন সংযুক্ত হয়ে সালফার ডাই অক্সাইড তৈরি করেছে। সালফার ডাইঅক্সাইড অম্লধর্মী। অম্ল নীল লিটমাসকে লাল করে। তাই নীল লিটমাস লাল হয়েছে।



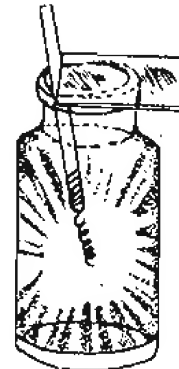
এ পরীক্ষা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্ত আসতে পারি যে :

- (১) অধাতু ও অক্সিজেনের দহনে অধাতুর অক্সাইড তৈরি হয়।
- (২) উৎপন্ন অধাতুর অক্সাইড অম্লধর্মী।

ধাতুর সাথে অক্সিজেনের দহন

লোহা, তামা, সোডিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি ধাতুকে অক্সিজেনের মধ্যে দহন করলে ঐ সমস্ত ধাতুর সাথে অক্সিজেন যুক্ত হয়ে ধাতব অক্সাইড তৈরি করে।

পরীক্ষা : এক টুকরো ম্যাগনেসিয়াম রিবন চিমটির সাহায্যে ধর এবং তাতে আগুন ধরাও। এবার এটাকে অক্সিজেনপূর্ণ পাত্রের মধ্যে ঢুকাও। কী দেখছ? অতি উজ্জ্বল শিখাসহ ম্যাগনেসিয়াম জ্বলছে এবং দহন শেষে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডের সাদা ছাই টেস্টটিউবের মধ্যে পড়ে আছে।



চিত্র ৪.৬ : অক্সিজেনের মধ্যে ম্যাগনেসিয়াম দহন

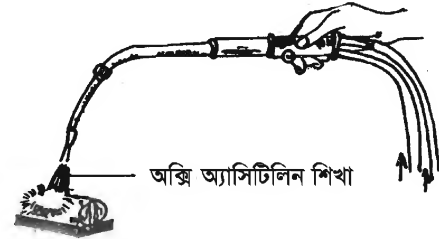
দহন শেষে পানি দিয়ে সামান্য ভেজা লাল লিটমাস কাগজ টেস্টটিউবে ছেড়ে দাও। লিটমাস কাগজের রং এর কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি? হ্যাঁ, লাল লিটমাস নীল রং এ পরিবর্তন হয়েছে। এ থেকে বলা যায় ম্যাগনেসিয়াম ও অক্সিজেনের দহনের ফলে উৎপন্ন ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড ক্ষারধর্মী।

শ্বাসকার্যে অক্সিজেন

মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর শ্বাসকার্যের জন্য অক্সিজেন অত্যাবশ্যক। বাতাসে অক্সিজেন না থাকলে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী বেঁচে থাকতে পারতো না। দুর্বল ফুসফুসের জন্য বিশুদ্ধ অক্সিজেন বিশেষ প্রয়োজন। হাসপাতালে মুমূর্ষু রোগীরা যখন বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে শ্বাসকার্য চালাতে অক্ষম হয়ে পড়ে তখন তাদের নাকের ভেতর দিয়ে বিশুদ্ধ অক্সিজেন দেওয়া হয়। শ্বাসকণ্ঠের রোগীকে কখনও কখনও অক্সিজেনের তাঁবুতে রাখা হয়। উঁচু পর্বতারোহী, আকাশে উড্ডীন নভোযানের চালক, বিমানচালক, পানির নিচে ডুবুরী ও ডুবোজাহাজের যাত্রীরা শ্বাসকার্যের জন্য নিজেদের সঙ্গে অক্সিজেনের ছোট ছোট সিলিন্ডার ব্যবহার করেন। মাটির অনেক নিচে থেকে খনিজ সম্পদ আহরণের জন্য শ্রমিকেরা সঙ্গে অক্সিজেন বহন করেন এবং প্রয়োজন হলে তা ব্যবহার করেন। অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা অক্সিজেন মুখোশ ব্যবহার করেন।

অক্সিজেনের অন্যান্য ব্যবহার

দহন ও শ্বাসকার্য ছাড়াও অন্যান্য আরও অনেক কাজে অক্সিজেন ব্যবহার করা হয়। নানা প্রকার ঝালাইয়ের কাজে অক্সিজেন ব্যবহার করা হয়। তোমরা হয়তো ঝালাইকারকদের কারখানায় কাজ করতে দেখেছ। ঝালাইকারকরা দুটো ধাতু খণ্ডকে জোড়া লাগান। এজন্য তাদের ধাতু খণ্ডদুটোকে গলিয়ে ফেলতে হয়। এ কাজের জন্য দরকার খুব উত্তপ্ত শিখা। এরূপ উচ্চ তাপমাত্রায়ুক্ত অগ্নিশিখা তৈরির জন্য অক্সিজেনের সঙ্গে অন্য একটি গ্যাস, যেমন হাইড্রোজেন বা অ্যাসিটিলিনকে পোড়ানো হয়। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের মিলিত শিখার নাম অক্সি হাইড্রোজেন শিখা। এ শিখার তাপমাত্রা প্রায় 2800° সেলসিয়াস। অক্সিজেন এবং অ্যাসিটিলিনের মিলিত শিখার নাম অক্সি অ্যাসিটিলিন শিখা। এ শিখার তাপমাত্রা 3100° থেকে 3315° সেলসিয়াস। অক্সি হাইড্রোজেন অথবা অক্সি অ্যাসিটিলিন শিখার তাপ ধাতু গলাতে, ধাতু কাটতে এবং ঝালাইয়ের জন্য যথেষ্ট। রকেট ও জেট বিমানে তরল অক্সিজেনযুক্ত জ্বালানি ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া অক্সিজেন আমাদের খাবার পানিকে সুস্বাদু করে এবং নানা প্রকার রোগ জীবাণু ধ্বংস করে।



চিত্র ৪.৭ : অক্সি অ্যাসিটিলিন শিখা

লোহায় মরিচা পড়ায় অক্সিজেনের ভূমিকা

আমরা জানি বায়ুতে অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্প আছে। চকচকে একখণ্ড লোহা বা ঝকঝকে একখানা ছুরি কিছুদিন কোথাও ফেলে রাখলে দেখা যায় যে, তার উপর এক প্রকার আবরণ পড়েছে। এ আবরণকে মরিচা বলে। বায়ুতে যে অক্সিজেন আছে তা লোহার সংস্পর্শে এসে এক প্রকার লৌহ অক্সাইড তৈরি করে। এটাই মরিচা। আমরা পূর্বেই দেখেছি অক্সিজেন ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে ধাতব অক্সাইড তৈরি করে। লোহা একটি ধাতু। এ ধাতু পানি বা জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে লৌহ অক্সাইড তৈরি করে।



সুতরাং লোহায় মরিচা পড়ার ক্ষেত্রে অক্সিজেন মুখ্য ভূমিকা পালন করে। মরিচা পড়ার জন্য অক্সিজেন এবং পানি বা জলীয় বাষ্পের ভূমিকা নিচের পরীক্ষাটি সম্পাদন করে প্রমাণ করা যায়।

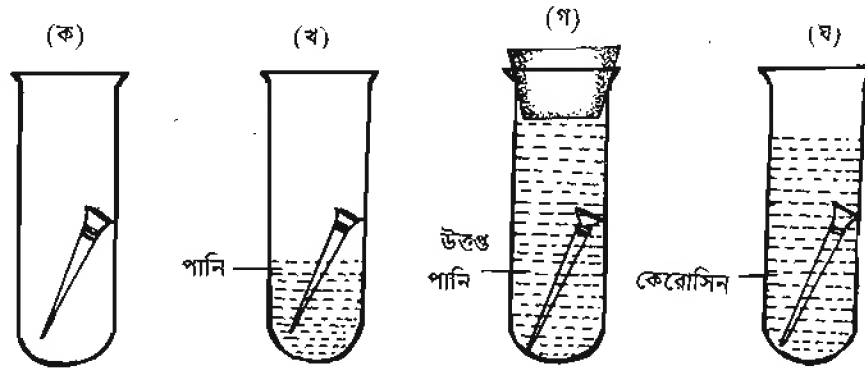
পরীক্ষা : চারটি টেস্টটিউবে চারটি তারকাঁটা রাখ। ‘ক’, ‘খ’, ‘গ’ ও ‘ঘ’ দ্বারা চিহ্নিত কর এবং নিচের অবস্থায় রাখ।
‘ক’ মুখ খোলা খালি টেস্টটিউব (আসলে বায়ুপূর্ণ)।

‘খ’ অর্ধেকটা বা আংশিক পানিপূর্ণ মুখ খোলা টেস্টটিউব। তারকাঁটাটি অর্ধেক পানিতে ডুবে আছে।

‘গ’ ২০ মিনিট ধরে সিঁধ করা পানি দ্বারা পূর্ণ টেস্টটিউব। মুখ ছিপি দ্বারা বন্ধ। ছিপি মোম দিয়ে আটকানো যাতে বাইরের বাতাস ঢুকতে না পারে। তারকাঁটাটি সম্পূর্ণ পানিতে ডুবে আছে।

‘ঘ’ মুখ খোলা কেরোসিনপূর্ণ টেস্টটিউব। তারকাঁটাটি সম্পূর্ণভাবে কেরোসিনে ডুবে আছে। এভাবে এক সপ্তাহ রেখে দাও। এক সপ্তাহ পরে তারকাঁটাগুলো লক্ষ কর। কোনটিতে মরিচা ধরেছে? কোনটিতে মরিচা ধরেনি?

‘ক’ টেস্টটিউবটিতে বাতাস অর্থাৎ অক্সিজেন এবং বাতাসে মিশ্রিত অতি সামান্য পরিমাণ জলীয় বাষ্প ছিল। তাই ‘ক’ টেস্টটিউবটিতে রাখা তারকাঁটায় এক সপ্তাহে মরিচা ধরেনি, তবে আরও বেশি দিন রেখে দিলে মরিচা ধরবে। ‘খ’ টেস্টটিউবটিতে বাতাস বা অক্সিজেন ছিল এবং পানিও ছিল। তাই এটিতে রাখা তারকাঁটায় এক সপ্তাহের মধ্যেই মরিচা ধরেছে। ‘গ’ টেস্টটিউবটি ছিল প্রায় বায়ুরোধী বা বায়ুশূন্য। অর্থাৎ ‘গ’ টেস্টটিউবটিতে কোন অক্সিজেন ছিল না। কিন্তু পানি ছিল। এটিতে রাখা তারকাঁটায় মরিচা ধরেনি। ‘ঘ’ টেস্টটিউবটিতে রাখা তারকাঁটা কেরোসিনে ডুবানো ছিল। এখানে অক্সিজেন কিংবা পানি কোনটিই ছিল না। তাই এটিতে রাখা তারকাঁটায়ও মরিচা ধরেনি।



চিত্র ৪.৮ : লোহার মরিচা পড়ার পরীক্ষা

এ পরীক্ষা থেকে বোঝা যায় যে, মরিচা ধরার জন্য পানি এবং অক্সিজেন দুটোই দরকার। আমাদের দেশে বর্ষাকালে যখন বায়ুতে যথেষ্ট পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকে তখন লোহার তৈরি জিনিসপত্র যেমন লোহার কড়ি, বরগা, শিক, কোদাল, কাস্তে, লাঙ্গল ইত্যাদি সব কিছুতেই মরিচা ধরে। মরিচা হল লোহার অক্সাইড। মরিচা ধরলে লোহা আয়রন অক্সাইড এ পরিণত হয়। মরিচা পড়লে ধাতুর উপর প্রলেপ বা আস্তরণের মত পড়ে। মরিচা তুলে ধাতুকে অনাবৃত করলে আবারও মরিচা পড়ে। এভাবে সবটুকু ধাতুই মরিচায় পরিণত হয়। সুচ, পিন, ঘড়ির স্প্রিং, ঘরের টিনের চাল, কৃষি যন্ত্রপাতি, কৌটা বা টিন ইত্যাদিতে প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করলে অবশ্যই মরিচা ধরবে।

মরিচা প্রতিরোধ

মরিচা প্রতিরোধের একটি ভাল উপায় হচ্ছে লোহাকে এমন কোন পদার্থ দিয়ে প্রলেপ দেওয়া যা লোহাকে মরিচার হাত থেকে রক্ষা করে। এ ধরনের প্রলেপ হচ্ছে রং, কালাই, গ্রীজ অথবা গলিত ধাতুর আস্তরণ (যেমন দস্তা বা টিনের আস্তরণ)। গলিত দস্তা বা টিনের প্রলেপ দেওয়াকে গ্যালভানাইজিং বলে। আমাদের দেশে ঘর তৈরি করতে যে ডেউটিন ব্যবহার করা হয় তাতে দস্তার গ্যালভানাইজিং দেওয়া হয়। গুঁড়োদুধের কৌটায় টিনের গ্যালভানাইজিং দেওয়া হয়। আবার গলিত লোহার সঙ্গে সামান্য কার্বন, ক্রোমিয়াম এবং নিকেল ধাতু মিশালে যে নতুন ধাতব পদার্থ তৈরি হয় তাতেও মরিচা ধরে না। এ মিশ্র বা সংকর ধাতুটির নাম স্টেইনলেস স্টীল।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পটাশিয়াম ক্লোরেট ও ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের বিক্রিয়ার ফলে কী কী তৈরি হয়?

ক. পানি ও অক্সিজেন	খ. পানি, অক্সিজেন ও ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড
গ. পটাশিয়াম ক্লোরাইড ও অক্সিজেন	ঘ. পটাশিয়াম ক্লোরাইড, অক্সিজেন ও পানি
২. পরীক্ষাগারে অক্সিজেন গ্যাস কীভাবে সংগ্রহ করা হয়?

ক. বায়ুর নিম্নমুখী অপসারণ দ্বারা	খ. পানির নিম্নমুখী অপসারণ দ্বারা
গ. বায়ুর ঊর্ধ্বমুখী অপসারণ দ্বারা	ঘ. পানিতে দ্রবীভূত করে
৩. অক্সিজেন গ্যাসের সঠিক ধর্ম প্রকাশ করছে কোন উক্তিটি?

ক. অক্সিজেন পানিতে দ্রবণীয়	খ. এ গ্যাস নিজে জ্বলে না, দহনে সাহায্য করে
গ. অক্সিজেন বায়ু অপেক্ষা হালকা	ঘ. অক্সিজেন নিজে জ্বলে না, দহনেও সাহায্য করে না
৪. অক্সিজেনপূর্ণ জারে মোমবাতি দহন করে দহন শেষে জারের মধ্যে পরিষ্কার চূনের পানি দিলে কী হবে?

ক. চূনের পানির কোন পরিবর্তন হবে না	খ. চূনের পানি ঘোলা হয়ে যাবে
গ. চূনের পানি আরও পরিষ্কার হবে	ঘ. চূনের পানি লাল হয়ে যাবে
৫. লোহার মরিচা ধরার জন্য কোনটি প্রয়োজন?

ক. পানি	খ. অক্সিজেন
গ. কেরোসিন	ঘ. পানি ও অক্সিজেন
৬. সোডিয়াম ধাতুকে অক্সিজেনপূর্ণ জারে দহন শেষে লাল এবং নীল লিটমাস কাগজ দগ্ধজারে ছেড়ে দিলে কী হবে?

ক. নীল লিটমাস লাল হবে, লাল লিটমাস নীল হবে
খ. লাল লিটমাস নীল হবে, নীল লিটমাসের পরিবর্তন হবে না
গ. লাল লিটমাস কোন পরিবর্তন হবে না, নীল লিটমাস লাল হবে
ঘ. লিটমাসের রঙের পরিবর্তন হবে না
৭. অম্লধর্মী অক্সাইড
 - i. ফসফরাস পেন্টাঅক্সাইড
 - ii. জিংক অক্সাইড
 - iii. সালফার ডাইঅক্সাইড

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের তথ্যের আলোকে ৮-১০ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

একজন শ্রমিক অনেক তাপ প্রয়োগ করেও দুটি লোহার খণ্ড জোড়া লাগাতে পারছিল না। অন্যজন তাকে পাশের কারখানায় নিয়ে গেল। প্রাপ্ত শিখার মাধ্যমে সে খুব দ্রুত লোহার খণ্ড দুটো জোড়া লাগিয়ে ফেলল। অন্য একটি শিখা ব্যবহার করে দেখল তাতে জোড়া লাগতে সময় বেশি লাগল।

৮. প্রথম শিখাটি কোন কোন পদার্থ দিয়ে তৈরি?

ক. অক্সিজেন ও অ্যাসিটিলিন

খ. অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন

গ. অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন

ঘ. অক্সিজেন ও ইথিলিন

৯. দ্বিতীয় শিখাটি কোন কোন পদার্থ দিয়ে তৈরি।

ক. অক্সিজেন ও অ্যাসিটিলিন

খ. অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন

গ. অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন

ঘ. অক্সিজেন ও ইথিলিন

১০. দ্বিতীয় শিখাটির তাপমাত্রা কত?

ক. 2800°C

খ. 3100°C

গ. 3100°C - 3315°C

ঘ. 3315°C

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অ্যালুমিনিয়াম, কয়লা, লোহা, মোম ও গন্ধক সংগ্রহ করে অক্সিজেন পূর্ণ জারে দহন করা হল। উৎপন্ন যৌগসমূহের ধর্ম পরীক্ষা করে দেখা গেল কোনটি ক্ষার ধর্মী আবার কোনো কোনোটি অম্লধর্মী।

ক. কয়লা দহন করলে কী উৎপন্ন হবে?

খ. মোমের দহনে উৎপন্ন যৌগসমূহের ধর্ম ব্যাখ্যা কর।

গ. মোম ও কয়লা বাদে বাকি পদার্থগুলো অক্সিজেনে দহনের ফলে কী উৎপন্ন হয় তার শাস্তিক সমীকরণ লিখ।

ঘ. লোহার দহনে উৎপন্ন অক্সাইডগুলোর মধ্যে কোনটি ক্ষতিকর তা যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

২. (১) হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড \xrightarrow{X} পানি + অক্সিজেন

(২) পটাশিয়াম ক্লোরেট $\xrightarrow[\text{তাপ}]{X}$ পটাশিয়াম ক্লোরাইড + অক্সিজেন

২ নং বিক্রিয়ায় উৎপন্ন অক্সিজেনের সাথে সোডিয়াম যোগ করা হল।

ক. 'X' পদার্থটি কী?

খ. ১ ও ২ নং বিক্রিয়ার মধ্যে কোনটির বিয়োজন সহজ ব্যাখ্যা কর।

গ. অক্সিজেনের সাথে সোডিয়ামের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থটি কোন ধর্মী ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ১ ও ২ নং বিক্রিয়া সংঘটনে 'X' এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

হাইড্রোজেন

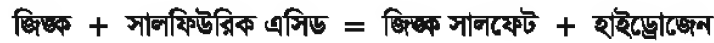
পৃথিবীতে এ পর্যন্ত ১১০ টি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। মৌলিক পদার্থগুলোকে বিজ্ঞানীরা একটি ছকে সাজিয়েছেন। এ ছকের নাম পর্যায় সারণি। হাইড্রোজেন এ সারণির প্রথম বা এক নম্বর মৌলিক পদার্থ।

১৭৬৬ সালে হেনরী ক্যাভেন্ডিশ সর্বপ্রথম এ গ্যাসের অস্তিত্ব আছে বলে বুঝতে পারেন। আগুনের সংস্পর্শে গ্যাসটি জ্বলে উঠে। তাই তিনি গ্যাসটির নাম দেন দাহ্য বায়ু। ১৭৮৮ সালে বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ে প্রমাণ করেন যে, হাইড্রোজেন একটি মৌলিক পদার্থ। বায়ুতে হাইড্রোজেন গ্যাসটি জ্বালালে পানি উৎপন্ন হয় বলে তিনি এ গ্যাসের নাম দেন হাইড্রোজেন। ‘হাইড্রো’ শব্দের অর্থ পানি। হাইড্রোজেন পানির অন্যতম উপাদান বলেই এ নাম দেওয়া হয়েছে। মৌলিক অবস্থায় পৃথিবীপৃষ্ঠে অথবা বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোজেন পাওয়া যায় না। কিন্তু যৌগিক পদার্থের সঙ্গে হাইড্রোজেন সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। যেমন : পানি, চিনি, স্টার্চ, চর্বি, প্রাকৃতিক গ্যাস, এসিড এবং আরও অনেক প্রকার পদার্থ হাইড্রোজেনের যৌগ। আমাদের দেহের বেশির ভাগই পানি। এ ছাড়াও আছে কার্বন, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন যৌগ এবং অন্যান্য মৌলিক পদার্থ। এরা রাসায়নিকভাবে পরস্পর যুক্ত থাকে।

হাইড্রোজেন প্রস্তুত প্রণালি

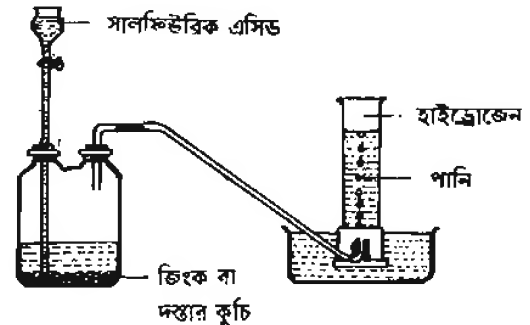
পরীক্ষাগারে সাধারণত লঘু এসিডের সাথে ধাতুর রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি করা হয়। ক্যাভেন্ডিশ নিজেও এ পদ্ধতিতে হাইড্রোজেন তৈরি করেছিলেন। পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা, লোহা ইত্যাদি সবগুলোই খাছু। তবে পরীক্ষাগারে হাইড্রোজেন প্রস্তুতের জন্য দস্তা বা জিঙ্ক খাছুই সাধারণত ব্যবহার করা হয়। পটাশিয়াম এবং সোডিয়াম কখনও ব্যবহার করা হয় না। কারণ এ দুইটি খাছু এসিডের সঙ্গে এত তীব্রভাবে বিক্রিয়া করে যে তা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এসো পরীক্ষাগারে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রস্তুত করে এ গ্যাসের ধর্মগুলো পরীক্ষা করে দেখি।

পরীক্ষা : পাতলা সালফিউরিক এসিডের সাথে জিঙ্ক বা দস্তার রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে পরীক্ষাগারে হাইড্রোজেন তৈরি করা হয়। এসিডের একটি উপাদান হল হাইড্রোজেন। জিঙ্ক এসিডের হাইড্রোজেনকে সরিয়ে জিঙ্ক সালফেট লবণ এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে।



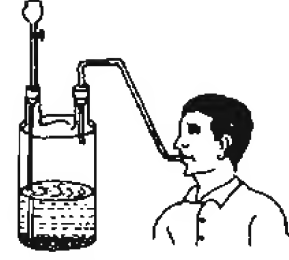
কাজের ধারা

একটি দুই মুখওয়ালা বোতলের (উলফ বোতল) মধ্যে কিছু জিঙ্কের টুকরা নাও। বোতলের এক মুখে এক ছিদ্রবিশিষ্ট কর্ক লাগাও। কর্কের ছিদ্র দিয়ে একটি লম্বা নলযুক্ত থিসেল ফানেল এমনভাবে প্রবেশ করাও যেন ফানেলের লম্বা নলটি বোতলের প্রায় তলা পর্যন্ত পৌঁছায়। বোতলের অপর মুখে একটি ছিদ্রযুক্ত কর্ক লাগাও। কর্কের ছিদ্র পথে চিত্রের ন্যায় নির্গম নলের এক মাথা ঢুকাও। এখন থিসেল ফানেলের মধ্যে কিছু পানি এমনভাবে ঢাল যেন লম্বা নলটি পানিতে ডুবানো থাকে এবং নির্গম নলের মুখ যেন পানির বেশ উপরে থাকে। কর্কের গোড়া মোম দিয়ে ভাল করে আটকে দাও।



চিত্র ৫.১ (ক) : হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রস্তুত প্রণালি

যন্ত্রটি বায়ুরোধী হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য নির্গম নলের বাইরের মুখে ফুঁ দাও। বায়ুরোধী হলে বোতলের পানি ফানেলের মধ্যে উঠবে এবং আঙ্গুল অথবা জিহ্বার অগ্রভাগ দিয়ে নির্গম নলের মুখটি বন্ধ করে রাখলে পানি আর নিচে নামবে না। যন্ত্রটি ভালভাবে বায়ুরোধী না হলে বোতলের ভেতরে উৎপন্ন গ্যাস বের হয়ে যাবে এবং কাছাকাছি আগুনের শিখা থাকলে বিস্ফোরণ ঘটবে। এজন্য হাইড্রোজেন প্রস্তুতের সময় কাছে কখনও আগুনের শিখা রাখবে না।



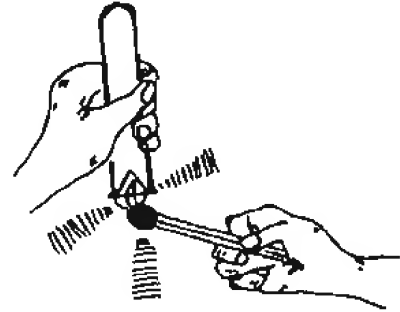
চিত্র ৫.১ (খ) : হাইড্রোজেন প্রস্তুতিতে বায়ুরোধী পরীক্ষা

নির্গম নলের বাইরের মুখটি পানি পূর্ণ পাত্রে ডুবাও। এবার থিসেল ফানেলের মধ্য দিয়ে বোতলের মধ্যে কিছু পাতলা সালফিউরিক এসিড ঢাল। জিঙ্ক ও এসিডের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন গ্যাস নির্গম নলের মধ্য দিয়ে বুদবুদ আকারে বের হবে। প্রথমে কিছু সময়ের জন্য অপেক্ষা কর যেন বোতলের মধ্যের বায়ু মিশ্রিত গ্যাস সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে যায়। একটি পানিভর্তি টেস্টটিউব নির্গম নলের উপর বসাও। দেখবে, হাইড্রোজেন গ্যাস বুদবুদ আকারে উপরে উঠছে এবং টেস্টটিউবের পানি ধীরে ধীরে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। পানিতে ডুবন্ত অবস্থায় টেস্টটিউবের পরিবর্তে কয়েকটি গ্যাস জারে গ্যাস সংরক্ষণ কর। পানির মধ্যে ডুবন্ত অবস্থায় গ্যাস জারের মুখে ঢাকনি দিয়ে সরিয়ে আনো এবং গ্যাস জারের মুখ নিচের দিকে করে টেবিলের উপর রাখ। সংগৃহীত গ্যাস দিয়ে হাইড্রোজেনের ধর্মগুলো পরীক্ষা করে দেখ।

হাইড্রোজেনের ধর্ম

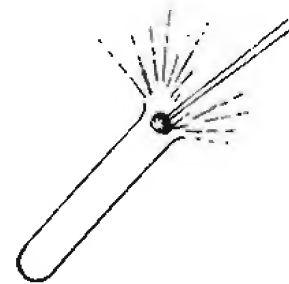
(১) হাইড্রোজেন একটি বর্ণহীন, গন্ধহীন ও স্বাদহীন গ্যাস। হাইড্রোজেন ভর্তি টেস্টটিউব বা কাচের জারগুলো লক্ষ করলে দেখবে হাইড্রোজেন বর্ণহীন গ্যাস। গন্ধ নিয়ে দেখ, এ গ্যাসের কোন গন্ধ নেই। জিহ্বা লাগিয়ে স্বাদ নিয়ে দেখ এর কোন স্বাদ নেই।

(২) হাইড্রোজেন ভরা একটি গ্যাসজার উপড় করে মুখ নিচের দিকে ধর এবং হাত দিয়ে মুখের ঢাকনি সরিয়ে ফেল। একটি জ্বলন্ত কাঠি জারের মধ্যে প্রবেশ করাও। কী দেখছ? কাঠির শিখাটি তৎক্ষণাৎ নিভে গেল, কিন্তু জারের মুখে হাইড্রোজেন গ্যাস হালকা নীল শিখা সহকারে জ্বলছে। এ থেকে বোঝা গেল হাইড্রোজেন নিজে জ্বলে, কিন্তু অন্যকে জ্বলতে সাহায্য করে না।



চিত্র ৫.২ : হাইড্রোজেনের দাহ্যতা পরীক্ষা

(৩) হাইড্রোজেন গ্যাস ভরা টেস্টটিউব এমনভাবে কাত করে ধর যেন ওটার মুখে হাইড্রোজেন ও বাতাসের একটি মিশ্রণ তৈরি হয়। এখন টেস্টটিউবের মুখে আগুনের শিখা নিতেই দপ শব্দ করে হাইড্রোজেন জ্বলে উঠবে।



চিত্র ৫.৩ : হাইড্রোজেন দপ শব্দ করে জ্বলে

(৪) হাইড্রোজেন সবচেয়ে হালকা মৌলিক পদার্থ। বায়ু হাইড্রোজেন অপেক্ষা ১৪.৪ গুণ ভারী। হাইড্রোজেনপূর্ণ একটি জারের উপর বায়ুপূর্ণ অপর একটি জার উপড় করে একটু কাত করে ধর। এবার হাইড্রোজেনপূর্ণ জারের ঢাকনা সরিয়ে ফেল। হাইড্রোজেন বায়ু অপেক্ষা হালকা। তাই মুহূর্তের মধ্যেই (মাত্র ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে) হাইড্রোজেন উপরে উঠে উপরের জারের বায়ু সরিয়ে দিয়ে নিজের স্থান দখল করে নেবে। নিচের শূন্য জার বাইরের বায়ু দ্বারা পূর্ণ হবে।



চিত্র ৫.৪ : হাইড্রোজেন বায়ু অপেক্ষা হালকা

উপরের জার হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ হয়েছে কিনা এবং নিচের জার হাইড্রোজেন শূন্য হয়ে বায়ু প্রবেশ করেছে কিনা তা কী করে বুঝবে? নিচের জারে একটি জ্বলন্ত কাঠি প্রবেশ করাও। কী দেখছ? কাঠিটি জ্বলছে। এবারে উপরের জারে অনুবৃত্তভাবে একটি জ্বলন্ত কাঠি প্রবেশ করাও, কী দেখছ? জারের মধ্যে জ্বলন্ত কাঠিটি প্রবেশ করানো মাত্র নিভে গেল এবং জারের মুখে এ গ্যাস জ্বলছে। এ পরীক্ষা থেকে বোঝা গেল হাইড্রোজেন গ্যাস নিচের জার থেকে উপরের জারে চলে গিয়েছে। হাইড্রোজেন গ্যাস বায়ু অপেক্ষা হালকা। হালকা বলেই হাইড্রোজেন ভরা বেলুন আকাশে উড়ে যায়।

(৫) হাইড্রোজেন পানিতে অদ্রবণীয়। পানির নিম্নমুখী অপসারণ দ্বারা এ গ্যাস সংগ্রহ করা হয়েছে। হাইড্রোজেন পানিতে দ্রবণীয় হলে এটা সম্ভব হত না। এ থেকে বুঝা যায় যে, হাইড্রোজেন পানিতে অদ্রবণীয়।

(৬) হাইড্রোজেনপূর্ণ গ্যাস জারে সামান্য ভেজা লাল ও নীল লিটমাস কাগজ ঢুকাও। লিটমাসের রঙের কোন পরিবর্তন হয়েছে কি? না, লাল ও নীল লিটমাস কোনটির রঙেরই কোন পরিবর্তন হয়নি। এ থেকে বলা যায় হাইড্রোজেন অম্লধর্মী বা ক্ষারধর্মী কোনটিই নয়। হাইড্রোজেন একটি নিরপেক্ষ গ্যাস।

(৭) ষষ্ঠ শ্রেণীতে তোমরা পানিকে বিশ্লেষণ করেছ। পানিকে বিশ্লেষণ করে কী কী উপাদান পেয়েছিলে মনে পড়ে? দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন পেয়েছিলে। তাহলে পানি দুইটি উপাদান দিয়ে গঠিত। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। তাই বলা যায় বাতাসে হাইড্রোজেন দহনের ফলে পানি উৎপন্ন হয়।

হাইড্রোজেনের ব্যবহার

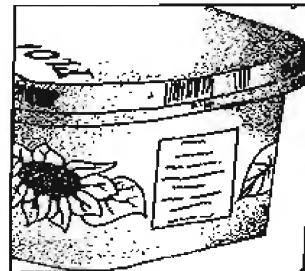
(১) হাইড্রোজেন সবচেয়ে পরিচিত হালকা পদার্থ। তাই হাইড্রোজেন গ্যাস ভরা বেলুন উড্ডয়নে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু হাইড্রোজেন অত্যন্ত দাহ্য গ্যাস বলে এ গ্যাস বেলুন ভরে আকাশে উড়ে যাওয়া বিপজ্জনক। তাই বর্তমানে উড্ডয়নের জন্য হাইড্রোজেনের পরিবর্তে হিলিয়াম নামে অন্য একটি হালকা গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

(২) উজ্জ্বল তেল, যেমন : তুলাবীজ তেল, বাদাম তেল, সূর্যমুখী বীজের তেল ইত্যাদি থেকে মার্জারীন, বনস্পতি ঘি ও ডালডা জাতীয় ভোজ্য তেল তৈরি করতে হাইড্রোজেন ব্যবহার করা হয়।

(৩) কয়লা থেকে কৃত্রিম পেট্রোল অথবা লুব্রিকেটিং অয়েল তৈরি করতে হাইড্রোজেন ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর সংরক্ষিত পেট্রোলিয়াম শেষ হয়ে গেলে হাইড্রোজেনের গুরুত্ব ক্রমশ বেড়ে যাবে।

(৪) নাইলন, প্লাস্টিক যেমন পি.ভি.সি ইত্যাদি তৈরি করতে হাইড্রোজেন ব্যবহার করা হয়।

(৫) রাসায়নিক শিল্পে হাইড্রোজেন বহুবিধ প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। যেমন : অ্যামোনিয়া (হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন যৌগ)। অ্যামোনিয়া থেকে ইউরিয়া সার ও নানা রকম বিস্ফোরক তৈরি করা হয়।



চিত্র ৫.৫ : মার্জারীন তৈরিতে হাইড্রোজেন ব্যবহার করা হয়

(৬) হাইড্রোক্লোরিক এসিড তৈরি করতে এ গ্যাস ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া নানা প্রকার জৈব যৌগ ও রাসায়নিক পদার্থ যেমন মিথাইল এলকোহল তৈরি করতে হাইড্রোজেন ব্যবহার করা হয়।

(৭) হাইড্রোজেন বিজারক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কোন বস্তু থেকে অক্সিজেন সরিয়ে নেওয়াকে বিজারণ বলে। যে বস্তুটি অক্সিজেন সরিয়ে আনে তাকে বলা হয় বিজারক।

(৮) অক্সিজেনের সাথে মিশে হাইড্রোজেন অক্সি হাইড্রোজেন শিখা তৈরি করে। এ শিখার তাপমাত্রা প্রায় 2800° সে. এবং এর সাহায্যে অতি সহজেই ইস্পাত কাটা যায়। ধাতু কাটতে, গলাতে ও ঝালাই কাজে অক্সি হাইড্রোজেন শিখা ব্যবহার করা হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- একটি গ্যাস ভরা বোতলে জ্বলন্ত কাঠি ঢুকানোর ফলে কাঠিটি নিভে গেল এবং গ্যাসটি নিজেই জ্বলে উঠলো। বোতলে কী গ্যাস ছিল?
ক. হাইড্রোজেন
খ. অক্সিজেন
গ. নাইট্রোজেন
ঘ. কার্বন ডাইঅক্সাইড
- জিঙ্কের সাথে লঘু সালফিউরিক এসিড মেশালে কী হয়?
ক. জিঙ্ক ও সালফিউরিক এসিড
খ. পানি ও হাইড্রোজেন
গ. হাইড্রোজেন ও জিঙ্ক সালফেট
ঘ. পানি ও জিঙ্ক সালফেট
- নিচের কোনটি পোড়ালে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় না?
ক. হাইড্রোজেন
খ. কেরোসিন
গ. কাঠ
ঘ. তেল
- একটি বম্ব পাত্রের মধ্যে দুইটি গ্যাস আছে। পাত্রটির মধ্যে এমনভাবে আগুন লাগানো হল যেন পাত্রের মধ্যে বাতাস ঢুকতে না পারে। সঙ্গে সঙ্গে পাত্রের মধ্যে বিস্ফোরণ হল। মিশ্রণটির মধ্যে কী কী গ্যাস আছে।
ক. হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেন
খ. অক্সিজেন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড
গ. হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন
ঘ. হাইড্রোজেন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড
- গ্যাসপূর্ণ একটি টেস্টটিউবের মুখে ঢাকনা ছিল। টেস্টটিউবটি একটু কাত করে ধরে মুখের ঢাকনা খুলে একটি জ্বলন্ত কাঠি ধরতেই পপ করে একটা শব্দ হল। টেস্টটিউবে কী গ্যাস ছিল?
ক. নাইট্রোজেন
খ. অক্সিজেন
গ. হাইড্রোজেন
ঘ. কার্বন ডাইঅক্সাইড
- হাইড্রোজেন গ্যাসের কোন ধর্মটির জন্য এ গ্যাস বেলুনে ভরলে ভারী জিনিসকে ভাসিয়ে রাখতে পারে?
ক. হাইড্রোজেন পানিতে অদ্রবণীয়
খ. হাইড্রোজেন একটি মৌলিক পদার্থ
গ. হাইড্রোজেন সবচেয়ে হালকা পদার্থ
ঘ. হাইড্রোজেন সহজে পাওয়া যায়
- বর্তমানে হাইড্রোজেন গ্যাস বেলুনে ভরে আকাশে উড়ানো হয় না কেন?
ক. হাইড্রোজেন বাতাসে পাওয়া যায় না
খ. হাইড্রোজেন অত্যন্ত ব্যয়বহুল
গ. হাইড্রোজেন একটি ভারী গ্যাস
ঘ. হাইড্রোজেন গ্যাসে বিস্ফোরণ ঘটে

নিচের তথ্যের আলোকে ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

একটি বন্ধ পাত্রের মধ্যে দুইটি গ্যাস আছে। মিশ্রিত গ্যাসের মধ্যে আগুন লাগালে তীব্রভাবে জ্বলে উঠল এবং প্রায় 2800°C তাপমাত্রা উৎপন্ন হল।

৮. মিশ্রিত গ্যাস দুটির মধ্যে কী কী গ্যাস আছে?

ক. হাইড্রোজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড

খ. অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড

গ. হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন

ঘ. হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেন

৯. মিশ্রিত গ্যাস দুইটির দহনের ফলে উৎপন্ন শিখা ব্যবহার করা হয়

i. ধাতু পরিশোধনে

ii. ধাতু গলাতে

iii. ঝালাই কাজে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i

খ. i ও ii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. একটি গ্যাসপূর্ণ টেস্টটিউবকে উপুর করে ধরে টেস্টটিউবের মুখে জ্বলন্ত একটি কাঠি ধরলে কাঠিটি ধপ করে নিভে গেল, কিন্তু গ্যাসটি টেস্টটিউবের মুখে নীল শিখাসহ জ্বলতে থাকল। উক্ত গ্যাসটিকে অক্সিজেনের সাথে মিশিয়ে দহন করলে উচ্চ তাপমাত্রার শিখা তৈরি হয়।

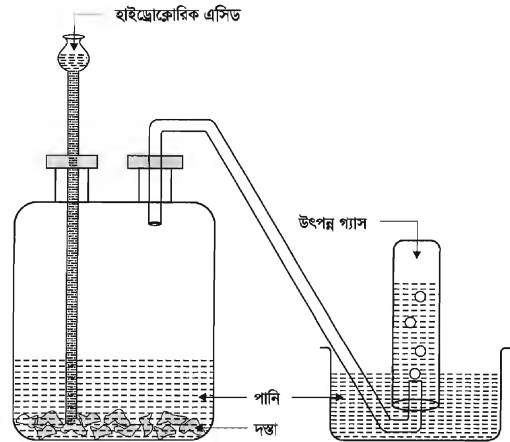
ক. টেস্টটিউবের গ্যাসটির নাম কী ?

খ. উক্ত গ্যাসটি বায়ু অপেক্ষা হালকা না ভারী তা কীভাবে বুঝবে ?

গ. জাহাজ কাটার কাজে এই গ্যাসটি কীভাবে ব্যবহার করা যায় ?

ঘ. ঐ গ্যাসপূর্ণ টেস্টটিউবের মুখে একটি ভেজা লিটমাস ধরলে লিটমাসের রং এর পরিবর্তন হবে কিনা মতামত দাও।

২.



ক. উৎপন্ন গ্যাসটির নাম কী ?

খ. গ্যাস জারটি পানিপূর্ণ করে নেওয়া হয়েছে কেন ?

গ. বায়ুপূর্ণ গ্যাসজার ব্যবহার করলে কী হত যুক্তি দাও।

ঘ. গ্যাসটি অম্লধর্মী না ক্ষারধর্মী ব্যাখ্যা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কার্বন ডাইঅক্সাইড

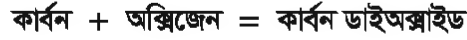
কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুর একটি উপাদান

বায়ুর উপাদান সম্পর্কে আমরা জেনেছি। কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুর একটি উপাদান। আয়তন অনুসারে বায়ুতে শতকরা ০.০৪ ভাগ কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে। জীবজন্তুর নিঃশ্বাসে ও জ্বালানি পোড়ালে কার্বন ডাইঅক্সাইডের সৃষ্টি হয়। কোন কোন স্থানে ভূ গর্ভ হতে এ গ্যাস নির্গত হয়। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ভন হেলমন্ট সর্বপ্রথম কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস আবিষ্কার করেন।

সাধারণত কাঠ, কয়লা, তৈল, কাগজ ইত্যাদি যে কোন কার্বনযুক্ত জৈব পদার্থ বাতাসে পোড়ালে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। এজন্য নানাবিধ কলকারখানায় এমনকি আমাদের রান্না ঘরে সর্বদাই কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে।

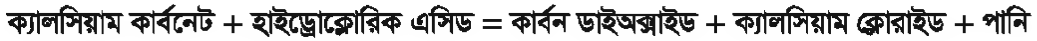
কার্বন ডাইঅক্সাইড একটি যৌগিক পদার্থ

আগের শ্রেণীতে আমরা মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। যৌগিক পদার্থ কাকে বলে তোমাদের মনে আছে কি? দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট যে নতুন পদার্থ তৈরি করে তাকে যৌগিক পদার্থ বলে। পানির মত কার্বন ডাইঅক্সাইডও একটি যৌগিক পদার্থ। কার্বন ও অক্সিজেন এ দুইটি মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়।



কার্বন ডাইঅক্সাইডের প্রস্তুত প্রণালি

সাধারণত কার্বনেট যৌগের সাথে এসিডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস প্রস্তুত করা হয়। পরীক্ষাগারে ক্যালসিয়াম কার্বনেট বা মার্বেল পাথরের সাথে লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস তৈরি করা হয়। ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাথে নিম্নরূপ বিক্রিয়া ঘটে :

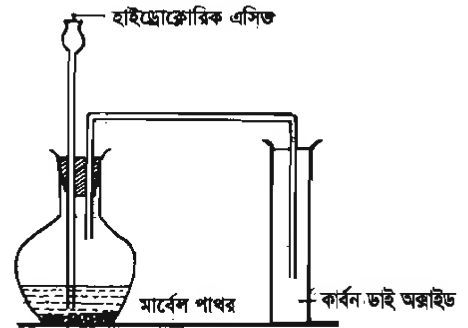


প্রস্তুত প্রণালি

হাইড্রোজেন গ্যাস প্রস্তুতের জন্য তোমরা যেভাবে যন্ত্রপাতি সাজিয়েছিলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস প্রস্তুতের জন্যও অনুরূপ যন্ত্রপাতি প্রায় একইভাবে সজ্জিত করতে হবে। কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ু অপেক্ষা ভারী গ্যাস বলে বায়ুর উর্ধ্বমুখী অপসারণ দ্বারা গ্যাস সংগ্রহ করা হয়।

প্রস্তুত প্রণালির বিবরণ

একটি গোলতলী ফ্লাস্কে কিছু ক্যালসিয়াম কার্বনেট বা মার্বেল পাথরের টুকরা নাও। দুই ছিদ্রযুক্ত একটি কর্কের সাহায্যে ফ্লাস্কের মুখ বন্ধ কর। কর্কের এক ছিদ্র পথে লম্বা নলওয়ালা থিসেল ফানেল এবং অন্য ছিদ্র পথে দুই বার সমকোণে বাঁকা নির্গম নলের এক মাথা ঢুকাও। থিসেল ফানেলটি ফ্লাস্কের মধ্যে এমনভাবে প্রবেশ করাও যেন ফানেলের নিচের মুখটি ফ্লাস্কের প্রায় তলা পর্যন্ত পৌছায়। নির্গম নলটির এক মাথা ফ্লাস্কের তলা থেকে বেশ



চিত্র ৬.১ : কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের প্রস্তুত প্রণালি

উপরে রাখ এবং অন্য মাথাটি একটি গ্যাস জারের মধ্যে ঢুকাও। যন্ত্রটি বায়ুরোধী হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখ। খিসেল ফানেলের ভেতর দিয়ে ফ্লাস্কে পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিড ঢাল যেন ফানেল সংযুক্ত নলের মাথা এসিডের মধ্যে ডুবে থাকে। ক্যালসিয়াম কার্বনেট বা মার্বেল পাথরের সংস্পর্শে এসিড আসার সাথে সাথে বিক্রিয়া শুরু হবে এবং বুদবুদ করে গ্যাস উৎপন্ন হয়ে নির্গম নল দিয়ে বের হবে। কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ু অপেক্ষা ভারী। তাই বায়ুকে উপরের দিকে সরিয়ে দিয়ে গ্যাস জারে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস সংগ্রহ করা হয়। এভাবে গ্যাস সংগ্রহ করাকে বায়ুর উর্ধ্বমুখী অপসারণ প্রক্রিয়া বলে। ৪/৫টি গ্যাস জারে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস সংগ্রহ করে জারের মুখে ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে রাখ এবং এ গ্যাসের ধর্মগুলো পরীক্ষা করে দেখ।

কার্বন ডাইঅক্সাইডের ধর্ম

(১) কার্বন ডাইঅক্সাইড একটি বর্ণহীন গ্যাস। কার্বন ডাইঅক্সাইডপূর্ণ গ্যাস জার ভালভাবে লক্ষ কর। গ্যাস দেখা যাচ্ছে না। কারণ গ্যাসের কোন রং নেই।

(২) নাক দিয়ে গ্যাসের গন্ধ নাও এবং জিহ্বা দিয়ে স্বাদ নাও। এ গ্যাসের সামান্য মিষ্টি গন্ধ এবং টক স্বাদ আছে।

(৩) গ্যাসপূর্ণ একটি জারের ভিতরে একটি জ্বলন্ত কাঠি ঢুকাও। কী দেখছ? এ গ্যাস কি নিজে জ্বলছে? এ গ্যাস কি কাঠিটিকে জ্বলতে সাহায্য করছে? গ্যাসপূর্ণ জারের ভিতর জ্বলন্ত কাঠি ঢুকবার সাথে সাথে কাঠিটি নিভে গেল এবং গ্যাসও জ্বলছে না।



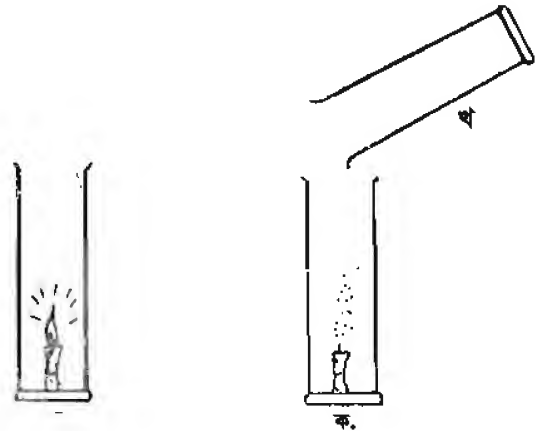
অতএব, এ থেকে বোঝা গেল কার্বন ডাইঅক্সাইড নিজে জ্বলে না, এবং অন্য বস্তুকেও জ্বলতে সাহায্য করে না।

(৪) কার্বন ডাই অক্সাইড বায়ু অপেক্ষা ভারী। এ কারণে পানির মত একে এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে ঢালা যায়।

চিত্র ৬.২ : কার্বন ডাইঅক্সাইড দহনে সাহায্য করে না।

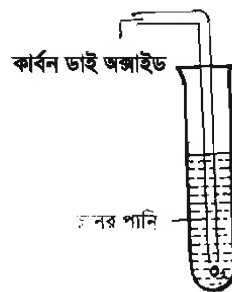
‘ক’ বায়ুপূর্ণ গ্যাস জার। এর মধ্যে বাতাস আছে। ‘ক’ জারে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি বসাও। কী দেখছ? মোমবাতিটি জ্বলছে। জার ‘খ’ কার্বন ডাইঅক্সাইডপূর্ণ। কার্বন ডাইঅক্সাইডপূর্ণ গ্যাস জার বায়ুপূর্ণ গ্যাস জারের উপর কাত করে ঢাল। কী দেখছ? জ্বলন্ত মোমবাতিটি নিভে গেল। তাই বায়ুপূর্ণ গ্যাস জারের উপর কার্বন ডাইঅক্সাইডপূর্ণ জার উপড় করে বা কাত করে ঢাললে ‘ক’ জারে কার্বন ডাইঅক্সাইড জমা হবে। বায়ু বের হয়ে যাবে। কার্বন ডাইঅক্সাইড নিজে জ্বলে না এবং দহনে সাহায্য করে না। তাই মোমবাতিটি নিভে গেল।

বায়ু অপেক্ষা ভারী বলেই এ গ্যাস গভীর কূপের তলায়, খনির নিচে অথবা বড় বড় জাহাজের ডেকের তলায় অধিক পরিমাণে জমা থাকে। এ সমস্ত স্থানে কোন মানুষ নামলে কিছুক্ষণের মধ্যেই অক্সিজেনের অভাবে শ্বাসকষ্ট হয়। এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।

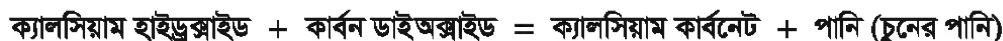


চিত্র ৬.৩ : কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ু অপেক্ষা ভারী

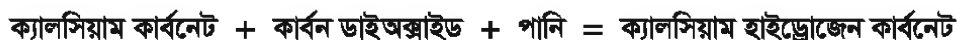
(৫) কার্বন ডাইঅক্সাইড চূনের পানিকে ঘোলা করে। পরিস্কার চূনের পানিপূর্ণ টেস্টটিউবের মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস চালনা করলে চূনের পানি ঘোলা হয়ে যায়। চূনের পানি হল ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড। ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম কার্বনেট তৈরি করে।



চিত্র ৬.৪ : কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিস্কার চূনের পানিকে ঘোলা করে



কিন্তু চূনের পানির মধ্যে অধিক পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড চালনা করলে অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম কার্বনেট দ্রবণীয় ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট তৈরি করে দ্রবীভূত হয়ে যায়। ফলে চূনের পানি আবার পরিস্কার হয়ে যায়।

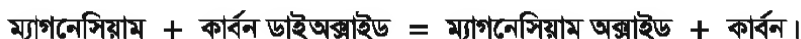


(৬) কার্বন ডাইঅক্সাইড পানিতে দ্রবণীয়। একটি পাত্রে ঠাণ্ডা পানি নাও। কার্বন ডাইঅক্সাইডপূর্ণ একটি গ্যাস জারের মুখ ঢাকনা দিয়ে বন্ধ কর এবং ঢাকনাসহ জারটি উপুড় করে পাত্রের পানিতে ডুবিয়ে ধর এবং ঢাকনা সরিয়ে নাও। জারের মধ্যে পানি উঠেছে কি? হ্যাঁ, লক্ষ কর, জারের মধ্যে পানি উঠেছে। এ থেকে কী বোঝা যায়? এ গ্যাস পানিতে দ্রবণীয়। জারের মুখ ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে পানি থেকে তুলে আনো। এখন জারের মধ্যে পানি এবং গ্যাস আছে। এর মধ্যে এক টুকরো নীল লিটমাস কাগজ ছেড়ে দাও এবং ভালভাবে ঝাঁকাও। লিটমাস কাগজের রঙের কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি? হ্যাঁ নীল লিটমাসের রং পরিবর্তিত হয়ে লাল হয়েছে।

কার্বন ডাইঅক্সাইড পানির সাথে বিক্রিয়া করে কার্বনিক এসিড উৎপন্ন করে। এসিড উৎপন্ন হওয়ার কারণেই নীল লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তিত হয়ে লাল হয়েছে।



(৭) এক টুকরা ম্যাগনেসিয়াম দহন চামচে নাও এবং ম্যাগনেসিয়ামে আগুন ধরাও। জ্বলন্ত ম্যাগনেসিয়াম দহন চামচসহ কার্বন ডাই অক্সাইডপূর্ণ গ্যাস জারে ঢুকাও। কী দেখছ? ম্যাগনেসিয়াম জ্বলছে। ম্যাগনেসিয়ামের শিখা ছড়িয়ে পড়েছে। গ্যাসজারের গায়ে কার্বনের কালো দাগ পড়েছে। ম্যাগনেসিয়াম কার্বন ডাইঅক্সাইডের মধ্যে পুড়ে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড ও কার্বন তৈরি করে।



এ পরীক্ষা থেকে বোঝা যায় কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন ও অক্সিজেন এ দুইটি মৌলিক পদার্থ নিয়ে গঠিত।

কার্বন ডাইঅক্সাইডের ব্যবহার

কার্বন ডাইঅক্সাইড পানিতে দ্রবণীয়। স্বাভাবিক অবস্থায় পানি সমান আয়তনের কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসকে দ্রবীভূত করে। কিন্তু চাপ বাড়ালে এর দ্রবণীয়তা বাড়ে। অতিরিক্ত চাপে এ গ্যাসকে পানিতে দ্রবীভূত করে মিনারাল ওয়াটার, সোডাওয়াটার, লেমনেড ইত্যাদি তৈরি করা হয়। ঠাণ্ডা পানীয় যেমন কোকা-কোলা, ফান্টা, সেভেন আপ ইত্যাদির মধ্যে উচ্চ চাপে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ব্যবহার হয়। এ সব বোতলের চাপ যাতে কমে না যায় সেজন্য ধাতব ছিপি শক্ত করে এঁটে দেওয়া হয়। বোতলের মুখ খুললে চাপ কমে যায় এবং বুদবুদ আকারে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বের হয়ে আসে।

চাপ বাড়িয়ে ঠাণ্ডা করলে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে তরল ও কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত করা যায়। ঠাণ্ডা তাপমাত্রায় অর্থাৎ ৭৮° ডিগ্রী সেলসিয়াসে নামালে গ্যাসটি তরল না হয়ে সরাসরি কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। দেখতে বরফের মত বলে কঠিন কার্বন ডাইঅক্সাইডকে ড্রাই আইস বা শুষ্ক বরফ বলে।

সাধারণ উষ্ণতায় রেখে দিলে ড্রাই আইস তরল না হয়ে সরাসরি গ্যাসে পরিণত হয় এবং রূপান্তরের সময় বরফ অপেক্ষা তিনগুণ বেশি তাপ শোষণ করে। এ কারণে রেফ্রিজারেটরের হিমায়ক বা ঠাণ্ডা করার উপকরণ হিসেবে এটা ব্যবহার করা হয়। রাস্তায় তিন চাকার গাড়িতে করে ফেরিওয়ালা আইসক্রিম বিক্রি করেন। আইসক্রিম ঠাণ্ডা রাখার জন্য বা ফ্রিজেন ফুড ফ্রিজেন করার জন্য ড্রাই আইস ব্যবহার করা হয়।



চিত্র ৬.৫ : ঠাণ্ডা পানীয়তে কার্বন ডাইঅক্সাইড

আমরা জানি কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ু অপেক্ষা ভারী এবং এ গ্যাস দহনে সাহায্য করে না। এ জন্য এ গ্যাস আগুন নিভানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। বৈদ্যুতিক অথবা রাসায়নিক দুর্ঘটনাজনিত আগুন নিভানোর জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড বিশেষভাবে উপযোগী। কারণ এ সব ক্ষেত্রে পানি ব্যবহার বিপজ্জনক। হাসপাতালে, বড় বড় অফিসে, কলকারখানায়, বিজ্ঞানাগারে তোমরা অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র হয়তো দেখেছ। এ যন্ত্রের মধ্যে উচ্চ চাপে গ্যাস তরল অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়। প্রয়োজনের মুহূর্তে ছিপি খুললে যন্ত্রের চাপ কমে যায়। তখন কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস সজোরে বেরিয়ে আসে এবং আগুন নিভাতে সাহায্য করে।

উদ্ভিদের খাদ্য তৈরির কাঁচামালের মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড একটি। প্রাণী নিঃশ্বাসের সাথে কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে। উদ্ভিদ বায়ু থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং মাটি থেকে পানি গ্রহণ করে সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে ক্লোরোফিলের সাহায্যে নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করে। এ খাদ্য পাতায় তৈরি হয়। উদ্ভিদের খাদ্য তৈরির এ প্রক্রিয়াকে সালোকসংশ্লেষণ বলে।



উদ্ভিদ নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করে। আর প্রাণী তার খাদ্য পায় উদ্ভিদ থেকে। প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ এবং প্রাণীর নিঃশ্বাসের সাথে বর্জ্য হিসেবে কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগের ফলে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ মোট আয়তনের ০.০৩৬%। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। লোক বাড়ছে বলে কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগের পরিমাণও বাড়ছে। এছাড়াও মানুষ ঐচুর কলকারখানা গড়ে তুলছে। কলকারখানায় জ্বালানি পুড়ে বর্জ্য পদার্থ হিসেবে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়। অন্যদিকে মানুষ জ্বালানি ইত্যাদির জন্য বন কেটে ফেলেছে। ফলে গাছপালা কমে যাচ্ছে। গাছপালা কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করে যে খাদ্য তৈরি করত তা আর সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ দিন দিন বেড়ে চলেছে। প্রাণীর পরিবেশে ও জীবনে এ অতিরিক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইডের প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট ক্ষতিকর হতে পারে। কার্বন ডাইঅক্সাইড শ্বাসরোধক এবং সামান্য বিষাক্ত। বায়ুতে শতকরা ৫ ভাগের বেশি কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকলে আমাদের খুবই অস্বস্তি লাগে। এর পরিমাণ বেড়ে শতকরা ৪০ ভাগ হলে শ্বাসরোধ হয়ে প্রাণীর মৃত্যু ঘটতে পারে। তাই বায়ুমণ্ডলে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য একদিকে যেমন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন অন্যদিকে বেশি করে গাছ লাগাতে হবে। এজন্য প্রয়োজন মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোন রাসায়নিক বিক্রিয়াটি ভুল?

ক. অক্সিজেন + কার্বন = কার্বন ডাইঅক্সাইড	খ. অক্সিজেন + হাইড্রোজেন = পানি
গ. কার্বন + হাইড্রোজেন = ড্রাই আইস	ঘ. ধাতু + অক্সিজেন = ধাতুর অক্সাইড
২. ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়ার ফলে কী উৎপন্ন হয়?

ক. কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি	খ. ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও পানি
গ. কার্বন ডাইঅক্সাইড, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও পানি	ঘ. অক্সিজেন ও পানি
৩. একটি গ্যাসজারের মধ্যে মোমবাতি জ্বলছে। একজন শিক্ষার্থী তার ওপর কার্বন ডাই অক্সাইডপূর্ণ গ্যাস জার উপুড় করে ধরল। এ পরীক্ষায় কার্বন ডাই অক্সাইডের কোন দুইটি বিশেষ গুণের প্রমাণ পাওয়া যায়?

ক. কার্বন ডাইঅক্সাইড একটি বর্ণহীন, গন্ধহীন গ্যাস ও বায়ু অপেক্ষা হালকা
খ. কার্বন ডাইঅক্সাইড নিজে জ্বলে না, দহনে সাহায্য করে না ও বায়ু অপেক্ষা হালকা
গ. কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ু অপেক্ষা ভারী, নিজে জ্বলে না ও দহনে সাহায্য করে না
ঘ. কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ু অপেক্ষা ভারী, দহনে সাহায্য করে না ও নিজে জ্বলে
৪. পরিষ্কার চুনের পানির মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস প্রবাহিত করা হল। প্রথমে চুনের পানি ঘোলা হল এবং অধিক গ্যাস প্রবাহিত করায় ঘোলা চুনের পানি আবার পরিষ্কার হয়ে গেল। শেষে উৎপন্ন দ্রব্যটির নাম কী?

ক. ক্যালসিয়াম কার্বনেট	খ. ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড
গ. ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড	ঘ. ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট
৫. ড্রাই আইসকে তাপ দিলে কী হয়?

ক. ড্রাই আইস গলে পানি হয়ে যায়	খ. ড্রাই আইস গলে তরল কার্বন ডাই অক্সাইড হয়
গ. ড্রাই আইস জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়	ঘ. ড্রাই আইস সরাসরি কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসে পরিণত হয়
৬. যে বিক্রিয়া থেকে উপজাত হিসেবে O_2 পাওয়া যায়।

i. কার্বন ডাইঅক্সাইড + পানি \longrightarrow
ii. কার্বন ডাইঅক্সাইড + পানি $\xrightarrow[\text{সূর্যালোক}]{\text{ক্লোরোফিল}}$
iii. ম্যাগনেসিয়াম + কার্বন ডাইঅক্সাইড \longrightarrow

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অংশটুকু পড়ে ৭, ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

একটি পাত্রে চুনের পানি আছে। তাতে জ্বারে ফুঁ দিলে দেখা গেল চুনের পানির ওপর সাদা সরের মতো প্রলেপ পড়েছে। অনেকক্ষণ ফুঁ দেওয়ার পর প্রলেপটি দূরীভূত হল এবং দ্রবণটি পরিষ্কার হয়ে গেল।

৭. ফুঁ এর সাথে কোন গ্যাসটি নির্গত হয়েছে ?

- | | |
|----------------------|----------------|
| ক. হাইড্রোজেন | খ. অক্সিজেন |
| গ. কার্বন ডাইঅক্সাইড | ঘ. জলীয় বাষ্প |

৮. সরের মতো প্রলেপটি কোন পদার্থ ?

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| ক. ক্যালসিয়াম কার্বনেট | খ. ক্যালসিয়াম বাই কার্বনেট |
| গ. কার্বন ডাইঅক্সাইড | ঘ. ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড |

৯. যে যৌগ উৎপন্ন হওয়ার কারণে দ্রবণটি পরিষ্কার হয় তা হলো—

- | |
|------------------------------|
| ক. ক্যালসিয়াম কার্বনেট |
| খ. ক্যালসিয়াম বাই কার্বনেট |
| গ. গ্লুকোজ |
| ঘ. ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড |

সৃজনশীল প্রশ্ন

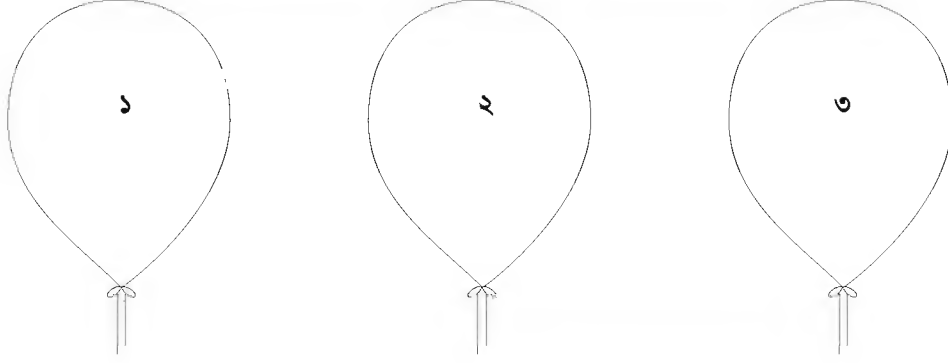
১. তোমাকে কিছু খাবার সোডা এবং ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট দেওয়া হল। তোমার বাসায় লেবু, আলু ও লাল শাক আছে। প্রতিটির রস তৈরি করে আলাদা আলাদা ভাবে প্রথমে খাবার সোডায় এবং পরে ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটে যোগ করলে।

- | |
|--|
| ক. খাবার সোডার সাথে কোনটির রস যোগ করলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস পাবে ? |
| খ. বিক্রিয়াটির শাস্তিক সমীকরণ লিখ। |
| গ. দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সেই রসটি যোগ করলে কী গ্যাস উৎপন্ন হবে তা সমীকরণসহ বর্ণনা কর ? |
| ঘ. উৎপন্ন গ্যাসটি অল্পধর্মী নাকি ক্ষারধর্মী? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। |

২. একটি অ্যালুমিনিয়ামের পাত চিমটির সাহায্যে আগুনে দহন করলে। এরপর জ্বলন্ত অবস্থায় একে কার্বন ডাই অক্সাইড পূর্ণ গ্যাস জারে প্রবেশ করালে। দেখলে গ্যাস জারের গায়ে কালো দাগ পড়েছে। এবার পাতটি শুধু বাতাসে দহন কর।

- | |
|---|
| ক. কোন পদার্থের জন্য কালো দাগ পড়েছে ? |
| খ. বিক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর। |
| গ. পাতটি শুধু বাতাসে দহন করলে কী হবে বিক্রিয়াসহ লিখ। |
| ঘ. উপরের পরীক্ষা থেকে কীভাবে প্রমাণ করবে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড একটি যৌগিক গ্যাস। |

৩.



উপরের তিনটি বেলুনে সম আয়তনের তিন প্রকার গ্যাস আছে। বেলুন তিনটি সুতা দিয়ে বাধা আছে।

১নং বেলুনের গ্যাসটি নিজে জ্বলে না এবং অন্য বস্তুকেও জ্বলতে সাহায্য করে না।

২নং বেলুনের গ্যাসটি নিজে জ্বলে কিন্তু অন্য বস্তুকে জ্বলতে সাহায্য করে না।

৩নং বেলুনের গ্যাসটি নিজে জ্বলে না কিন্তু অন্য বস্তুকে জ্বলতে সাহায্য করে।

ক. ১নং বেলুনের গ্যাসটির নাম কী?

খ. এ গ্যাসে ভেজা লিটমাস পেপার প্রবেশ করালে কী পরিবর্তন হবে বর্ণনা কর।

গ. এ গ্যাসটি চুনের পানিতে চালনা করলে যে বিক্রিয়া হবে তা সমীকরণসহ লিখ।

ঘ. বেলুন তিনটির সুতা ছেড়ে দিলে কী ঘটবে ব্যাখ্যা কর।

সপ্তম অধ্যায়

দ্রবণ

দ্রব, দ্রাবক ও দ্রবণ

তোমরা আখের গুড়ের শরবত অথবা চিনির শরবত পান করে থাকবে। আখের গুড়ের শরবত বা চিনির শরবত কীভাবে তৈরি করা হয় তোমরা নিশ্চয়ই তা জান। একটি কাচের গ্লাসে পরিষ্কার পানি নিয়ে তাতে কয়েক চামচ চিনি মিশিয়ে নাড়তে থাক। একটু পরেই দেখবে চিনি অদৃশ্য হয়ে গেছে। পানির মধ্যে চিনি খালি চোখে দেখা যাবে না, এমনকি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও দেখা যাবে না। প্রস্তু হল পানির মধ্যে চিনি মেশানোর পর চিনি কোথায় গেল? চিনি পানিতে দ্রবীভূত হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। চিনি মিশ্রিত পানি যুখে দিয়ে দেখ মিষ্টি লাগবে। এতে প্রমাণ হয় যে চিনি পানির মধ্যেই মিশে আছে। চিনি ও পানির এ মিশ্রণকে চিনি ও পানির দ্রবণ বলে।

চিনি পানিতে দ্রবণীয়। যে কঠিন পদার্থ দ্রবীভূত হয় তাকে দ্রব বলে। চিনি পানিতে দ্রবীভূত হয়েছে। তাই চিনি একটি দ্রব। যে তরল কোন পদার্থকে দ্রবীভূত করে তাকে দ্রাবক বলে। চিনি ও পানির দ্রবণে পানি চিনিকে দ্রবীভূত করেছে। তাই এক্ষেত্রে পানি একটি দ্রাবক। দ্রব এবং দ্রাবক মিলে যে সমস্ত মিশ্রণ তৈরি করে তাকে দ্রবণ বলে। অর্থাৎ

$$\text{দ্রব} + \text{দ্রাবক} = \text{দ্রবণ}$$

চিনির বদলে লবণ, তুত, বালি ও ময়দা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখ। এক গ্লাস পানিতে কয়েক চামচ লবণ নিয়ে নাড়তে থাক, কী দেখছ? লবণ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে লবণ পানির দ্রবণ তৈরি হয়েছে। অনুরূপভাবে একটি বিকারে পানি নিয়ে তাতে কপার সালফেট বা তুত মিশিয়ে নাড়াচাড়া করলে তুত পানির দ্রবণ তৈরি হবে। চিনি, লবণ অথবা কপার সালফেটের দ্রবণ বেশ কিছুক্ষণ রেখে দিলেও পাত্রের নিচে কোন তলানি জমবে না। এসব স্বচ্ছ দ্রবণ ফিল্টার কাগজ দিয়ে ছেঁকে বা পরিস্রাবণ করলে কোনো তলানি পাওয়া যাবে না।



চিত্র ৭.১ : লবণ, তুত, বালি ও ময়দার দ্রবণ তৈরি

এবার একটি বিকারে কিছুটা পানি নিয়ে তার মধ্যে কিছুটা বালি মিশ্রিত কর। বালি মিশ্রিত পানি একটি কাঠি দিয়ে ভালো করে নাড়তে থাক এবং মিশ্রণটি ভালভাবে লক্ষ কর। কী দেখছ? মিশ্রণটি ঘোলা দেখাচ্ছে। এবারে মিশ্রণটি স্থির অবস্থায় কিছুক্ষণ রেখে দাও। দেখবে বিকারের তলায় বালি পড়ে আছে এবং উপরে স্বচ্ছ পানি দেখা যাচ্ছে। এবারে খিতান বা পরিস্রাবণ পদ্ধতিতে বালি ও পানির মিশ্রণ পৃথক কর। দেখবে খিতানোর পর পাত্রের তলায় এবং পরিস্রাবণের পর ফিল্টার কাগজের উপর বালি পড়ে আছে। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা বলতে পারি বালি পানিতে দ্রবীভূত হয় না। তাই বালি ও পানির মিশ্রণকে দ্রবণ বলা যাবে না। বালি পানিতে অদ্রবণীয়।

একইভাবে একটি বিকারে কিছুটা পানি নিয়ে তাতে সামান্য ময়দা মিশিয়ে ভালোভাবে নাড়তে থাক। দেখবে ময়দা পানির সাথে সম্পূর্ণ মিশছে না। ময়দা ও পানির ঘোলা মিশ্রণ তৈরি হয়েছে। এ মিশ্রণ থেকে পরিস্রাবণ বা ছাঁকন প্রণালির

সাহায্যের ময়দা ও পানি পৃথক করা যায়। ময়দা ও পানির এ মিশ্রণকেও দ্রবণ বলা যাবে না। বালির মতো ময়দাও পানিতে অদ্রবণীয়। সুতরাং বলতে পারি দ্রব যদি দ্রাবকের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে মিশে সমসত্ত্ব মিশ্রণ তৈরি না করে তবে তাকে দ্রবণ বলা যায় না।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দ্রব, দ্রাবক এবং দ্রবণকে নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করতে পারি :

দ্রবণ

দুই বা ততোধিক পদার্থের সমসত্ত্ব মিশ্রণ যার উপাদানগুলোর আপেক্ষিক পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে পরিবর্তিত করা যায়, তবে ঐ মিশ্রণকে দ্রবণ বলে। দ্রবণের দুইটি অংশ যথা দ্রব ও দ্রাবক। যে পদার্থ দ্রবীভূত হয় তাকে দ্রব এবং যার মধ্যে দ্রবীভূত হয় তাকে দ্রাবক বলে। চিনি ও পানির দ্রবণে চিনি দ্রব এবং পানি দ্রাবক। অর্থাৎ

$$\text{দ্রবণ} = \text{দ্রব} + \text{দ্রাবক}$$

দ্রব

দ্রবণের মধ্যে যে উপাদানটি পরিমাণে কম থাকে এবং যে উপাদানটি কোনো তরল পদার্থে দ্রবীভূত হয়ে সমসত্ত্ব মিশ্রণ তৈরি করে তাকে দ্রব বলে। চিনি বা লবণ পানিতে দ্রবীভূত করে দ্রবণ প্রস্তুত করা হলে চিনি বা লবণই হবে ঐ দ্রবণের দ্রব।

দ্রাবক

দ্রবণের মধ্যে যে উপাদানটির অনুপাত বেশি এবং যে উপাদানটি কোনো কঠিন, তরল বা বায়বীয় পদার্থকে দ্রবীভূত করে সমসত্ত্ব মিশ্রণ তৈরি করে তাকে দ্রাবক বলে। পানি একটি উৎকৃষ্ট দ্রাবক।

দ্রবণের বৈশিষ্ট্য

দ্রবণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল

- (ক) দ্রবণ একটি সমসত্ত্ব মিশ্রণ। অর্থাৎ, দ্রবণের বিভিন্ন অংশের উপাদান, গঠন ও ধর্ম একই থাকবে।
- (খ) দ্রবণে দ্রব ও দ্রাবকের অণুগুলো তাদের নিজ নিজ ধর্ম বজায় রাখে।
- (গ) দ্রবণ থেকে দ্রবের কণাগুলো পরিস্রাবণ পদ্ধতিতে পৃথক করা যায় না।
- (ঘ) দ্রবণটিকে রেখে দিলে দ্রবণ থেকে দ্রবের কণাগুলো থিতুয়ে পড়ে না।
- (ঙ) কঠিন তরলের দ্রবণ থেকে পাতন প্রক্রিয়ার সাহায্যে দ্রব ও দ্রাবককে পৃথক করা যায়।
- (চ) দ্রবণের উষ্ণতার পরিবর্তন ঘটিয়ে দ্রবণে দ্রবের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি করা যায়।
- (ছ) দ্রবণে দ্রবগুলো এত সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে যে সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে তাদের দেখা যায় না।

পানি একটি উৎকৃষ্ট দ্রাবক

পৃথিবীতে হাজার রকমের তরল পদার্থের মধ্যে পানির পরিমাণ সবচাইতে বেশি। খাল বিল, নদী নালা ও সমুদ্রের পানির পরিমাণ মাপা সহজ নয়। পানি চাইলেই পাওয়া যায় অর্থাৎ পৃথিবীতে যত প্রকার তরল পদার্থ আছে তার মধ্যে পানিই সবচেয়ে সস্তা ও সহজলভ্য। পানির বড় গুণ হল পানি সবচাইতে বেশি পদার্থকে দ্রবীভূত করতে পারে। সেই জন্য প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ পানি পাওয়া যায় না। কারণ নদী পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে পাথর ও মাটির উপর দিয়ে গড়িয়ে আসার পথে দ্রবণীয় সমস্ত পদার্থকে দ্রবীভূত করে। এ সব পদার্থ পানিতে মিশে যায়। সেজন্য কোনো কোনো নদীর পানিতে লোহা ও চুন মিশ্রিত থাকে। বৃষ্টির পানিতে বাতাসের অনেক উপাদান দ্রবীভূত থাকে। ঝরনা ও নলকূপের পানি ভূ গর্ভের মাটি ভেদ করে আসার সময় পানিতে দ্রবণীয় খনিজ পদার্থ বহন করে আনে। এজন্য ঝরনা ও নলকূপের পানিতে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ ইত্যাদি কোন কোন খনিজ দ্রব্যের স্বাদ ও গন্ধ পাওয়া যায়। আমরা যে লবণ খাই তা

সমুদ্রের পানিতে অধিক পরিমাণে দ্রবীভূত থাকে। সেই কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমুদ্রের পানি শুকিয়ে লবণ প্রস্তুত করা হয়। অনেক গ্যাসীয় পদার্থও পানিতে দ্রবীভূত হয়।

সবরকম দ্রাবকের মধ্যে পানি সবচেয়ে সহজলভ্য ও সস্তা। পানি সবচেয়ে বেশি পদার্থ দ্রবীভূত করে। তাই পানিকে একটি উৎকৃষ্ট দ্রাবক বা মহাদ্রাবক বা সর্বজনীন দ্রাবক বলা হয়।

লবণ ও পানির সাহায্যে সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত দ্রবণ প্রস্তুতকরণ

একটি বিকারে কিছুটা পানি নিয়ে তাতে কয়েক চামচ লবণ মিশ্রিত কর এবং চামচ দিয়ে নাড়তে থাক। কী দেখছ? লবণ খুব তাড়াতাড়ি পানিতে দ্রবীভূত হয়ে সমস্ত মিশ্রণ তৈরি করেছে। এ অবস্থায় লবণ পানির যে দ্রবণ তৈরি হয়েছে তাকে অসম্পৃক্ত দ্রবণ বলে। এ দ্রবণে আরও অতিরিক্ত দ্রব যোগ করলে তা দ্রবীভূত হয়ে যাবে। অতএব, কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবক সর্বাধিক যে পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত করতে পারে তার চেয়ে কম পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থেকে যে দ্রবণ তৈরি করে তাকে অসম্পৃক্ত দ্রবণ বলে। অসম্পৃক্ত দ্রবণে অতিরিক্ত দ্রব যোগ করে দ্রবণটিকে সম উষ্ণতায় সম্পৃক্ত দ্রবণে পরিণত করা যায়। এসো, লবণ পানির অসম্পৃক্ত দ্রবণে আরও লবণ যোগ করে সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করি।

লবণ পানির অসম্পৃক্ত দ্রবণে এক চামচ এক চামচ করে লবণ মিশিয়ে দ্রবণটি ভালভাবে নাড়তে থাক। দেখবে লবণ দ্রবীভূত হয়ে গেছে। এভাবে অল্প অল্প করে লবণ দিতে থাক এবং নাড়তে থাক। দেখবে শেষ পর্যন্ত এমন এক সময় আসবে যখন আর লবণ দ্রবীভূত হবে না। নাড়া বন্ধ কর। পানি স্থির হলে দেখবে বিকারের তলায় কিছু লবণ জমে আছে। এর কারণ নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ লবণকে দ্রবীভূত অবস্থায় ধারণ করতে পারে। পানির পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে দেখবে বিকারের তলায় যেটুকু লবণ পড়েছিল তা দ্রবীভূত হয়ে যাবে। আবার পানির পরিমাণ না বাড়িয়ে দ্রবণের তাপমাত্রা বাড়িয়েও তলায় জমে থাকা দ্রব দ্রবীভূত করা যায়। এ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয়



চিত্র ৭.২ : লবণ পানির সম্পৃক্ত দ্রবণ প্রস্তুতি

যে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবকে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কী পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত হতে পারে তার একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। অর্থাৎ কোন দ্রাবক নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত করতে পারে। সুতরাং কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবকে যদি (সর্বাধিক) এমন পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থাকে যে আরও দ্রব যোগ করলে তা আর দ্রবীভূত হয় না তখন ঐ দ্রবণকে সম্পৃক্ত দ্রবণ বলে। আর যদি কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো দ্রবণে আরও দ্রব যোগ করলে তা দ্রবীভূত হয়ে যায়, তখন ঐ দ্রবণকে সেই তাপমাত্রায় অসম্পৃক্ত দ্রবণ বলে।

সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত দ্রবণের ব্যাপারটি আমরা খাওয়ার সাথে তুলনা করতে পারি। আমাদের যখন ক্ষুধা লাগে তখন আমরা খাবার খাই। সম্পূর্ণ ক্ষুধা না মেটা পর্যন্ত আমরা খেয়েই যাই। যখন আমাদের ক্ষিধে মিটে যায় তখন আমরা আর খেতে চাই না। যতক্ষণ আমাদের ক্ষুধা থাকে ততক্ষণ আমরা খাই। এ অবস্থাকে অসম্পৃক্ত দ্রবণের সাথে তুলনা করা চলে। কিন্তু আমাদের ক্ষুধা মিটে গেলে আর খেতে চাই না। এ অবস্থাকে সম্পৃক্ত দ্রবণের সাথে তুলনা করা চলে।

ইতোপূর্বে তোমরা লক্ষ করেছ উষ্ণতা বা তাপমাত্রার ওপর দ্রবের দ্রাব্যতা নির্ভর করে। নির্দিষ্ট উষ্ণতায় সম্পৃক্ত দ্রবণে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থাকে। দ্রবণের উষ্ণতা বাড়ালে দ্রাবকের দ্রব গ্রহণের ক্ষমতা বেড়ে যায়। ফলে বেশি উষ্ণতায় সম্পৃক্ত দ্রবণ অসম্পৃক্ত দ্রবণে পরিণত হয়। অন্যদিকে সম্পৃক্ত দ্রবণের উষ্ণতা কমালে দ্রবণ থেকে কিছু পরিমাণ দ্রব ধীরে ধীরে পৃথক হয়ে পাত্রের নিচে জমা হবে। অসম্পৃক্ত দ্রবণে আর দ্রব যোগ না করে দুইটি উপায়ে সম্পৃক্ত দ্রবণে পরিণত করা যায়।

(১) কোনো দ্রবণকে ঠাড়া করলে দ্রবের দ্রাব্যতা কমে যায়। ফলে অসম্পৃক্ত দ্রবণকে ঠাড়া করলে দ্রবণটি সম্পৃক্ত দ্রবণে পরিণত হবে।

(২) দ্রবণকে তাপ দিলে কিছু দ্রাবক বাষ্পীভূত হয়ে উড়ে যাবে, ফলে দ্রবণে দ্রাবকের পরিমাণ কমে যাবে। এ অবস্থায় দ্রবণটি সম্পৃক্ত দ্রবণে পরিণত হবে।

সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত দ্রবণের পার্থক্য

সম্পৃক্ত দ্রবণ	অসম্পৃক্ত দ্রবণ
১) সম্পৃক্ত দ্রবণে আরও দ্রব যোগ করলে তা দ্রবীভূত হবে না, পাত্রের তলায় জমা হবে।	১) অসম্পৃক্ত দ্রবণ সম্পৃক্ত না হওয়া পর্যন্ত আরও দ্রব দ্রবীভূত করতে পারে।
২) সম্পৃক্ত দ্রবণের উষ্ণতা বাড়ালে দ্রবণটি অসম্পৃক্ত দ্রবণে পরিণত হবে। কারণ উষ্ণতা বাড়লে দ্রাবকের দ্রব গ্রহণের ক্ষমতা বা দ্রাব্যতা বেড়ে যায়।	২) অসম্পৃক্ত দ্রবণের উষ্ণতা বাড়ালে আরও বেশি অসম্পৃক্ত হয়ে পড়ে।
৩) সম্পৃক্ত দ্রবণের উষ্ণতা কমাতে বা ঠাড়া করলে দ্রবণ থেকে ধীরে ধীরে দ্রব পৃথক হয়ে পাত্রের তলায় জমা হবে। কারণ উষ্ণতা কমে গেলে দ্রাবকের দ্রব গ্রহণের ক্ষমতা কমে যায়।	৩) অসম্পৃক্ত দ্রবণের উষ্ণতা কমাতে বা ঠাড়া করলে তা ধীরে ধীরে সম্পৃক্ত দ্রবণে পরিণত হবে।
৪) সম্পৃক্ত দ্রবণে আরও কিছুটা পানি যোগ করলে দ্রবণটি অসম্পৃক্ত দ্রবণে পরিণত হবে। কারণ, দ্রাবকের পরিমাণ বাড়ালে সমউষ্ণতায় দ্রাবকটি বেশি পরিমাণ দ্রব গ্রহণ করতে পারে।	৪) অসম্পৃক্ত দ্রবণে আরও পানি যোগ করলে দ্রবণটি আরও বেশি অসম্পৃক্ত বা লঘু হবে।

তোমরা দেখেছ কোনো দ্রাবকে দ্রব যোগ করে দ্রবণ তৈরি করা হয়। প্রশ্ন হল কোন নির্দিষ্ট আয়তনের দ্রাবকে চিনি বা লবণ মিশ্রিত করে দ্রবণ তৈরি করার পর দ্রাবকের আয়তনের কোনো পরিবর্তন হয় কি?

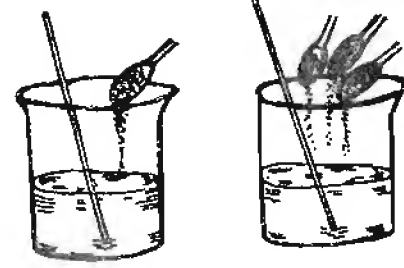
১০০ ঘন সেমি পানিতে লবণ বা চিনির সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করে পুনরায় মাপচোঙ দিয়ে মেপে দেখ। দেখবে, দ্রবণ তৈরির পর দ্রাবকের আয়তনের কোনো পরিবর্তন হয়নি। চিনি বা লবণ পানিতে দ্রবীভূত হওয়ার ফলে পানির ঘনত্ব বেড়ে গেছে। অসম্পৃক্ত দ্রবণকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা লঘু বা পাতলা দ্রবণ এবং গাঢ় বা ঘন দ্রবণ। যে দ্রবণে দ্রবের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম থাকে তাকে লঘু বা পাতলা দ্রবণ বলে। আর যে দ্রবণে দ্রবের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে তাকে গাঢ় বা ঘন দ্রবণ বলে।

কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ তরল পদার্থে সকল বস্তু সমান পরিমাণে দ্রবীভূত হয় না। ১০০ সিসি পানিতে যে পরিমাণ চিনি দ্রবীভূত হয় সেই একই পরিমাণ পানিতে সমপরিমাণ লবণ দ্রবীভূত হয় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখ।

পরীক্ষা ৭.১ : একটি বিকারে মাপ চোঙ দিয়ে মেপে ১০০ সিসি পানি নাও। এবার বিকারে পানিতে চা চামচ ভর্তি করে এক এক চামচ করে চিনি মেশাও ও নাড়তে থাকো। এভাবে চিনি ও পানির সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে মোট কত চামচ চিনি লেগেছে তা খাতায় নিম্নরূপ ছক তৈরি করে লিখে রাখো :

দ্রাবক	চিনি ও পানির সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে যত চামচ চিনি লেগেছে	লবণ ও পানির সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে যত চামচ লবণ লেগেছে
পানি ১০০ সিসি		

অনুরূপভাবে বিকারে ১০০ সিসি পানি নিয়ে ঐ একই চামচ দিয়ে মেপে এক এক চামচ করে লবণ বিকারের পানিতে মেশাও এবং নাড়তে থাক। এভাবে লবণ পানির সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি কর। লবণে পানির সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে মোট কত চামচ লবণ লেগেছে তা খাতায় ছকে লিখে রাখো। কী দেখছ? উভয়ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে কি সমপরিমাণ চিনি ও লবণ লেগেছে? তোমাদের ছকের দিকে লক্ষ কর। সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে যত চামচ লবণ লেগেছে তার চেয়ে অনেক বেশি চিনি লেগেছে। এ কথার অর্থ হল লবণের চেয়ে চিনি পানিতে অনেক বেশি পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। সাধারণ তাপমাত্রায় চিনি লবণের চেয়ে ৬ গুণ বেশি দ্রবীভূত হয়। এর কারণ চিনির দ্রাব্যতা লবণের চেয়ে অনেক বেশি। অতএব বলা যায়, কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোন দ্রবের যত গ্রাম একশত গ্রাম কোন দ্রাবকে দ্রবীভূত হয়ে সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করে, দ্রবের সেই পরিমাণকে ঐ তাপমাত্রায় ও ঐ দ্রাবকে দ্রবের দ্রাব্যতা বলে।



চিত্র ৭.৩ : লবণ ও চিনির দ্রবণ

বিভিন্ন প্রকারের দ্রবণ প্রস্তুত

দ্রবণকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন :

(ক) কঠিন ও তরলের দ্রবণ : সাধারণ লবণ, চিনি, তুতে প্রভৃতি কঠিন পদার্থকে পানিতে দ্রবীভূত করে ঐ সব পদার্থের জলীয় দ্রবণ প্রস্তুত করা হয়। এ দ্রবণে পানিকে দ্রাবক এবং কঠিন পদার্থ লবণ, চিনি, তুতে ইত্যাদিকে দ্রব বলে। চিনি ও পানির দ্রবণে পানি দ্রাবক এবং চিনি দ্রব।

(খ) তরল ও তরলের দ্রবণ : এ দ্রবণে দ্রব ও দ্রাবক উভয়েই তরল। এখানে যে তরলের পরিমাণ বেশি তাকে দ্রাবক এবং যে তরলের পরিমাণ কম তাকে দ্রব বলে। যেমন : ১ লিটার দুধে ১০০ সিসি পানি মিশিয়ে দুধ ও পানির জলীয় দ্রবণ তৈরি করা হল। দ্রবণটিতে দুধের পরিমাণ বেশি তাই দুধ দ্রাবক এবং পানির পরিমাণ কম তাই পানি দ্রব।

(গ) তরল ও গ্যাসের দ্রবণ : সোডা ওয়াটার হল কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের জলীয় দ্রবণ। এখানে পানি দ্রাবক এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড দ্রব।

(ঘ) গ্যাসীয় দ্রবণ : পরস্পর বিক্রিয়া করে না এমন দুই বা ততোধিক গ্যাস যে কোন অনুপাতে মিশে সমসত্ত্ব গ্যাসীয় মিশ্রণ সৃষ্টি করে। বায়ু প্রধানত নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের গ্যাসীয় মিশ্রণ। এখানে নাইট্রোজেন অধিক বলে দ্রাবক এবং অন্যান্য গ্যাসকে দ্রব হিসেবে ধরা হয়।

(ঙ) কঠিন দ্রবণ : ব্রোঞ্জ/কাঁসা হল কপার ও জিঙ্কের মিশ্রণ, পিতল হলো কপার ও টিনের মিশ্রণ।

দ্রবণ থেকে কঠিন দ্রব পৃথকীকরণ

আমরা জানি যে কোনো দ্রবণের দুইটি অংশ : যথা দ্রব ও দ্রাবক। লবণ ও পানির দ্রবণে লবণ দ্রব এবং পানি দ্রাবক। দ্রবণ থেকে কঠিন দ্রব ও তরল দ্রাবক আলাবণ ও পরিস্রাবণ পদ্ধতিতে পৃথক করা যায় না। কোনো পাত্রে লবণ পানির দ্রবণ রেখে দিলে দ্রবণ একই অবস্থায় থাকে, দ্রব ও দ্রাবক পৃথক হয় না। ফিল্টার কাগজে ছেঁকেও দ্রাবক পৃথক করা যায় না। বাষ্পীভবন ও পাতন প্রক্রিয়ার সাহায্যে দ্রবণের উপাদানগুলো পৃথক করা যায়।

দ্রবণ কোনো পাত্রে নিয়ে তাপ দিলে দ্রবণ থেকে তরল পদার্থ বাষ্পাকারে উড়ে যায় এবং কঠিন দ্রব শুষ্ক অবস্থায় পাত্রের তলায় পড়ে থাকে। এ পদ্ধতিকে বাষ্পীভবন বলে। বাষ্পীভবন পদ্ধতিতে তরল দ্রাবক বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। তাই তরল অংশ ফিরে পাওয়া যায় না।

পানি বা অন্য কোনো তরল পদার্থকে তাপ দিলে প্রথমে বাষ্পে পরিণত হয়, সেই বাষ্পকে পুনরায় ঠাণ্ডা করে তরল

অবস্থায় পরিণত করা যায়। যে প্রণালিতে কোনো তরলকে প্রথমে বাষ্পে পরিণত করে সেই বাষ্পকে শীতল করে পুনরায় তরল অবস্থায় পরিণত করা হয় তাকে পাতন বলে। সুতরাং

$$\text{পাতন} = \text{বাষ্পীভবন} + \text{ঘনীভবন}।$$

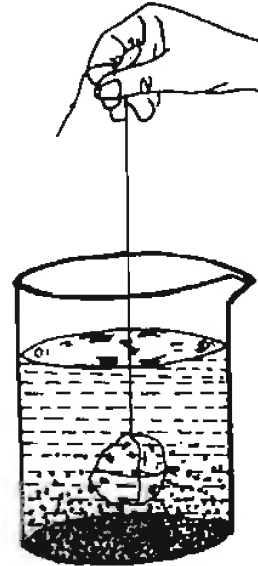
পাতন প্রণালির সাহায্যে লবণ পানির দ্রবণ থেকে লবণ ও পানি দুটোই ফেরৎ পাওয়া যায়। বাষ্পীভবন ও পাতন প্রণালি ছাড়াও স্ফটিকীকরণ বা কেলাসন পদ্ধতিতে দ্রবণ থেকে আংশিকভাবে দ্রব পৃথক করা যায়।

স্ফটিকীকরণ পদ্ধতিতে দ্রব পৃথকীকরণ

একটি বিকারে চিনি, লবণ অথবা তুতের সম্মিশ্রিত দ্রবণ তৈরি কর। এ সম্মিশ্রিত দ্রবণকে উত্তপ্ত করলে তা অসম্পৃক্ত দ্রবণে পরিণত হবে। এ অবস্থায় দ্রবণের মধ্যে আরও দ্রব মিশালে তা দ্রবীভূত হয়ে যাবে। এ উত্তপ্ত ও ঘন দ্রবণকে ছাঁকন কাগজ দিয়ে ছাঁকে দ্রবণটি ঠাণ্ডা কর। কিছুক্ষণ পর লক্ষ কর। কিছু দেখা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ, কিছু কঠিন পদার্থ দানার আকারে দ্রবণের তলায় থিথিয়ে পড়েছে। এরূপ কঠিন পদার্থকে বলা হয় স্ফটিক বা ক্রিস্টাল বা কেলাস। আর এ পদ্ধতিকে বলা হয় স্ফটিকীকরণ বা কেলাসন পদ্ধতি। কোনো কোনো পদার্থের স্ফটিক দেখতে খুব সুন্দর। তোমরা মিছরি দেখেছ। মিছরির দানাও এরূপ স্ফটিক। লবণ, মিছরি, তুতে, ফিটকিরি ইত্যাদির কেলাস বা স্ফটিক দেখতে সুন্দর।

মিছরি প্রস্তুতি

আমরা যে মিছরির শরবত খাই সেই মিছরি কিন্তু তোমরা বাড়িতে তৈরি করতে পার। একটি বাটিতে পানি নাও। এতে চিনি মিশাও ও চিনির দ্রবণ উত্তপ্ত কর। চিনি যতক্ষণ পর্যন্ত বাটির তলায় না পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত দ্রবণে চিনি মিশাতে থাক। কিছুক্ষণ তাপ দেওয়ার পর দ্রবণ ছাঁকে নাও এবং চিনির ঘন দ্রবণ দুই ভাগে ভাগ করে দুইটি কাপে রাখ। একটি কাপে একদানা মিছরি ফেলে দাও। অপর কাপে মিছরির একটি দানা সুতা দিয়ে কাঠিতে বেঁধে চিনির দ্রবণের মধ্যে ঝুলিয়ে দাও। চিনির দ্রবণসহ কাপ দুইটি ঠাণ্ডায় রেখে দাও। কয়েক ঘণ্টা পর কাপ দুইটি ঠাণ্ডা হলে দেখবে প্রথম কাপের তলায় বহু সংখ্যক মিছরির দানা পড়ে আছে এবং দ্বিতীয় কাপের মিছরির দানাটি আকারে অনেক বড় হয়েছে। ঝুলানো মিছরির দানায় দ্রবণ থেকে চিনির দানা সঞ্চিত হওয়ায় মিছরির আকার বড় হয়েছে।



চিত্র ৭.৪ : মিছরি প্রস্তুতি

সমুদ্রের পানি থেকে লবণ তৈরি

আমরা প্রতিদিন লবণ খাই। প্রত্যেক প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য লবণ প্রয়োজন। লবণ ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। শাক সবজি, ফল মূল, মাছ, মাংস, পানীয় প্রভৃতির মধ্যে লবণ থাকে। উদ্ভিদ মূলের সাহায্যে মাটি থেকে খনিজ লবণ শোষণ করে। এ লবণ আমরা খাদ্যের সাথে গ্রহণ করি। লবণের অভাবে আমাদের নানা প্রকার রোগ হয়। লবণ আমাদের রক্ত পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। মাছ, মাংস প্রভৃতি টাটকা রাখার জন্য এবং চামড়া সংরক্ষণেও লবণ ব্যবহার করা হয়। খাদ্যে পরিমাণ মতো লবণ ব্যবহার করলে খাদ্য সুস্বাদু হয়। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত লবণ ব্যবহার করলে খাদ্য অখাদ্যে পরিণত হয়। সুতরাং তোমরা বুঝতে পেরেছ লবণ আমাদের জন্য কত প্রয়োজন এবং খাদ্য তৈরি করতে পরিমাণমত লবণ ব্যবহার করা দরকার।

এখন প্রশ্ন হল এ লবণ আমরা কোথা থেকে পাই? হ্যাঁ, আমরা যে লবণ খাই তা দুটো জায়গা থেকে পাওয়া যায়। যেমন লবণের খনি থেকে আর সমুদ্রের পানি থেকে। পৃথিবীর সব দেশেই যে লবণের খনি আছে তা নয়। আমাদের দেশেও লবণের খনি নেই। তাই আমাদের দেশে আমরা লবণ পাই সমুদ্রের পানি থেকে।

সমুদ্রের পানি মুখে দিলে ভীষণ নোনতা লাগে। এ পানি পান করা যায় না। সমুদ্রের পানি আসলে লবণের দ্রবণ। সূর্যের তাপে সমুদ্রের পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, কিন্তু পানিতে দ্রবীভূত লবণ সমুদ্রেই থেকে যায়। সমুদ্রের পানি বাষ্প হয়ে মেঘের সৃষ্টি হয়। মেঘ পাহাড়ের গায়ে বরফরূপে জমা হয়। আবার মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। বরফগলা পানি অথবা বৃষ্টির পানি নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আবার সমুদ্রে ফিরে আসে। তোমরা জেনেছ পানি একটি উৎকৃষ্ট দ্রাবক। ভূ পৃষ্ঠের মাটি, পাথর ইত্যাদির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আসার পথে পানি বিভিন্ন প্রকার লবণকে দ্রবীভূত করে। এ দ্রবীভূত লবণ পানির সঙ্গে সমুদ্রে গিয়ে জমা হয়। দিন দিন এভাবে জমা হয়ে সমুদ্রের পানিতে লবণের ভাগ বেড়েই চলেছে। সমুদ্রের পানি লবণাক্ত হওয়ার কারণ তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ। সমুদ্রের বিশাল জলরাশিতে এক হাজার ভাগের ছাব্বিশ ভাগ লবণ আছে। তাই সমুদ্রের পানি থেকে খাবার লবণ তৈরি করা হয়।

তোমরা পূর্বেই জেনেছ লবণ পানির দ্রবণকে তাপ দিলে পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যায় এবং লবণের দানা বা স্ফটিক তৈরি হয়। দ্রবণ থেকে এ পদ্ধতিতে দ্রব ফেরত পাওয়ার পদ্ধতিকে কী বলে, তোমরা মনে করতে চেষ্টা কর। একে বলে বাষ্পীভবন পদ্ধতি। এ বাষ্পীভবন পদ্ধতিতেই সমুদ্রের পানি থেকে লবণ তৈরি সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। লবণ তৈরির পদ্ধতি বেশ মজার। প্রচুর পরিমাণে লবণ তৈরির জন্য রাশি রাশি সমুদ্রের পানিকে বাষ্পীভবন করার প্রয়োজন হয়। আমাদের বাড়িতে চুলায় সমুদ্রের পানি তাপ দিয়ে লবণ তৈরি করা হয়। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায় এ পদ্ধতিতে প্রতিবছর হাজার হাজার মণ লবণ তৈরি হয়। যারা লবণ তৈরি করেন তাঁদের বলা হয় লবণ চাষি।

লবণ উৎপাদনের জন্য সমুদ্রের উপকূলে জমিতে বাঁধ দিয়ে পানি জমা করা হয়। সমুদ্রের পানিতে জোয়ার এলে এ বাঁধ দেওয়া স্থানগুলো পানিতে ভরে যায়। অনেক সময় নালা কেটে এসব জায়গায় পানি আনা হয়। তারপর নালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে পানি আর বাঁধ দেওয়া জায়গায় ঢুকতে বা বের হতে পারে না। তারপর পানি সূর্যের তাপে বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। বাঁধ দেওয়া জমিতে পাঁচ ছয় ইঞ্চি পুরু লবণের স্তর জমে। এভাবে লবণ তৈরি করতে ২০/২৫ দিন সময় লাগে। এ লবণে বিভিন্ন রকম ময়লা থাকে। তাই এ লবণকে যন্ত্রের সাহায্যে পরিষ্কার করে বাজারে বিক্রি করা হয়। লবণ পরিষ্কার করার এ যন্ত্রকে সল্ট রিফাইনিং মেশিন বা লবণ শোধনকারী যন্ত্র বলে। মানুষের শরীরের জন্য প্রতিদিন খুব সামান্য পরিমাণ আয়োডিনের প্রয়োজন। আয়োডিনের অভাবে থাইরয়েড গ্রন্থির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন হয় না। ফলে গলগড় রোগ হয়। গর্ভবতী মায়ের শরীরের সামান্য আয়োডিনের অভাবে অনেক সময় বিকলাঙ্গ ও হাবাগোবা শিশুর জন্ম হয়। তাই সল্ট রিফাইনিং মেশিনে লবণ শোধনের সময় লবণে আয়োডিন যৌগ মেশানো হয়। বর্তমানে আমরা আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার করি। তোমরা রান্নাবান্না ও টেবিল সল্ট হিসেবে আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার করবে।

তরল ও গ্যাসের দ্রবণ

আমরা এ অধ্যায়ে কঠিন দ্রব ও তরল দ্রাবকের দ্রবণ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। দ্রবণের শ্রেণীবিভাগে তোমরা জেনেছ যে কঠিন দ্রব ও তরল দ্রাবকের মিশ্রণেই যে শুধু দ্রবণ তৈরি হয় তা নয়, তরল ও তরলের মিশ্রণেও দ্রবণ তৈরি হয়। তরল ও গ্যাসের মিশ্রণে এবং গ্যাস ও গ্যাসের মিশ্রণেও দ্রবণ তৈরি হয়। দ্রব গ্যাস এবং দ্রাবক তরল এমন একটি দ্রবণের উদাহরণ দিতে চেষ্টা কর। তোমরা হয়তো বলবে সোডা ওয়াটার, লেমনেড ইত্যাদি। আমরা জানি সকল জীবের শ্বাসকার্যের জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন। পানিতে বসবাসকারী জীব যেমন মাছ, জলজ উদ্ভিদ ইত্যাদি শ্বাসকার্যের জন্য অক্সিজেন কোথা থেকে পায় বলতে পার? হ্যাঁ, অক্সিজেন পানিতে ঈষৎ দ্রবণীয়। অর্থাৎ অক্সিজেন দ্রব এবং পানি দ্রাবক। অক্সিজেন ও পানির মিশ্রণে সমসত্ত্ব দ্রবণ তৈরি হয়। অক্সিজেন পানিতে দ্রবীভূত থাকে বলেই জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীরা শ্বাস প্রশ্বাস কার্য চালাতে পারে। মাছ ফুলকার সাহায্যে এবং জলজ উদ্ভিদ পাতার সাহায্যে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করে শ্বাসকার্য সম্পাদন করে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোন উক্তিটি দ্রবণের সঠিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করছে ?
 ক. দ্রবণের বিভিন্ন অংশের উপাদান, গঠন ও ধর্ম এক নয়
 খ. দ্রবণ থেকে ছাঁকন বা পরিস্রাবণ পদ্ধতিতে উপাদান পৃথক করা যায়
 গ. দ্রবণ রেখে দিলে দ্রবের দানাগুলো থিতিয়ে পড়ে
 ঘ. দ্রবণ, দ্রব ও দ্রবকের অণুগুলোর ধর্ম বজায় থাকে
 ২. পানি ও তুতের সম্পৃক্ত দ্রবণে আরও পানি মিশালে কী হবে ?
 ক. দ্রবণটি আরও সম্পৃক্ত হবে
 খ. দ্রবণটি অসম্পৃক্ত হবে
 গ. তুতের দানা তলানি হিসেবে তলায় জমা হবে
 ঘ. দ্রবণটির কোন পরিবর্তন হবে না
 ৩. পানি ও চিনি এবং পানি ও লবণের ক্ষেত্রে কোন উক্তিটি শুদ্ধ ?
 ক. পানি সকল বস্তুকে সমানভাবে দ্রবীভূত করে
 খ. চিনি অপেক্ষা লবণ পানিতে বেশি পরিমাণে দ্রবীভূত হয়
 গ. লবণ অপেক্ষা অনেক বেশি পরিমাণ চিনি দ্রবীভূত হয়
 ঘ. পানিতে সমান পরিমাণ চিনি ও লবণ দ্রবীভূত হয়
 ৪. ২৫০ সিসি পানিতে ২০ গ্রাম চিনি দ্রবীভূত করা হলে কোনটি দ্রাবক ?
 ক. চিনি
 খ. পানি
 গ. চিনি ও পানি উভয়ই দ্রাবক
 ঘ. কোনোটিই দ্রাবক নয়
 ৫. ২৫০ সিসি পানিতে ২৫ গ্রাম চিনি দ্রবীভূত করা হলে দ্রবণের আয়তন কত হবে ?
 ক. ২৫০ সিসি
 খ. ২৭৫ সিসি
 গ. ৩০০ সিসি
 ঘ. ৩৫০ সিসি
- ৫০০ সিসি আয়তনের একটি বিকারে ২৫০ মিলি পানি দিয়ে ১০ গ্রাম লবণ দ্রবীভূত করে একটি সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করা হল। এরপর বিকারের দ্রবণে সামান্য পরিমাণ লবণ যোগ করা হল।

উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৪. যদি দ্রবণটিতে তাপ প্রয়োগ করা হয় তবে
 i. লবণ বিকারের তলায় জমা হবে
 ii. যোগ করা লবণ দ্রবীভূত হবে
 iii. দ্রবণটির কোনো পরিবর্তন হবে না

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|--------|------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i ও iii |

৫. সম্পৃক্ত দ্রবণটির আয়তন কত হবে ?

ক. ২৫০ সিসি

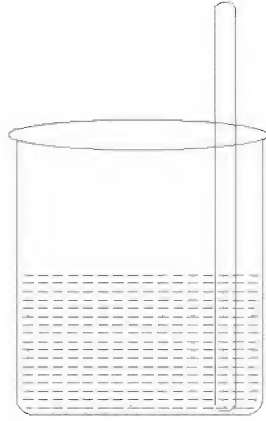
খ. ২৬০ সিসি

গ. ৫০০ সিসি

ঘ. ৭৫০ সিসি

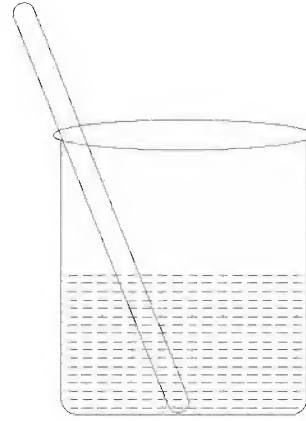
সৃজনশীল প্রশ্ন

১.



৫ গ্রাম তুঁতে + ১০০ মিলি পানি

চিত্র ক



১০ গ্রাম চিনি + ১০০ মিলি পানি

চিত্র খ

ক. 'ক' চিত্রের দ্রবণের দ্রবটির নাম কী?

খ. কোন ক্ষেত্রে বেশি দ্রব দ্রবীভূত হবে তা ব্যাখ্যা কর।

গ. অধিক তাপ প্রয়োগ করলে 'খ' এর ক্ষেত্রে কী ঘটবে?

ঘ. 'ক' ও 'খ' এর মধ্যে কোনটি থেকে দ্রব দ্রুত ফেরত পাওয়া যাবে মতামত দাও।

২. আনছার মিঞা খেজুরের গুড় তৈরি করেন। প্রতিদিন সকালে সে খেজুরের রস সংগ্রহ করে। পরে তা ছড়ানো মুখওয়ালা টিনের পাত্রে রেখে তাপ দেয়। অনেকক্ষণ তাপ দেওয়ার ফলে পাত্রের তলায় খেজুরের গুড় জমা হয়।

ক. খেজুরের রসের রাসায়নিক নাম কী বলা যায় ?

খ. আনছার মিঞা ছড়ানো মুখওয়ালা টিনের পাত্রে রস জ্বাল দেয় কেন ?

গ. পাত্রের নিচে তাপ দেওয়ার ফলাফল ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আমাদের প্রতিদিনের জীবন যাত্রায় এ প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব লিখ ?

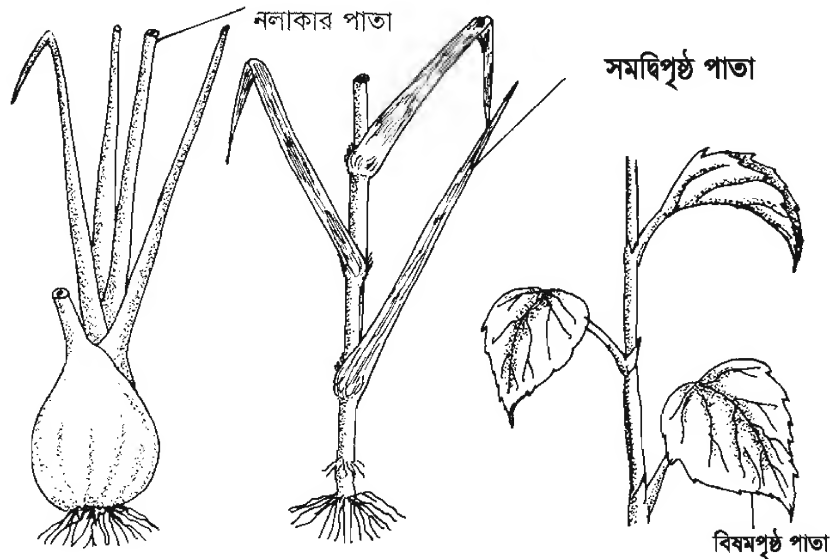
অষ্টম অধ্যায়

উদ্ভিদের অঙ্গসংস্থান : পাতা, কাণ্ড, ফুল ও ফল

পাতা গাছের অঙ্গ। পাতা, পাতার বৈশিষ্ট্য, পাতার বিভিন্ন অংশ যেমন : পত্রমূল, বোঁটা বা পত্রবৃন্ত ও পত্রফলক এবং পাতার সাধারণ শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে আমরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে শিখেছি। সস্তম শ্রেণীতে আমরা পাতার স্থায়িত্ব, সাধারণ আকৃতি ও সূর্যালোক প্রাপ্তি অনুসারে পাতার প্রকারভেদ, পরিবর্তিত পাতা, পরিবর্তিত কাণ্ড, ফুল, ফুলের বিভিন্ন অংশ, ফুলের শ্রেণী বিভাগ, পুষ্পমঞ্জরি ও তার শ্রেণী বিভাগ, ফুলের পরাগায়ণ ও তার শ্রেণী বিভাগ ও ফলের উৎপত্তি ইত্যাদি সম্পর্কে জানব।

পাতার প্রকারভেদ

স্থায়িত্ব অনুসারে পাতাকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে (১) আশুপাতী বা কড়কাস (Caducous) : যে সব পাতা পরিপূর্ণভাবে পরিষ্কৃতিত হওয়ার সাথে সাথে ঝরে যায় তাকে আশুপাতী (ক্ষণস্থায়ী) পাতা বলে। যথা একাসিয়া বা আকাশমণি, ফণিমনসা জাতীয় গাছের পাতা। (২) পাতী বা ডেসিডুয়াস (Deciduous) : যে সকল পাতা এক ঋতু বা এক বৎসরকাল স্থায়ী হয় এবং পরে ঝরে যায় তাকে ডেসিডুয়াস বা পাতী পাতা বলে। যথা : শিমুল, শাল। ডেসিডুয়াস পাতার উদ্ভিদকে পত্রঝরা উদ্ভিদ বলে। পত্রঝরা উদ্ভিদের অরণ্যকে পত্রঝরা অরণ্য বলা হয়। যেমন : ভাওয়ালের শালবন। (৩) স্থায়ী বা পারসিস্টেন্ট (Persistent) : যে সকল পাতা অনেকদিন স্থায়ী হয় তাকে স্থায়ী বা চিরহরিৎ পাতা বলে। যেমন : দেবদারু। এরূপ পাতাযুক্ত উদ্ভিদকে চিরহরিৎ উদ্ভিদ বলে এবং চিরহরিৎ উদ্ভিদের অরণ্যকে চিরহরিৎ অরণ্য বলে। যেমন : সুন্দরবন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বন।



চিত্র ৮.১ : সাধারণ আকৃতি ও আলোক প্রাপ্তি অনুসারে বিভিন্ন রকম পাতা

সাধারণ আকৃতি ও আলোক প্রাপ্তি অনুসারে পাতাকে তিনভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা (১) বিষমপৃষ্ঠ পাতা : চ্যাপ্টা সবুজ পাতা যখন মাটির সাথে সমান্তরালভাবে অবস্থান করে তখন তাকে বিষমপৃষ্ঠ পাতা বলে। এ পাতার দুই পৃষ্ঠে সমানভাবে সূর্যালোক পড়ে না বলে উপরের পৃষ্ঠ গাঢ় সবুজ ও নিচের পৃষ্ঠ হালকা সবুজ। যেমন : আম, কাঁঠাল, বট এর পাতা। (২) সমদ্বিপৃষ্ঠ পাতা : চ্যাপ্টা সবুজ পাতা যখন মোটামুটিভাবে উপরে নিচে ঝাড়াভাবে অবস্থান করে তখন তাকে সমদ্বিপৃষ্ঠ পাতা বলে। এ পাতার দুই দিকেই সমান সূর্যালোক পড়ে বলে উভয় পৃষ্ঠই একই রকম সবুজ। যেমন : ঘাস, ধান,

আখ প্রভৃতি। (৩) নলাকার পাতা : এ পাতা নলাকার এবং ঝাড়াভাবে অবস্থান করে, তাই সূর্যালোক সবদিকেই সমানভাবে পড়ে। যেমন : পেঁয়াজ পাতা।

পরিবর্তিত পাতা

কোন কোন গাছের পাতার ফলক বা পত্রক পরিবর্তিত হয়ে কিছু বিশেষ কাজ সম্পাদন করে থাকে। যেমন : মটরশুঁটি, ফণিমনসা, পেঁয়াজ ইত্যাদি। এগুলোর পাতার পরিবর্তন নিম্নরূপে ঘটে থাকে।

পত্র আকর্ষী : মটর গাছের পত্রফলক আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে আকর্ষীতে পরিণত হয়। মটর গাছ এ আকর্ষীর সাহায্যে অবলম্বনকে বেয়ে উপরে উঠে।

পত্র কণ্টক : কোন কোন গাছের পাতা কণ্টকে পরিবর্তিত হয়। বিভিন্ন তৃণভোজী জন্তুর হাত থেকে পত্র কণ্টক উদ্ভিদকে রক্ষা করে। যেমন : ফণিমনসা, খেজুর ইত্যাদি।

শঙ্ক পত্র : রসুন, পেঁয়াজ, আলু, ওল, আদা, হলুদ প্রভৃতির ভূ নিম্নস্থ কাণ্ডে পত্রফলক খুবই পাতলা ও অসবুজ পাতায় পরিবর্তিত হয়। এদেরকে শঙ্ক পত্র বলে। শঙ্ক পত্র কখনও শুষ্ক ও পাতলা হয় আবার কখনও রসালো ও পুরু হয়। যেমন : পেঁয়াজ, রসুন। কক্ষমুকুলকে রক্ষা করাই শঙ্কপত্রের কাজ।



চিত্র ৮.২ : পত্র আকর্ষী (মটরশুঁটি)

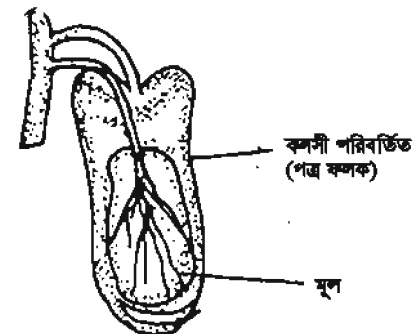
কিছু কিছু উদ্ভিদের পাতা কতগুলো জৈবিক কাজ সম্পন্ন করার জন্য পরিবর্তিত হয়। যেমন : পতঙ্গ ধরার ফাঁদ, পানি সঞ্চয়, খাদ্য সঞ্চয়, জনন ইত্যাদি।

কলসি উদ্ভিদ, ঝাঁঝি, সূর্যশিশির প্রভৃতি উদ্ভিদের পাতা আমিষ জাতীয় খাদ্যের জন্য পতঙ্গ ধরার ফাঁদ হিসেবে কলসি, থলি প্রভৃতিতে পরিবর্তিত হয়। এ ধরনের উদ্ভিদকে পতঙ্গাভুক উদ্ভিদ বলে। কলসি গাছের পত্রফলক পরিবর্তিত হয়ে কলসি আকৃতি ধারণ করে। পত্রফলকের আগা কলসির ঢাকনি হিসেবে কাজ করে। কোন পতঙ্গ কলসিতে ঢুকলে ঢাকনিটি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পতঙ্গটি আস্তে আস্তে মরে যায়। বিভিন্ন উদ্ভেদকের সাহায্যে পতঙ্গাভুক উদ্ভিদ কর্তৃক হজম হয়ে যায়।



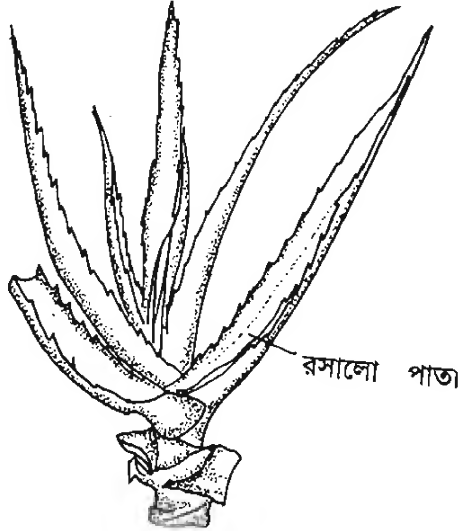
চিত্র ৮.৩ : কলসি উদ্ভিদ

ডিসকিডিয়া (Dischidia) নামক এক প্রকার পরাশ্রয়ী উদ্ভিদের পত্রফলক পানি সঞ্চয়ের জন্য কলসীতে পরিবর্তিত হয়। পর্ব থেকে উৎপন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূল এর ভেতরে প্রবেশ করে পানি শোষণ করে। আমাদের দেশের সিলেট অঞ্চলের পাহাড়ী এলাকায় এ উদ্ভিদ পাওয়া যায়।

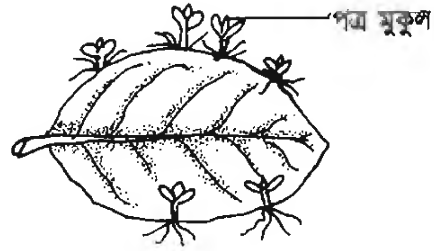


চিত্র ৮.৪ : কলসি (পরিবর্তিত পত্র ফলক)

ঘৃতকুমারী, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদির পাতা খাদ্য সঞ্চয় করে রসালো ও পুরু হয়। পাথরকুটির পাতাও খাদ্য সঞ্চয় করে পুরু ও রসালো হয়। এতে কতকগুলো মুকুল জন্মায়। মুকুলগুলো অজ্ঞাজ উপায়ে নতুন উদ্ভিদের জন্য দিয়ে বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করে।



চিত্র ৮.৫ : ঘৃতকুমারী



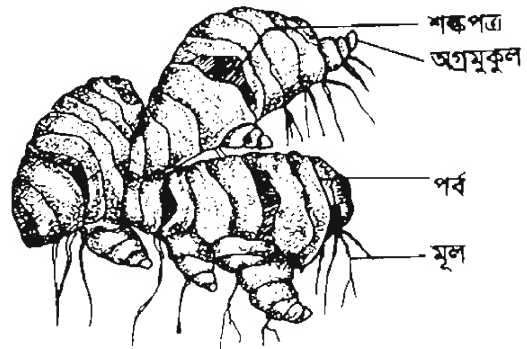
চিত্র ৮.৬ : পাথরকুটি

পরিবর্তিত কাণ্ড

ষষ্ঠ শ্রেণীতে আমরা কাণ্ড কী, কাণ্ডের বিভিন্ন অংশ, কাণ্ডের গঠন ও কাজ সম্পর্কে জেনেছি। সপ্তম শ্রেণীতে আমরা পরিবর্তিত কাণ্ড সম্পর্কে বিশদভাবে জানব। যেসব কাণ্ডের আকার আকৃতি স্বাভাবিক কাণ্ডের মত নয় তাকে পরিবর্তিত কাণ্ড বলে। যেমন : আদা, কচু, পেঁয়াজ, ওল, শতমূলী প্রভৃতি। এদেরকে আবার তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন : (ক) ভূনিম্নস্থ পরিবর্তিত কাণ্ড (খ) অর্ধবায়বীয় পরিবর্তিত কাণ্ড এবং (গ) বায়বীয় পরিবর্তিত কাণ্ড।

(ক) ভূনিম্নস্থ পরিবর্তিত কাণ্ড : সাধারণত উদ্ভিদের কাণ্ড মাটির উপরে থাকে। কিন্তু যে সমস্ত কাণ্ড মাটির নিচে থাকে এদের ভূনিম্নস্থ পরিবর্তিত কাণ্ড বলে। এদের বৈশিষ্ট্য হল : এরা বর্ণহীন বা ধূসর বর্ণের এবং মাটির নিচে থাকে বলে এদের সবুজ পাতা থাকে না। তবুও এরা মূল থেকে পৃথক কারণ এরা কাণ্ডের যে সকল শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন : পর্ব, পর্বমধ্য, শঙ্কপত্র, শীর্ষ ও কক্ষমুকুল ইত্যাদি বহন করে। প্রতিকূল পরিবেশ থেকে উদ্ভিদকে রক্ষা করা, অজ্ঞাজ জননের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করা ও উদ্ভিদের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করা এদের কাজ। এদেরকে আবার চারভাবে বিভক্ত করা যায়, যেমন : (১) রাইজোম (২) টিউবার (৩) করম ও (৪) বালু।

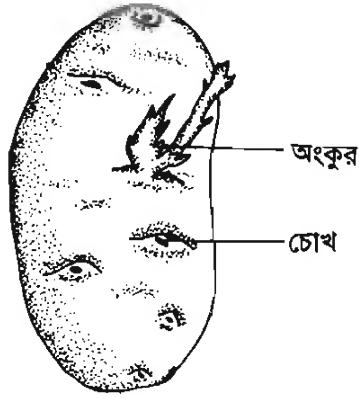
(১) রাইজোম : যে সকল পরিবর্তিত কাণ্ড মাটির নিচে সমান্তরালভাবে অবস্থান করে এবং খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য স্ফীত হয় তাদের রাইজোম বলে। এতে পর্ব, পর্বমধ্য, শঙ্কপত্র ও এর কক্ষে কক্ষমুকুল, অগ্রভাগে অগ্রমুকুল থাকে। প্রতিবছর অনুকূল পরিবেশে বায়বীয় পাতা বের হয় আবার এগুলো যখন শুকিয়ে যায় তখন কাণ্ডের গায়ে একটি দাগ রেখে যায়। রাইজোমের নিচ থেকে অস্থানিক মূল বের হয়। যেমন : আদা, হলুদ, সটি প্রভৃতি।



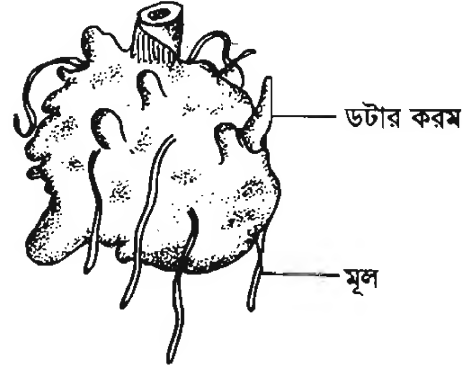
চিত্র ৮.৭ : রাইজোম (আদা)

(২) টিউবার : ভূনিম্নস্থ শাখা কাণ্ডের অগ্রভাগ যদি খাদ্য সঞ্চয়ের ফলে স্ফীত হয়ে গোলাকার বা ডিম্বাকার হয় তখন তাকে টিউবার বলে। যেমন : গোল আলু। আলুতে যে চোখ থাকে সেগুলোই মুকুল।

(৩) করম : যে সকল ভূনিম্নস্থ কাণ্ড গোলাকার গুঁড়ির মত মোটা এবং মাটির নিচে ঝাড়াভাবে অবস্থান করে তাদের করম বলে। যেমন : ওলকচু।



চিত্র ৮.৮ : টিউবার (আলু)

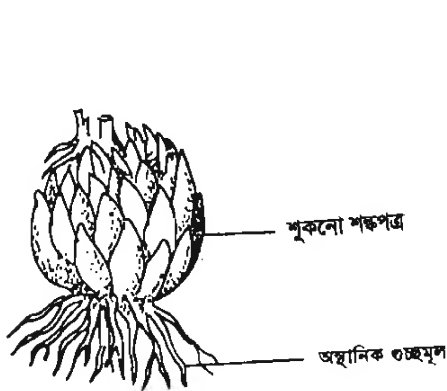


চিত্র ৮.৯ : করম (ওলকচু)

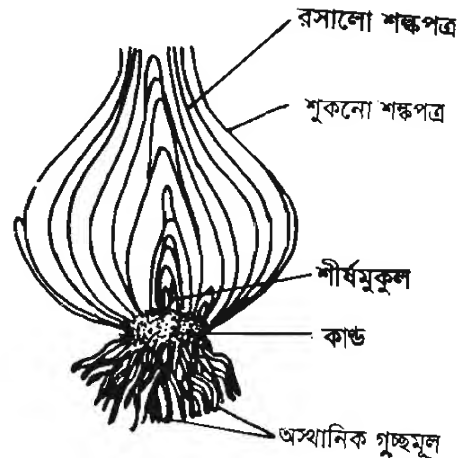
(৪) বাল্ব : যে সমস্ত ভূনিম্নস্থ পরিবর্তিত কাণ্ড অত্যন্ত ছোট, গোলাকার চাকতির মতো এদের বাল্ব বলে। যেমন : পেঁয়াজ, রসুন। পেঁয়াজ রসুনের যে অংশ থেকে অস্থানিক মূল গজায় সেটাই বাল্ব। বাল্বে পর্ব, পর্বমধ্য অত্যন্ত সংকুচিত থাকে। শঙ্কপত্র শুকনো (খোসা) এবং রসালো (যে অংশ আমরা খাই) থাকে। বাল্ব দুই রকমের হয়। যথা :

(অ) টিউনিকেটেড বাল্ব : যে বাল্বে রসালো শঙ্কপত্রগুলো একটি আর একটিকে আবৃত করে রাখে এবং বাইরের দিকের শঙ্কপত্রগুলো শুকনো হয় তাকে টিউনিকেটেড বাল্ব বলে। যেমন : পেঁয়াজ।

(আ) স্কেলি বাল্ব : যে বাল্বে রসালো শঙ্কপত্রগুলো একটি আর একটিকে আবৃত করে রাখে না তাকে স্কেলি বাল্ব বলে। যেমন : লিলি, টিউলিপ, রসুন প্রভৃতি।



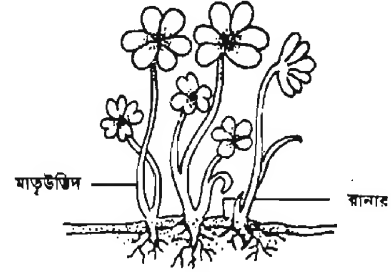
চিত্র ৮.১০ : স্কেলি বাল্ব (রসুন)



চিত্র ৮.১১ : টিউনিকেটেড বাল্ব (পেঁয়াজ)

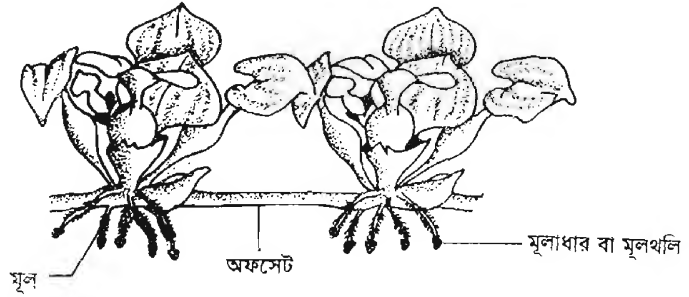
(খ) অর্ধবায়বীয় রূপান্তরিত কাড : কোন কোন উদ্ভিদের কাডের কিছু অংশ মাটিতে এবং কিছু অংশ বায়ুতে থাকে। যেমন : থানকুনি, কচু, কচুরিপানা, পুদিনা প্রভৃতি। এদের অর্ধ বায়বীয় পরিবর্তিত কাড বলে। সাধারণত এদের কাজ অঙ্গাজ উপায়ে বংশবৃদ্ধি করা। এদেরকে আবার চারভাগে ভাগ করা যায়। যেমন : (১) রানার (২) অফসেট (৩) স্টোলন ও (৪) সাকার।

(১) রানার : এসকল কাড মাটির কাছে কক্ষমুকুল থেকে উৎপন্ন হয়ে মাটিতে সমান্তরালভাবে বৃদ্ধি পায়। এদের পর্বমধ্যগুলো খুব লম্বা। এদের পর্ব থেকে নিচের দিকে অস্থানিক মূল ও উপরের দিকে মুকুল বের হয় এবং এ মুকুলটিই নতুন গাছের জন্ম দিতে পারে। এ অংশটি মাতৃগাছ থেকে আলাদা হয়ে গেলে নতুন গাছ হিসেবে বিস্তার লাভ করে। যেমন : আমরুল, থানকুনি প্রভৃতি।



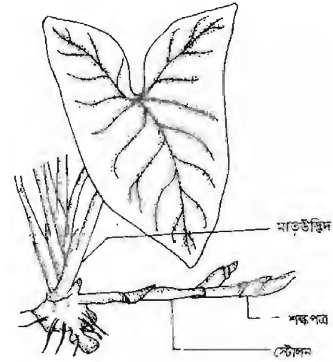
চিত্র ৮.১২ : রানার (আমরুল)

(২) অফসেট : এরা অনেকটা রানারের মতোই। তবে এদের পর্বমধ্য রানার থেকে মোটা ও খাটো। এদেরকে সাধারণত পানিতে ভাসমান উদ্ভিদে পাওয়া যায়। যেমন : কচুরি পানা, টোপাপানা প্রভৃতি।



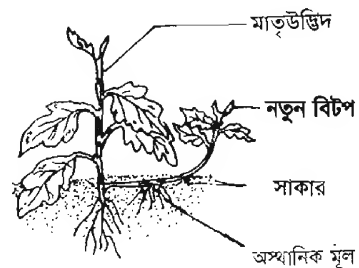
চিত্র ৮.১৩ : অফসেট (কচুরিপানা)

(৩) স্টোলন : এরা মাতৃউদ্ভিদের মাটির কাছের কক্ষমুকুল থেকে উৎপন্ন হয়ে মাটিতে সমান্তরালভাবে বৃদ্ধি পায়। এদের পর্বমধ্যগুলো ধনুকের মত বাঁকা হয়ে কিছু অংশ মাটির নিচে এবং কিছু অংশ মাটির উপরে থাকে। কিছুদূর পরপর পর্বগুলো মাটি স্পর্শ করে। যেমন : কচুর লতি।



চিত্র ৮.১৪ : স্টোলন (কচু)

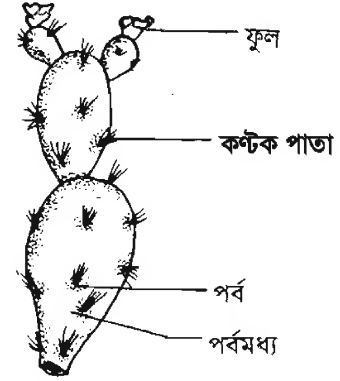
(৪) সাকার : এ জাতীয় অর্ধবায়বীয় কাড ভূনিম্নস্থ কক্ষিকমুকুল থেকে উৎপন্ন হয়ে তীর্যকভাবে বৃদ্ধি লাভ করে। এরা কিছুদূর পর মাটি ভেদ করে উপরে উঠে এসে মাটির নিচের দিকে অস্থানিক মূল ও উপরে পত্রময় কাড প্রদান করে। যেমন : পুদিনা, চন্দ্রমল্লিকা, কলা প্রভৃতি।



চিত্র ৮.১৫ : সাকার (চন্দ্র মল্লিকা)

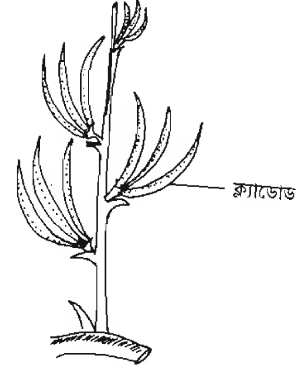
(গ) বায়বীয় পরিবর্তিত কাণ্ড : কতকগুলো গাছের কাণ্ড বা কাণ্ডের অংশ বিশেষ কোন কাজ সম্পাদনের জন্য পরিবর্তিত হয়ে এমন অবস্থায় পৌঁছায় যে এদের কাণ্ড বলে মনে হয় না। এদেরকেই বায়বীয় পরিবর্তিত কাণ্ড বলে। এদের কাজ খাদ্য প্রস্তুত, গাছকে আত্মরক্ষা ও আরোহণে সাহায্য করা এবং অভ্রাজ জননের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করা। এদেরকে আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : (১) ফাইলোক্রেড (Phylloclad) বা পর্ণকাণ্ড (২) ক্ল্যাডোড (Cladode) (৩) শাখা কণ্টক (৪) শাখাকর্ষ ও (৫) বুলবিল (Bulbil)।

(১) ফাইলোক্রেড বা পর্ণকাণ্ড : বায়বীয় কাণ্ড যখন পরিবর্তিত হয়ে পাতার মতো চ্যাপ্টা ও সবুজ হয় তখন তাকে ফাইলোক্রেড বলে। এদের পাতা কুঁড়ি অবস্থায় ঝরে যায় অথবা ছোট ছোট কাঁটায় পরিবর্তিত হয়। এতে বহু পর্ব ও পর্বমধ্য থাকে এবং কক্ষ থেকে প্রশাখা উৎপন্ন হয়। উপযুক্ত সময়ে ফাইলোক্রেড ফুল উৎপন্ন করে। যেমন : ফণিমনসা।



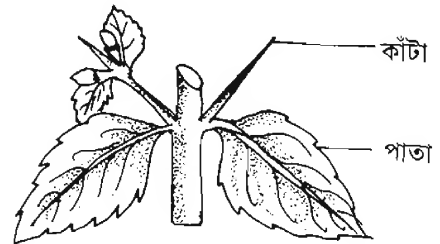
চিত্র ৮.১৬ : ফাইলোক্রেড (ফণিমনসা)

(২) ক্ল্যাডোড বা একক পর্ণকাণ্ড : যে বায়বীয় কাণ্ড পরিবর্তিত হয়ে সূচাকার পাতার মত হয় এবং কেবলমাত্র একটি পর্বমধ্য বহন করে তাকে ক্ল্যাডোড বলে। এক্ষেত্রেও পাতাগুলো কুঁড়ি অবস্থায় ঝরে যায় অথবা কণ্টকে পরিবর্তিত হয়। যেমন : শতমূলী।



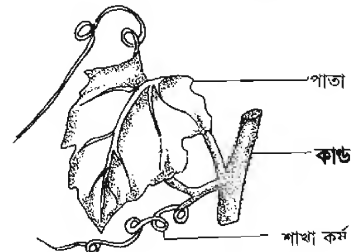
চিত্র ৮.১৭ : ক্ল্যাডোড (শতমূলী)

(৩) শাখা কণ্টক : অনেক সময় বায়বীয় কাণ্ডের কক্ষমুকুল পাতা, ফুল বা শাখা উৎপন্ন না করে শক্ত কাঁটায় পরিণত হয়। একে শাখা কণ্টক বলে। যেমন : কাঁটা মেহেদী, বেল, ময়নাকাঁটা প্রভৃতি।



চিত্র ৮.১৮ : শাখা কণ্টক (বেল গাছ)

(৪) শাখাকর্ষ : অনেক সময় দুর্বল কাণ্ডযুক্ত উদ্ভিদের কক্ষিক মুকুলগুলো পরিবর্তিত হয়ে সরু প্যাঁচানো তারের মতো হয়। এদেরকেই শাখাকর্ষ বলে। এরা গাছকে আরোহণে সাহায্য করে। যেমন : কুমড়া, ঝুমকোলতা।



চিত্র ৮.১৯ : শাখাকর্ষ (কুমড়া)

(৫) বুলবিল : কতকগুলো উদ্ভিদের কক্ষমুকুল শাখায় পরিণত না হয়ে খাদ্য সংরক্ষণ করে স্ফীত ও গোলাকার আকৃতি ধারণ করে, এদের বুলবিল বলে। এরা মাটিতে পড়লে নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। যেমন : গাছ আলু।



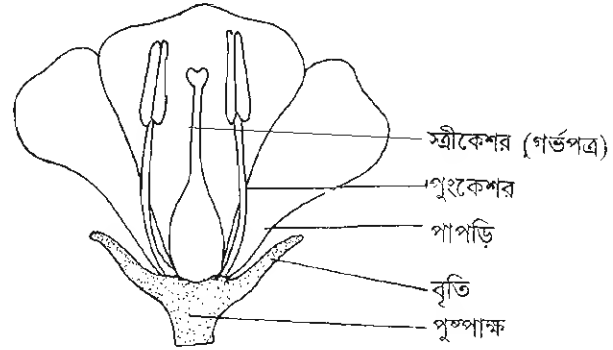
চিত্র ৮.২০ : বুলবিল (গাছ আলু)

ফুল

ফুল গাছের অঙ্গ। আমাদের চার পাশে আমরা নানারকম ফুল দেখতে পাই। এ ফুল সাধারণত উদ্ভিদের শাখা-প্রশাখার শীর্ষে ফুটে থাকতে দেখি। তাছাড়া কিছু ফুল শুধু গাছের শাখায় এবং কাঁঠালের ফুল গাছের শাখায় ও কাণ্ডে ফুটে দেখা যায়। উদ্ভিদের অন্যান্য অঙ্গের যেমন বিভিন্ন অংশ আছে তেমনি ফুলেরও বিভিন্ন অংশ আছে। একটি ফুল মনোযোগ সহকারে লক্ষ করলে বিভিন্ন অংশ দেখতে পাব। যেমন : বৃন্ত, বৃতি, দল, পুং ও স্ত্রী স্তবক ইত্যাদি। এ আলোচনা থেকে আমরা জানলাম : উদ্ভিদের যে অংশ বৃতি, দল, পুংকেশর ও গর্ভকেশর নিয়ে গঠিত তাকে ফুল বা পুষ্প বলে। এবার আমরা একটি ফুলের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে বিশদভাবে জানার চেষ্টা করি।

একটি সম্পূর্ণ ফুলের বিভিন্ন অংশ

যে ফুলে বৃতি, দল, পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক থাকে তাকে সম্পূর্ণ ফুল বলে। যথা : জবা, ধুতুরা, টগর ইত্যাদি ফুল। একটি সম্পূর্ণ ফুলের পাঁচটি অংশ থাকে। যেমন : (১) পুষ্পাঙ্ক, (২) বৃতি, (৩) দল, (৪) পুংস্তবক এবং (৫) স্ত্রীস্তবক।



চিত্র ৮.২১ : একটি সম্পূর্ণ ফুলের বিভিন্ন অংশ (লম্বচ্ছেদ)

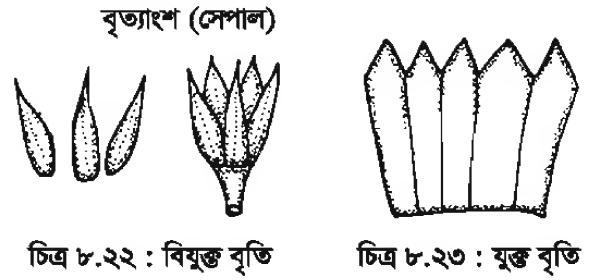
(১) পুষ্পাঙ্ক : ফুলের যে অঙ্গের উপর বৃতি, দল, পুংস্তবক এবং স্ত্রীস্তবক বিন্যস্ত থাকে তাকে পুষ্পাঙ্ক বলে। পুষ্পাঙ্কের সাধারণত দুইটি অংশ থাকে। যেমন : (ক) পুষ্পবৃত্ত এবং (খ) পুষ্প পত্রাধার।

(ক) পুষ্পবৃত্ত : পুষ্পাঙ্কের নিচের সরু দড়ের ন্যায় অংশকে পুষ্পবৃত্ত বা ফুলের বোঁটা বলে। ফুলে বোঁটা বা বৃত্ত থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে। যখন ফুলের বৃত্ত থাকে তখন সে ফুলকে সর্বস্তবক ফুল বলে। যেমন : জবা। আবার বৃত্তহীন ফুলকে অবৃত্তক ফুল বলে। যেমন : রজনীগন্ধা।

(খ) পুষ্প পত্রাধার : পুষ্পবৃত্তের উপরের প্রশস্ত অংশ বৃতি, দল, পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক যেখানে সাজানো থাকে তাকে পুষ্প পত্রাধার বা থ্যালামাস বলে। বৃতি, দল পুং ও স্ত্রীস্তবকের সদস্যগুলোকে পুষ্পপত্র বলা হয়। তাই পুষ্পাঙ্কের প্রশস্ত অংশকে পুষ্প পত্রাধার বলে।

পুষ্পাঙ্কের কাজ : পুষ্পকে কাণ্ডের সাথে যুক্ত রাখা, পুষ্পের স্তবকগুলোকে ধারণ করা এবং স্তবক ও কাণ্ডের মধ্যে খাদ্য আদান প্রদান করা।

(২) বৃতি : ফুলের সবচেয়ে বাইরের স্তবকটিকে বৃতি বলে। বৃতি সাধারণত সবুজ বর্ণের কতকগুলো ছোট ছোট অংশে বিভক্ত। প্রতিটি ছোট অংশকে বৃত্যংশ বা সেপাল (Sepal) বলে। তবে কোন কোন ফুলের বৃতি অন্য রঙের হয়ে থাকে। যেমন : মুসেভা। বৃত্যংশগুলো পরস্পর সংযুক্ত অথবা মুক্ত থাকতে পারে। সংযুক্ত বৃত্যংশকে যুক্তবৃতি (Gamosepalous) (যেমন : ধুতুরা) এবং মুক্ত বৃত্যংশকে বিযুক্তবৃতি (Polysepalous) (যেমন : সরিষা) বলে। কোন কোন বৃতির নিচে সবুজ বর্ণের আর একটি বৃতির মত অতিরিক্ত স্তবক থাকে তাকে উপবৃতি বলে। জবা ফুলে উপবৃতি আছে।



চিত্র ৮.২২ : বিযুক্ত বৃতি

চিত্র ৮.২৩ : যুক্ত বৃতি

বৃতির কাজ : ঝড়, বৃষ্টি, রোগ, তাপ প্রভৃতি থেকে ফুলের কুঁড়িকে রক্ষা করে, সবুজ রঙের বৃতি পাতার মতো খাদ্য তৈরি করতে পারে, স্থায়ী বৃতি ফুলকে রক্ষা করে এবং রঙিন বৃতি পরাগায়ণে সাহায্য করে।

(৩) দল : বৃতির পরে ফুলের যে স্তবক দেখা যায় তাকে দল বলে। দলের প্রতিটি অংশকে পাপড়ি বলা হয়। সবগুলো পাপড়িকে একত্রে দল বলে। ফুলের পাপড়িগুলো পরস্পর পৃথক কিংবা যুক্ত থাকতে পারে। যেমন : কুমড়া ও ধুতুরার পাপড়ি যুক্ত থাকে এবং মূলা ও সরিষার পাপড়ি পৃথক। পাপড়ি সাদা, হলুদ, লাল, নীল এবং অন্যান্য রঙের হয়। দল সাধারণত উজ্জ্বল ও সুগন্ধযুক্ত হয়। কখনও কখনও দল সবুজ হতে পারে।

দলের কাজ : দল ফুলের পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবকগুলোকে রক্ষা করে। দলের উজ্জ্বল বর্ণ ও সুগন্ধ কীট পতঙ্গকে আকর্ষিত করে এবং তার ফলে পরাগসংযোগ ঘটে।



চিত্র ৮.২৪ : যুক্ত দল

চিত্র ৮.২৫ : দল

চিত্র ৮.২৬ : বিযুক্ত দল

(৪) পুংস্তবক : দলমন্ডলের ভেতরের দিকে যে স্তবক থাকে তাকে পুংস্তবক বলে। পুংস্তবকের প্রতি অংশকে পুংকেশর বলে। পুংকেশর তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা : (ক) পুংদণ্ড (খ) পরাগধানী ও (গ) যোজনী।

(ক) পুংদণ্ড : পুংকেশরের সরু, লম্বা ও শলাকার অংশকে পুংদণ্ড বলে।



চিত্র ৮.২৭ : পুংকেশর

(খ) পরাগধানী : পুংদন্ডের মাথায় স্ফীত অংশকে পরাগধানী বলে। এ পরাগধানীর ভেতরে অসংখ্য পরাগ রেণু উৎপন্ন হয়। সাধারণত পরাগধানী লম্বালম্বিভাবে দুইটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। প্রতিটি প্রকোষ্ঠকে পরাগখলি বলে। জ্বাতে পরাগধানী এক প্রকোষ্ঠ। পুংকেশর ফুলের পুংজনন অঙ্গ। পুংকেশরের পরাগখলিতে যে পরাগরেণু উৎপন্ন হয় তা পরাগায়ণের মাধ্যমে জনন কাজে অংশগ্রহণ করে।

(গ) যোজনী : পুংদন্ডের যে অংশ পরাগধানীর সাথে সংযুক্ত থাকে তাকে যোজনী বলে।

পুংস্তবকের কাজ : পরাগরেণু সৃষ্টি করাই পুংস্তবকের প্রধান কাজ।

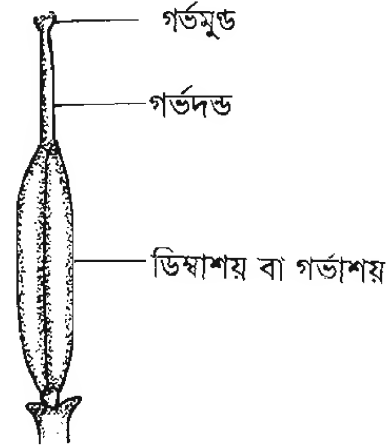
(৫) স্ত্রীস্তবক : ফুলের সবচেয়ে ভেতরের স্তবকের নাম স্ত্রীস্তবক। স্ত্রীস্তবক এক বা একাধিক গর্ভপত্র বা গর্ভকেশর দিয়ে গঠিত। প্রতিটি গর্ভপত্রের তিনটি অংশ থাকে। যথা (ক) ডিম্বাশয় বা গর্ভাশয়, (খ) গর্ভদণ্ড ও (গ) গর্ভমুণ্ড।

(ক) ডিম্বাশয় বা গর্ভাশয় : পুষ্পাঙ্কের উপরের স্ফীত অংশ হল ডিম্বাশয় বা গর্ভাশয়। এ গর্ভাশয়ের ভেতরে ডিম্বক থাকে আর ডিম্বকের ভিতরে ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়।

(খ) গর্ভদণ্ড : গর্ভাশয়ের উপরে সরু নলের মতো অংশকে গর্ভদণ্ড বলে।

(গ) গর্ভমুণ্ড : গর্ভদণ্ডের মাথায় স্ফীত অংশকে গর্ভমুণ্ড বলে।

স্ত্রীস্তবকের কাজ : প্রতিটি ডিম্বকের মধ্যে স্ত্রীজনন কোষ উৎপন্ন করাই স্ত্রীস্তবকের প্রধান কাজ। নিষেকের পর গর্ভাশয় ফলে এবং ডিম্বক বীজে পরিণত হয়।



চিত্র ৮.২৮ : স্ত্রীস্তবক

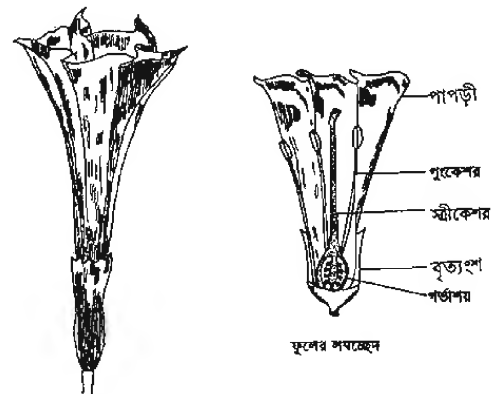
ফুলের শ্রেণী বিভাগ

ফুলের গঠনের তারতম্যের ওপর ভিত্তি করে ফুলকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। তারমধ্যে দুইটি শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

(১) সমপূর্ণ ও অসমপূর্ণ ফুল

(ক) সমপূর্ণ ফুল : যে ফুলে বৃতি, দল, পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক এ চারটি স্তবক থাকে তাকে সমপূর্ণ ফুল বলে। যেমন : বকফুল, ধুতুরা, নয়নতারা, গোলাপ, সরিষা ইত্যাদি।

(খ) অসমপূর্ণ ফুল : যে ফুলে চারটি স্তবকের মধ্যে এক বা একাধিক স্তবক থাকে না, সে ফুলকে অসমপূর্ণ ফুল বলে। যথা : লাউ, কুমড়া, লালপাতা ইত্যাদি অসমপূর্ণ ফুল।



চিত্র ৮.২৯ : সমপূর্ণ ফুল (ধুতুরা)

(২) একলিঙ্গ ও উভলিঙ্গ ফুল

(ক) একলিঙ্গ ফুল : পুরুষ বা স্ত্রী যে কোন একটি স্তবকযুক্ত ফুলকে একলিঙ্গ ফুল বলে। যথা : কুমড়া ও লাউ ফুল। একলিঙ্গ

ফুল দুই প্রকার। যথা :

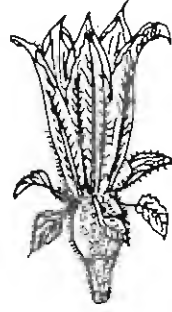
(১) পুরুষ ফুল : যে একলিঙ্গা ফুলে শুধু পুংস্তবক থাকে তাকে পুরুষ ফুল বলে।



পুংফুল



দল অপসারণ করে পুংকেশর
দেখানো হয়েছে



স্ত্রীফুল



দল অপসারণ করে গর্ভাশয়সহ
স্ত্রীস্তবক দেখানো হয়েছে

চিত্র ৮.৩০ : অসম্পূর্ণ ও একলিঙ্গিক ফুল (কুমড়া)

(২) স্ত্রী ফুল : যে একলিঙ্গা ফুলে শুধু স্ত্রীস্তবক থাকে তাকে স্ত্রী ফুল বলে। সব একলিঙ্গা ফুলই অসম্পূর্ণ ফুল।

(খ) উভলিঙ্গা ফুল : একই ফুলে যদি পুংকেশর এবং স্ত্রীকেশর বর্তমান থাকে তাকে উভলিঙ্গা ফুল বলে। যথা : গোলাপ, জবা, ধূতুরা ইত্যাদি।

পুষ্পমঞ্জরি

জবা, চম্পা, গোলাপ, ধূতুরা প্রভৃতি উদ্ভিদের পাতার কক্ষে একটি করে ফুল পৃথকভাবে জন্মে। গাঁদা, সূর্যমুখী, কলা, সরিষা প্রভৃতি একাধিক ফুল এক সাথে জন্মে থাকে, এগুলো কিন্তু একটি ফুল নয় বরং প্রত্যেকটি কতকগুলো ফুলের সমষ্টি। এরূপ ফুলের গুচ্ছকে বলা হয় পুষ্পমঞ্জরি। আর যেভাবে মঞ্জরিতে ফুল বা পুষ্প সাজানো থাকে তাকে পুষ্প বিন্যাস বলে।

পুষ্প বিন্যাসের প্রকারভেদ

মঞ্জরি দড়ি কান্ড বা শাখার কোথায় অবস্থিত তার ওপর ভিত্তি করে পুষ্পমঞ্জরির বিন্যাসকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ হয়েছে। যেমন : (১) শীর্ষক পুষ্প বিন্যাস এবং (২) কান্ডিক পুষ্প বিন্যাস।

(১) শীর্ষক পুষ্প বিন্যাস

যে পুষ্পমঞ্জরি কান্ড বা তার শাখার শীর্ষ মুকুল হতে উৎপন্ন হয় তাকে শীর্ষক পুষ্পবিন্যাস বলে। যথা : সরিষা।

(২) কান্ডিক পুষ্প বিন্যাস

যে পুষ্পমঞ্জরি পত্র কক্ষের মুকুল হতে উৎপন্ন হয় তাকে কান্ডিক পুষ্প বিন্যাস বলে। যথা : নারিকেল, তাল ইত্যাদি। তাছাড়া পুষ্পমঞ্জরির মঞ্জরিদণ্ডের অগ্র মুকুলের বৃন্দ্রি, পুষ্প ধারণের প্রকৃতি অনুসারে পুষ্পবিন্যাস প্রধানত দুই প্রকার। যথা

(ক) অনিয়ত বা রেসিমোস পুষ্প বিন্যাস ও

(খ) নিয়ত বা সাইমোস পুষ্প বিন্যাস।

এ শ্রেণীবিভাগ উদ্ভিদ বিজ্ঞানের জনক গ্রীক বিজ্ঞানী থিওফ্রাস্টাস শ্রিস্টের জন্মের কয়েকশত বছর আগেই করেছিলেন।

(ক) অনিয়ত বা রেসিমোস পুষ্প বিন্যাস : যে পুষ্প বিন্যাসের পুষ্পগুলো অগ্রাউনুখভাবে অথবা অভিকেন্দ্রিকভাবে বিকশিত হয় তাকে অনিয়ত পুষ্প বিন্যাস বলে। যথা : সরিষা, আম, আপাং, কচু, ধান, কলা ইত্যাদি।

বৈশিষ্ট্য

(ক) মঞ্জরি দণ্ডে পুষ্পগুলো গোড়ার দিক থেকে আগার দিকে পর্যায়ক্রমে বিকশিত হয়। একে অগ্র উন্মুখ পুষ্পবিকাশ বলে।

(খ) পুষ্পাধারে পুষ্পগুলো পরিধির দিক থেকে কেন্দ্রের দিকে পর্যায়ক্রমে বিকশিত হয়। একে অভিকেন্দ্রিক পুষ্প বিকাশ বলে।

(গ) এ পুষ্প বিন্যাসে সর্বকনিষ্ঠ পুষ্পটি মঞ্জরি দণ্ডের শীর্ষে অথবা পুষ্পাধারের কেন্দ্রে থাকে।

(ঘ) মঞ্জরিদণ্ডের বৃদ্ধি সীমাবদ্ধ নয়।

(২) নিয়ত পুষ্পবিন্যাস : যে পুষ্পবিন্যাসের পুষ্পগুলি নিম্ন উন্মুখভাবে অথবা অপকেন্দ্রিকভাবে বিকশিত হয় তাকে নিয়ত পুষ্প বিন্যাস বলে। যথা : হাতি শূঁড়, শেফালী, ভাঁট, বেগুনী, আকন্দ প্রভৃতি।

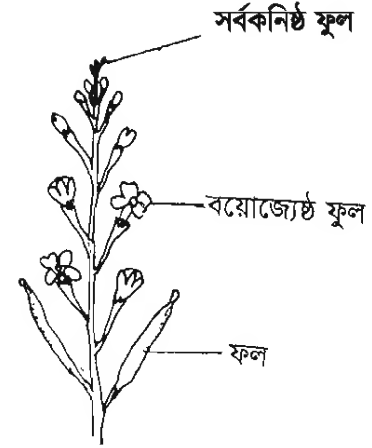
বৈশিষ্ট্য

(ক) মঞ্জরিদণ্ডে পুষ্পগুলো আগার দিক থেকে গোড়ার দিকে পর্যায়ক্রমে বিকশিত হয়। একে নিম্ন উন্মুখ পুষ্প বিকাশ বলে।

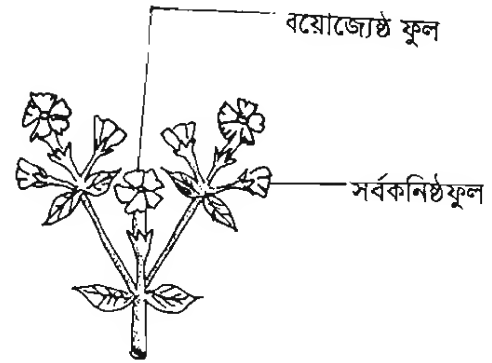
(খ) পুষ্পাধারে পুষ্পগুলো কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে পর্যায়ক্রমে বিকশিত হয়। একে অপকেন্দ্রিক পুষ্প বিকাশ বলে।

(গ) এ পুষ্পবিন্যাসে সর্বকনিষ্ঠ পুষ্পটি মঞ্জরিদণ্ডের গোড়ায় অথবা পুষ্পাধারের পরিধির দিকে থাকে।

(ঘ) মঞ্জরিদণ্ডের বৃদ্ধি সীমিত।



চিত্র ৮.৩১ : অনিয়ত পুষ্প বিন্যাস



চিত্র ৮.৩২ : নিয়ত পুষ্প বিন্যাস

অনিয়ত ও নিয়ত পুষ্প বিন্যাসের মধ্যে পার্থক্য

অনিয়ত	নিয়ত
১। শীর্ষে সর্ব কনিষ্ঠ পুষ্প অবস্থিত।	১। শীর্ষে বয়োজ্যেষ্ঠ পুষ্প অবস্থিত।
২। মঞ্জরি দণ্ডের বৃদ্ধি সীমিত নয়।	২। মঞ্জরি দণ্ডের বৃদ্ধি সীমিত।
৩। মঞ্জরি দণ্ডের গোড়ার দিক থেকে আগার দিকে অথবা পুষ্পাধারের পরিধি থেকে কেন্দ্রের দিকে পর্যায়ক্রমে পুষ্প বিকশিত হয়।	৩। মঞ্জরি দণ্ডের শীর্ষ হতে গোড়ার দিকে অথবা পুষ্পাধারের কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে পর্যায়ক্রমে পুষ্প বিকশিত হয়।

পরাগায়ণ

তোমরা হয়তো লক্ষ করে থাকবে যেখানে ফুল ফোটে সেখানেই নানা রকম প্রজাপতি, মৌমাছি ও কীট-পতঙ্গ ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়। এসব কীট-পতঙ্গ ফুলের গন্ধে ও রঙে আকৃষ্ট হয় এবং ফুল থেকে এরা মধু সংগ্রহ করে থাকে। এ সব প্রজাপতি, মৌমাছি, ফুলে ফুলে বেড়াবার সময় ফুলের পরাগধানী থেকে পরাগরেণু অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তর করে। পরাগধানী থেকে গর্ভমুণ্ডে পরাগের এ স্থানান্তরকে পরাগায়ণ বলে।

পুষ্পের পরাগধানী থেকে পরিপক্ব পরাগরেণু একই পুষ্পের অথবা একই গাছের অন্য পুষ্পের কিংবা একই জাতীয় অন্য উদ্ভিদের পুষ্পের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তর হওয়াকে পরাগায়ণ বলে।

পরাগায়ণের শ্রেণী বিভাগ

পরাগায়ণ সাধারণত দুই প্রকার : যেমন (ক) স্ব পরাগায়ণ ও (খ) পর পরাগায়ণ।

স্ব-পরাগায়ণ : একটি ফুলের পরাগরেণু যখন সেই ফুলের গর্ভমুণ্ডে অথবা সেই গাছের অন্য একটি ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তর হয়ে পরাগ সংযোগ ঘটায় তখন তাকে স্ব পরাগায়ণ বলে। যথা : তুলা, কানশিরা, টমেটো প্রভৃতি।

পর-পরাগায়ণ : এক ফুলের পরাগরেণু যখন একই জাতীয় অন্য একটি গাছের ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হয়ে পরাগ সংযোগ ঘটায় তখন তাকে পর পরাগায়ণ বলে। যথা : ধান, শিমুল ইত্যাদি।

পর-পরাগায়ণের মাধ্যম

পরাগধানী থেকে পরাগরেণু গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরের জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। পর পরাগায়ণ সাধারণত বায়ু, কীট পতঙ্গ, প্রাণী ও পানির মাধ্যমে ঘটে থাকে এবং মাধ্যমের নাম অনুসারে পর পরাগায়ণ পদ্ধতির নামকরণ করা হয়। যেমন :

(১) বায়ু পরাগায়ণ : যেসব ফুলের পরাগায়ণ বায়ুর মাধ্যমে সংঘটিত হয় সেগুলোকে বায়ুপরাগী ফুল বলে। আর এ পরাগায়ণ পদ্ধতিকে বায়ু পরাগায়ণ বলে। যথা : ধান, গম, ইক্ষু, ভুট্টা ইত্যাদি।

(২) পতঙ্গ পরাগায়ণ : যে সকল ফুলের পরাগায়ণ পতঙ্গের মাধ্যমে সংঘটিত হয় সে সব ফুলকে পতঙ্গ পরাগী ফুল এবং পরাগায়ণ পদ্ধতিকে পতঙ্গ পরাগায়ণ বলে। যথা : সূর্যমুখী, জুঁই, গোলাপ, সরিষা, পদ্ম, শালুক প্রভৃতি। ফুলের বর্ণ, গন্ধ ও মধুর লোভে পতঙ্গ যখন ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ায় তখন পরাগরেণু পতঙ্গের মাধ্যমে এক ফুল থেকে অন্য ফুলে স্থানান্তরিত হয়।



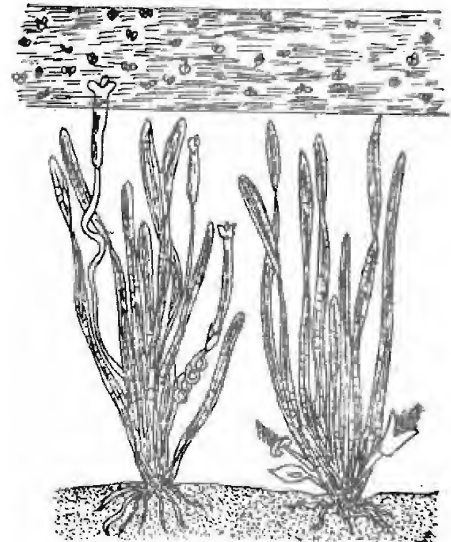
চিত্র ৮.৩৩ : পতঙ্গ পরাগায়ণ

(৩) প্রাণী পরাগায়ণ : যে সকল ফুলের পরাগায়ণ পশু পাখির (কাঠ বিড়াল, বাদুর, পাখি) মাধ্যমে সংঘটিত হয় সে সকল ফুলকে প্রাণিপরাগী ফুল এবং পরাগায়ণ পদ্ধতিকে প্রাণিপরাগায়ণ বলে। যথা : কদম, কলা, কচু, শিমুল, পলাশ প্রভৃতি।

(৪) পানি পরাগায়ণ : যে সব ফুলের পরাগায়ণ পানির মাধ্যমে ঘটে সে সব ফুলকে পানিপরাগী ফুল এবং পরাগায়ণ পদ্ধতিকে পানি পরাগায়ণ বলে। যথা : পাতা, শ্যাওলা, কাঁটা শেওলা প্রভৃতি।

নিষিক্তকরণ

আমরা এ অধ্যায়ে ফুলের বিভিন্ন অংশ যেমন পুংকেশর, স্ত্রীকেশর, গর্ভাশয়, ডিম্বক, গর্ভদণ্ড, গর্ভমুণ্ড, পরাগ, পরাগধানী ইত্যাদি সম্বন্ধে জেনেছি। আমরা আরও জেনেছি যে, গর্ভাশয়ের ডিম্বকে স্ত্রীজনন কোষ ও পরাগে পুংজনন কোষ থাকে। পরাগরেণু গর্ভমুণ্ডে পতিত হলে এর আবরণ ফেটে পরাগনালিকা বের হয়। এ পরাগনালিকা গর্ভদণ্ড ভেদ করে ডিম্বকে প্রবেশ করে। তখন পরাগের পুংজনন কোষ এবং ডিম্বকের ভেতরে স্ত্রীজনন কোষ একত্রে মিলিত হয়। এ মিলনকে গর্ভাধান বা নিষিক্তকরণ বলে।



চিত্র ৮.৩৪ : পানি পরাগায়ণ

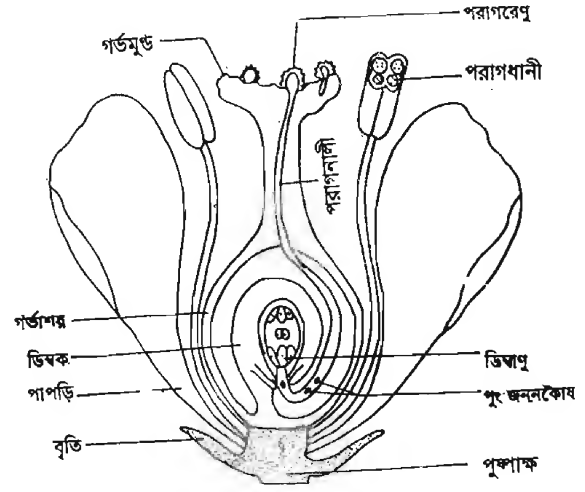
অর্থাৎ আকার, আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য মডিত একটি পুংজনন কোষ এবং একটি স্ত্রীজনন কোষের মিলন প্রক্রিয়াকে নিষিক্তকরণ বলে।

নিষিক্তকরণের গুরুত্ব

নিষিক্তকরণের ফলে ডিম্বক বীজে এবং গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয়। বীজ উদ্ভিদের বংশ রক্ষা করে। উদ্ভিদের ফল ও বীজ খেয়ে পশু, পাখি ও মানুষ বেঁচে থাকে। আমরা আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, ধান, গম, ভুট্টা, ইক্ষু ইত্যাদি খেয়ে থাকি। এ সবই নিষিক্তকরণের ফলে সৃষ্টি। অতএব নিষিক্তকরণের গুরুত্ব অপরিসীম।

ফলের উৎপত্তি

ফুল থেকে ফল হয়। ফুলের সব অংশ থেকে কি ফল হয়? ফুলের সব অংশ থেকে ফল হয় না, কিন্তু কিছু কিছু অংশ থেকে ফল গঠিত হয়। ফুলের স্ত্রীস্তবকের ডিম্বাশয় বা গর্ভাশয় রূপান্তরিত হয়ে ফলে পরিণত হয়। আর ডিম্বাশয়ের এ রূপান্তর কিছু আপনা আপনি ঘটে না। নিষেক বা গর্ভধান প্রক্রিয়ায় এ রূপান্তর ঘটে থাকে।

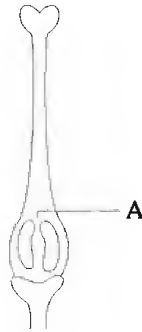


চিত্র ৮.৩৫ : নিষিক্তকরণ

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- জুঁই একটি
 - ক. পতঙ্গ পরাগী ফুল
 - খ. পানি পরাগী ফুল
 - গ. প্রাণী পরাগী ফুল
 - ঘ. বায়ু পরাগী ফুল
- সম্পূর্ণ ফুলে কয়টি স্তবক থাকে
 - ক. ২টি
 - খ. ৩টি
 - গ. ৪টি
 - ঘ. ৫টি
- নিচের কোন উদ্ভিদের পাতা একবছর পর পর ঝরে যায়।
 - ক. দেবদারু
 - খ. খেজুর
 - গ. শাল
 - ঘ. আম
-



উপরের চিত্রের A চিহ্নিত অংশটির কাজ কী ?

- পরাগ রেণু ধারণ করা
- কীট পতঙ্গকে আকৃষ্ট করা
- ফলে পরিণত করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i
- খ. ii
- গ. iii
- ঘ. i ও iii

৫. নিচের কোন সেটটিকে ভূনিম্নস্থ রূপান্তরিত কাণ্ড বলা হয়।

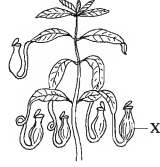
ক. আদা, আলু, পেঁয়াজ, রসুন

খ. ওলকচু, আমরুল, কচু, ফণিমনসা

গ. পাথরকুচি, যতকুমারী, আলু, আদা।

ঘ. লিলি টিউলিপ, আদা, কচু।

নিচের চিত্রের সাহায্যে ৬ ও ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :



উপরের চিত্রের অংশটি গাছের

ক. কাণ্ড

খ. থলি

গ. পত্র ফলক

ঘ. ফুল

৭. X অংশটির মাধ্যমে গাছ

i. পতঙ্গ ধরে ফেলে

ii. আমিষ জাতীয় খাদ্য সংগ্রহ করে

iii. পানি সংগ্রহ করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. ii ও iii

৮. কোনটি বৃতির প্রধান কাজ

ক. খাদ্য আদান-প্রদান করা

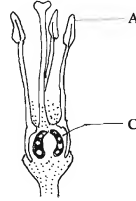
খ. কুঁড়িকে রক্ষা করা

গ. কীট পতঙ্গকে আকৃষ্ট করা

ঘ. পরাগরেণু সংগ্রহ করা।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.



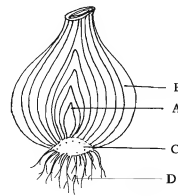
ক. সম্পূর্ণ ফুলের কয়টি স্তবক ?

খ. A চিহ্নিত অংশটির কাজ বর্ণনা কর ?

গ. উপরের অসম্পূর্ণ চিত্রটিকে সম্পূর্ণ কর এবং বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

ঘ. C চিহ্নিত অংশটির গুরুত্ব আলোচনা কর।

২.



ক. রূপান্তরিত কাণ্ড কী ?

খ. চিত্রের A এর কাজ কী ?

গ. একটি আদার ছবি এঁকে চিত্রের B এবং D চিহ্নিত অংশগুলোর সাথে তুলনা কর

ঘ. চিত্রের কোন অংশটির জন্য চিত্রটি পরিবর্তিত কাণ্ড তা ব্যাখ্যা কর।

নবম অধ্যায়

অণুজীব জগৎ

অণুজীব

অণুজীব বা জীবাণু বলতে সূক্ষ্মজীব বোঝায়। মাটি, পানি, বায়ু এবং পরিবেশে এমন অনেক জীব রয়েছে যেগুলো খালি চোখে দেখা যায় না। কেবলমাত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এদের অস্তিত্ব বোঝা যায়। এ সব জীবকেই অণুজীব বলা হয়। রিকিটসিয়া, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, প্রোটোজোয়া ইত্যাদি অণুজীবের অন্তর্ভুক্ত। এদের বেশির ভাগই পরজীবী এবং পোষক দেহে রোগ সৃষ্টি করে। ভাইরাসও এক বিশেষ ধরনের পরজীবী অণুজীব।

ভাইরাস

ভাইরাস জীব ও জড়ের মাঝামাঝি এক ধরনের অণুজীব। এদের আকার অতি ক্ষুদ্র, ১২-৪০০ ন্যানোমিটার। (এক ন্যানোমিটার এক মিলিমিটারের ১০ লক্ষ ভাগের একভাগের সমান)। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্য ছাড়া ভাইরাস দেখা যায় না। এরা কখনও স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারে না। কোন একটি পোষকদেহে পরজীবী হিসেবে বাস করে।

ভাইরাসের দেহে কোষঝিল্লি, কোষ প্রাচীর, সুগঠিত নিউক্লিয়াস, সাইটোপ্লাজম ও বিভিন্ন কোষ অঙ্গাণু থাকে না। অর্থাৎ প্রোটিনে মোড়া একটি পুঁটলিতে নিউক্লিয়িক এসিড, ডি এন এ অথবা আর এন এ (DNA বা RNA) থাকে। কোনো কোনো ভাইরাসে এ পুঁটলি থেকে লেজের মতো একটা অঙ্গ বের হয়ে থাকে। তখন ভাইরাসটিকে T এর মতো দেখায়। যেমন T_2 বা T_4 ফায় ভাইরাস। লেজ থেকে আবার কতগুলো সুতার মতো তন্তু ছড়িয়ে থাকে।

জীবিত পোষক দেহের বাইরে ভাইরাসে জীবনের কোন লক্ষণ, যেমন শ্বসন, খাদ্য গ্রহণ, বিপাক, বংশবৃদ্ধি ইত্যাদি দেখা যায় না। এমনকি পোষক দেহের বাইরে ভাইরাসকে স্ফটিকের মতো কেলাসে রূপান্তরিত করা যায় এবং এ অবস্থায় এরা বহুদিন থাকতে পারে। এরপর এরা যদি পোষক দেহে প্রবেশ করতে পারে তখন এরা সজীব অণুজীবদের মতো দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে।

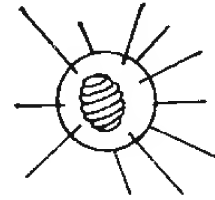
জীবের সাধারণ লক্ষণগুলোর অনুপস্থিতি এবং কেলাসে রূপান্তরিত হতে পারার জন্য এদের জড় পদার্থ বলে মনে হয়। আবার পোষকদেহে বংশবৃদ্ধি করতে পারা এবং DNA/RNA র উপস্থিতির জন্য এদের জীব বলে মনে হয়। জীব ও জড় উভয়েরই গুণ থাকায় ভাইরাসদের জীব ও জড়ের মধ্যবর্তী সংগঠন বলে মনে করা হয়। অতিক্ষুদ্র এবং জীবের মতো কিছু আচরণের জন্য এদের অণুজীব হিসেবে ধরা হয়।



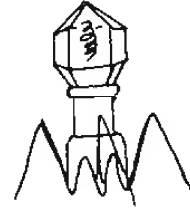
টোবাকো মোজাইক ভাইরাস



পোলিও মাইনিটিস ভাইরাস



ইনফ্লুয়েন্জা ভাইরাস



T_2 ব্যাকটেরিওফায়

চিত্র ৯.১ : বিভিন্ন প্রকার ভাইরাস

ভাইরাসের অপকারিতা

ভাইরাস প্রধানত রোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের ক্ষতি করে। যথা

(ক) উদ্ভিদের রোগ : তামাক, শিম, পেঁপে ইত্যাদি উদ্ভিদের মোজাইক রোগ ভাইরাস দিয়ে সংগঠিত হয়।

(খ) মানুষের রোগ : বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ মারাত্মক ব্যাধি এইডস HIV নামক ভাইরাসের আক্রমণে হয়। এছাড়া অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি যেমন গুটি বসন্ত, হাম, পোলিও, ইনফ্লুয়েঞ্জা, মাম্পস, হার্পিস, হেপাটাইটিস ইত্যাদি রোগের কারণও বিভিন্ন ভাইরাস।

(গ) পশু-পাখির রোগ : কুকুর ও বিড়ালের জলাতজ্ব, গরু মহিষের পা ও মুখের ক্ষত রোগ, মুরগির রাণীক্ষেত ইত্যাদি রোগ ভাইরাস দিয়ে সংগঠিত হয়।

(ঘ) কোন কোন ভাইরাস কিছু উপকারী ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করেও আমাদের ক্ষতি করে।

রিকেটসিয়া

রিকেটসিয়া দেখতে কাঠি অথবা ডিমের মত। এরা দৈর্ঘ্যে ৩৫০ এবং প্রস্থে ২৫ ন্যানোমিটার পর্যন্ত হয়। আলোক মাইক্রোস্কোপে অতি কষ্টে এদের দেখা যায়। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে এদের ভেতরের অংশ প্রায় ব্যাকটেরিয়াদের মতোই দেখায়। কিন্তু এরা আকারে অনেক ছোট। এদের একটি প্রজাতি ছাড়া অন্যান্য সব প্রজাতি ভাইরাসের মত সজীব পোষক দেহের বাইরে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করে না। এদের ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার মধ্যবর্তী এক প্রকার অণুজীব বলে মনে করা হয়।

পতঙ্গ, মাকড় ইত্যাদি আর্থোপড জাতীয় প্রাণীদের পরিপাক নালিতে অনেক ধরনের রিকেটসিয়া বাস করে। এদের কয়েকটি প্রজাতির সংক্রমণে মানুষের রোগ হয়। তার মধ্যে শীত প্রধান দেশে উকুন বাহিত টাইফাস জ্বর বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ব্যাকটেরিয়া

ব্যাকটেরিয়া এক প্রকার অণুজীব। এরা ভাইরাস এবং রিকেটসিয়া থেকে আকারে বড়, তবুও খালি চোখে এদের দেখা যায় না। মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে এদের দেখা যায়। ব্যাকটেরিয়া আকারে ১-৫ মাইক্রন পর্যন্ত হয়। (এক মাইক্রন এক মিলিমিটারের এক হাজার ভাগের এক ভাগের সমান।)

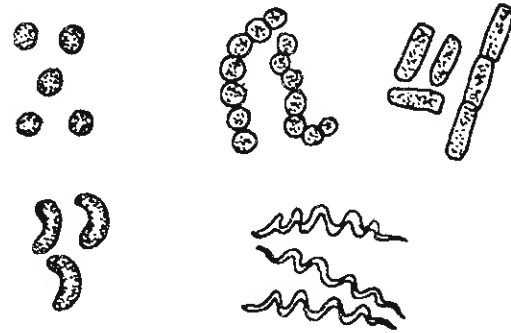
ব্যাকটেরিয়ার দেহ মাত্র একটি কোষ দিয়ে গঠিত। কিন্তু কোষটি সাধারণ উদ্ভিদ বা প্রাণী কোষের মত নয়। এদের কোষ প্রোটোসেল (PROTOCELL) বা আদিকোষ ধরনের। এসব কোষে মাইটোকন্ড্রিয়া, প্লাস্টিড, গলজি বস্তু ইত্যাদি কোষ অঙ্গাণুগুলো থাকে না এবং এদের নিউক্লিয়াস সুগঠিত নয়। ব্যাকটেরিয়া কোষ একটি কোষ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকে। কোষের সাইটোপ্লাজমে মাত্র একটি ডি এন এ (DNA) অণু থাকে, নিউক্লিয়ঝিল্লি থাকে না। তাই একে নিউক্লিয়াস না বলে নিউক্লয়েড বলে।

ব্যাকটেরিয়ার আকৃতি অনুযায়ী প্রকারভেদ

ব্যাকটেরিয়া কোষের আকৃতি নানা ধরনের হয়ে থাকে। আকৃতি অনুযায়ী এদের প্রধান ৪টি ভাগে ভাগ করা যায়।

- (১) গোলাকার বা ডিম্বাকৃতি ব্যাকটেরিয়াদের কক্কাস (coccus) বলে। কক্কাসের বহুবচন ককসাই (cocci)।
- (২) দণ্ডাকার ব্যাকটেরিয়াগুলোর ব্যাসিলাস,
- (৩) কমা (,) র মত দেখতে হলে ভিব্রিও (Vibrio) এবং
- (৪) প্যাঁচানো হলে তাদের স্পাইরিলাম (Spirillum) বলে।

এ ছাড়া অনেক কক্কাস ব্যাকটেরিয়া সারিবদ্ধ হয়ে থাকে, এদের স্ট্রেপ্টোকক্কাস (*Streptococcus*) এবং দলা পাকানো অবস্থায় থাকে যে সব কক্কাস তাদের স্ট্যাফাইলোকক্কাস (*Staphylococcus*) বলে। কিছু ব্যাকটেরিয়া পরজীবী। এরা মানুষ ও পশুপাখির রোগ সৃষ্টি করে। অনেক ব্যাকটেরিয়া মৃত জীবদেহের পচানি থেকে শক্তি সংগ্রহ করে। এভাবে এরা পরিবেশকে পরিষ্কার রাখে। নাইট্রোজেন সংবলনকারী ব্যাকটেরিয়া বাতাস থেকে নাইট্রোজেন মাটিতে সংবলন করে। ফলে মাটি উর্বর হয়। কয়েকটি ব্যাকটেরিয়া লোহা, গন্ধক ও নাইট্রোজেন এর মত অজৈব পদার্থ থেকেও শক্তি সংগ্রহ করতে পারে।



চিত্র ৯.২ : বিভিন্ন আকৃতির ব্যাকটেরিয়া

ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্ব

ব্যাকটেরিয়ার উপকারিতা এবং অপকারিতা দুটোই রয়েছে। আমাদের অর্থনীতিতে এদের অবদান যথেষ্ট। এবার আলোচনা করা যাক ব্যাকটেরিয়া কীভাবে আমাদের উপকার করে বা ক্ষতি করে।

উপকারিতা

(১) মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি : ব্যাকটেরিয়া উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহ পচিয়ে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে, যেমন নাইট্রোব্যাক্টর (*Nitrobacter*)। এ ছাড়া মাটিতে বসবাসকারী কিছু ব্যাকটেরিয়া বাতাস থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন সংবলন করে মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ায়। ফলে মাটি উর্বর হয়। যেমন অ্যাজোটোব্যাক্টর (*Azotobacter*), ক্লসট্রিডিয়াম (*Clostridium*)।

শিম জাতীয় উদ্ভিদের শিকড়ে এক ধরনের গুটলি (nodule) দেখা যায়, এর ভিতর রাইসোবিয়াম (*Rhizobium*) জাতীয় ব্যাকটেরিয়া থাকে, যা বাতাসের নাইট্রোজেনকে নাইট্রেট সারে রূপান্তরিত করে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

২) পাট পচাতে : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পাটের একটা বিরাট অবদান রয়েছে। পাট বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়। পাট গাছ কেটে পানিতে পচানো হয় যাতে বাকল থেকে আঁশ সহজে আলাদা করা যায়। পাট পচাতে ব্যাকটেরিয়া সাহায্য করে।

৩) প্রক্রিয়াজাতকরণ : চা, কফি, তামাক ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা রয়েছে।

৪) চামড়া শিল্পে : চামড়া থেকে লোম ছাড়াতে ব্যাকটেরিয়ার অবদান রয়েছে।

৫) দুগ্ধজাত খাদ্য তৈরি : দুধ থেকে দই, মাখন, পনির প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে তৈরি হয়।

৬) ওষুধ তৈরি : ব্যাকটেরিয়া থেকে কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগের প্রতিষেধক টিকা তৈরি হয়। ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশ ও ধনুষ্টংকার রোগের প্রতিষেধক ডি. পি. টিও ব্যাকটেরিয়া থেকেই তৈরি হয়।

৭) আবর্জনা পচনে : ব্যাকটেরিয়া নালা নর্দমা ইত্যাদির আবর্জনা পচিয়ে পরিবেশকে পরিষ্কার রাখে।

অপকারিতা

১) রোগ সৃষ্টি

(ক) মানুষের রোগ : ব্যাকটেরিয়া মানুষের কলেরা, যক্ষ্মা, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, ডিপথেরিয়া, ধনুষ্ঠংকার, সিফিলিস ইত্যাদি মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে।

(খ) অন্যান্য পশু-পাখির রোগ : গরু, মহিষের যক্ষ্মা, মুরগির কলেরা ইত্যাদি ব্যাকটেরিয়া দিয়েই সৃষ্টি হয়।

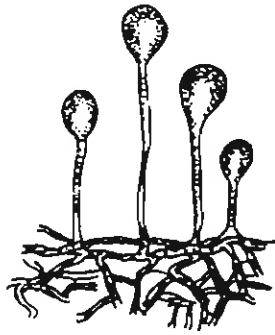
(গ) উদ্ভিদের রোগ : ধানের রাইট রোগ, গমের টুভু রোগ, আখের আঠাঝরা রোগ, টমেটোর ক্যাংকার, গোল আলুর বাদামি পচারোগ ইত্যাদি ব্যাকটেরিয়া দিয়ে ঘটে থাকে।

২) খাদ্যদ্রব্য পচন : ব্যাকটেরিয়া ফলমূল, শাকসবজি, মাছ মাংস, দুধ ইত্যাদি পচিয়ে আমাদের ক্ষতি করে।

৩) মাটির উর্বরতা কমানো : মাটিতে বসবাসকারী কিছু ব্যাকটেরিয়া মাটির নাইট্রোজেনকে ভেঙে নাইট্রোজেন গ্যাস সৃষ্টি করে বায়ুতে ছেড়ে দেয়। ফলে মাটির উর্বরতা কমে যায়।

ছত্রাক (ফাংগাস)

ছত্রাক বহুকোষী জীব। এদের আগে উদ্ভিদ জগতের সদস্য মনে করা হত। বর্তমানে এদের উদ্ভিদ জগৎ থেকে আলাদা একটি জগতে স্থান দেয়া হয়। এদের ক্লোরোফিল নেই বলে এরা সবুজ নয় এবং উদ্ভিদের মত খাদ্য তৈরি করতে পারে না। আবার প্রাণীদের মতো এরা কঠিন খাবারও খেতে পারে না। এরা শুধু তরল দ্রব্য পরিশোধন করে জীবন ধারণ করে। ছত্রাক মৃতজীবী বা পরজীবী। যে সব ছত্রাক অন্যান্য মৃত জীবের গলিত অংশ শোষণ করে তারা মৃতজীবী, যেমন পেনিসিলিয়াম (*Penicillium*), ইস্ট (*Yeast*), মিউকর (*Mucor*), ব্যাঙের ছাতা (*Agaricus*)। যে সব ছত্রাক কোন জীবদেহে বাস করে ঐ পোষকের দেহ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে তারা পরজীবী, যেমন *Puccinia* (পাকসিনিয়া), *Phytophthora* (ফাইটফথোরা)।



চিত্র ৯.৩ : মিউকর



চিত্র ৯.৪ : ব্যাঙের ছাতা বা মাশরুম

ছত্রাকের উপকারিতা

ছত্রাকের অর্থনৈতিক গুরুত্ব যথেষ্ট। এর উপকারিতা এবং অপকারিতা দুটোই রয়েছে।

উপকারিতা

(ক) ওষুধ উৎপাদনে : মানুষের অতি প্রয়োজনীয় জীবাণু প্রতিরোধী (antibiotic) পেনিসিলিয়াম নামক ছত্রাক থেকে পাওয়া যায়। পেনিসিলিয়াম নোটোম (*Penicillium notatum*) নামক ছত্রাক থেকে পেনিসিলিন ওষুধ তৈরি করা হয়। পেনিসিলিন গলা ব্যথা, পচা মা ইত্যাদি রোগের ওষুধ। অণুজীববিদ স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ছত্রাক থেকে পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন।

(খ) মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি : মাটিতে বসবাসকারী বিভিন্ন ছত্রাক মাটির বিভিন্ন জৈব পদার্থ পচিয়ে মাটির উর্বরতা বাড়ায়।

(গ) এলকোহল বা ইথানল প্রস্তুত : ইথানল প্রস্তুতে ছত্রাক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইস্ট (Yeast) নামে এক ধরনের এককোষী মৃতজীবী ছত্রাকের এতে ভূমিকা রয়েছে।

(ঘ) পাউরুটি তৈরি : পাউরুটি তৈরিতে ইস্ট দরকার। ইস্টের জন্যই পাউরুটি ফুলে ওঠে ও নরম হয়।

(ঙ) খাদ্য হিসেবে : কোনো কোনো ছত্রাক যেমন ব্যাঙের ছাতা বা মাশরুম পুষ্টিকর খাদ্য। পৃথিবীর বহু দেশে এটা মানুষের প্রিয় খাদ্য।

অপকারিতা

(ক) রোগ সৃষ্টিতে

(১) মানুষের রোগ : ছত্রাক মানুষের দেহে দাদ, ছুলি প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি করে।

(২) উদ্ভিদের রোগ : ছত্রাক ধান, আলু, গম, আখ ইত্যাদি ফসলী উদ্ভিদের নানা ধরনের রোগ সৃষ্টি করে ফসলের ক্ষতি করে।

(খ) খাদ্যবস্তু নষ্ট : রুটি, মাছ মাংস, রান্না করা খাদ্য, শাকসবজি, ফল, আচার, জেলি ইত্যাদি খাদ্যবস্তু নষ্ট করে।

(গ) ব্যবহার্য জিনিস নষ্ট : কাঠের আসবাবপত্র, চামড়ার জিনিস, ক্যামেরা, মাইক্রোস্কোপ ইত্যাদি নষ্ট করে।

(ঘ) বিষক্রিয়া : কোনো কোনো ক্ষতিকর ছত্রাক যেমন এক ধরনের ব্যাঙের ছাতা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করলে মানুষ মারা যেতে পারে।

আমাশয় রোগের কারণ

আমাশয় বা ডিসেনট্রি (dysentery) মানুষের একটি মারাত্মক রোগ। আমাশয় দুই ধরনের হতে পারে। একটি ব্যাকটেরিয়া ঘটিত, একে ব্যাসিলারী ডিসেনট্রি বলে। অন্যটি *Entamoeba histolytica* (এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা) নামে একটি অ্যামিবার সংক্রমণে ঘটে।

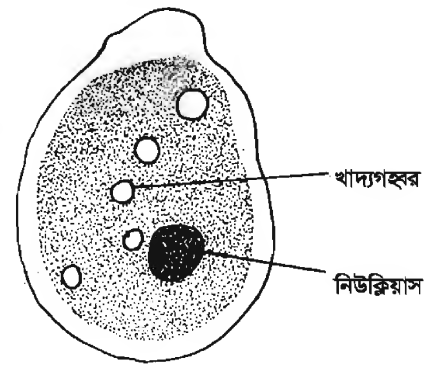
এসব পরজীবীরা দূষিত খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে আমাদের দেহে প্রবেশ করে। এন্টামিবা বৃহদন্ত্রে বাস করে এবং সেখানকার প্রাচীর গাত্র থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে। এতে সেখানে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এর ফলে মলের সঙ্গে প্রচুর মিউকাস এবং রক্ত বের হয়। সেই সাথে জ্বরও হতে পারে। আক্রান্ত ব্যক্তির তলপেটে ব্যথা অনুভূত হয়। অনেক সময় অল্প প্রাচীর ছিদ্র হয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া এ পরজীবী রক্তের সাথে যকৃৎ ও দেহের অন্যান্য অঙ্গে এমন কি মস্তিষ্কেও ছড়িয়ে যেতে পারে। এ ধরনের ক্ষেত্রে রোগী মারা যেতে পারে।

এন্টামিবা কী?

এন্টামিবা প্রাণী জগতের প্রোটোজোয়া পর্বের সদস্য। এরা এককোষী প্রাণী, আকারে খুবই ছোট এবং খালি চোখে দেখা যায় না। *Entamoeba histolytica* (এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা) মানুষের বৃহদন্ত্রের পরজীবী। এরা আমাশয় রোগ সৃষ্টি করে। এন্টামিবা গণের আরো ছয়টি প্রজাতি মানবদেহে পরজীবী হিসেবে বাস করে। কিন্তু এরা কোনো রোগ সৃষ্টি করে না।

এন্টামিবার অঙ্গসংস্থান

এন্টামিবার কোষদেহের নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই। এদের আকার ক্ষণপদ সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবর্তনশীল। এরা এককোষী প্রাণী। কোষ আবরণটি সজীব, পাতলা ও স্থিতিস্থাপক। কোষ দুভাগে বিভক্ত। যথা সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস। এরা সাইটোপ্লাজম থেকে ক্ষণপদ সৃষ্টির মাধ্যমে চলাচল করে। এন্টামিবার সাইটোপ্লাজমে রয়েছে কয়েক ধরনের গহ্বর। নিউক্লিয়াস কোষের বিভিন্ন জৈবিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।



চিত্র ৯.৫ : এন্টামিবা

জীবনবৃত্তান্ত

প্রতিকূল অবস্থায় এন্টামিবা সাইটোপ্লাজম দিয়ে দেহের চারিদিকে একটি মজবুত আবরণী গড়ে তোলে। এ অবস্থায় এদের সিস্ট (cyst) বলে।

আমাশয় রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মলের সাথে অসংখ্য সিস্ট দেহের বাইরে আসে। দূষিত পানি পান করলে বা কাঁচা শাকসবজি না ধুয়ে খেলে এদের মাধ্যমে সিস্টগুলো আবার মানুষের পরিপাক নালীতে প্রবেশ করতে পারে। খাবারের মাধ্যমেও এরা মানুষের দেহে প্রবেশ করতে পারে। সিস্টগুলো পাকস্থলি হয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে। ক্ষুদ্রান্ত্রে আসার পর সিস্টগুলোর আবরণ নষ্ট হয়ে অপরিণত দশা মুক্তি পায় এবং এরা বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে বংশ বিস্তার করে। সেখানে ক্রমান্বয়ে পরিণত দশায় পরিবর্তিত হয় এবং এ সময় এদের দেহ নিঃসৃত এনজাইম দিয়ে বৃহদন্ত্রের শ্লেষ্মা ঝিল্লির কোষ বিগলিত করে বিগলিত কোষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলো এবং লোহিত রক্ত কণিকা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এর ফলে বৃহদন্ত্রের প্রাচীরে ক্ষত সৃষ্টি হয়। এ ক্ষতের কারণেই বৃহদন্ত্রের শ্লেষ্মা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে পরিণত হয় এবং মলের সাথে মিউকাস হিসেবে বের হয়।

আমাশয় রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকার

আমাশয় রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো নেওয়া যেতে পারে।

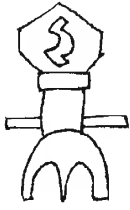
- (১) পানি ভালভাবে ফুটিয়ে পান করতে হবে।
- (২) মাছি বা আরশোলা ইত্যাদি পতঙ্গবাহিত হয়ে যাতে খাবারের সাথে না মেশে সেজন্য খাবার ঢেকে রাখতে হবে।
- (৩) শাকসবজি বা ফলমূল খাবার আগে পরিষ্কার পানি দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে নিতে হবে।
- (৪) কোন কিছু খাবার আগে হাত ভালভাবে ধুতে হবে অথবা পরিষ্কার চামচ ব্যবহার করতে হবে।
- (৫) হাতের নখ যাতে বড় না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- (৬) পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করতে হবে।
- (৭) মলত্যাগের পর হাত ভালভাবে ধুতে হবে।
- (৮) রোগাক্রান্ত হলে আরোগ্য লাভের জন্য ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন করতে হবে।

অনুশীলনী

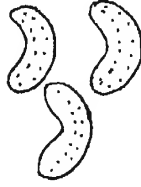
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি জড় এবং জীবের সন্ধিস্থলে অবস্থান করে ?
 ক. ব্যাকটেরিয়া
 গ. ভাইরাস
 খ. ছত্রাক
 ঘ. এন্টামিবা
২. নিচের কোনটি অণুজীবের অন্তর্ভুক্ত নয় ?
 ক. ছত্রাক
 গ. রিকেটসিয়া
 খ. ব্যাকটেরিয়া
 ঘ. শৈবাল
৩. কোনটি ভাইরাসজনিত রোগ ?
 ক. কলেরা
 গ. রানীক্ষেত
 খ. ডিপথেরিয়া
 ঘ. সিফিলিস

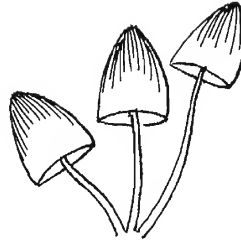
৪. নিচের চিত্রগুলোর মধ্যে কোনটি অকোষী ?



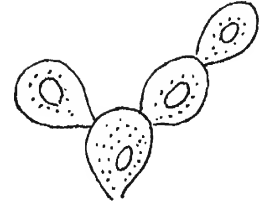
চিত্র ১



চিত্র ২



চিত্র ৩



চিত্র ৪

ক. চিত্র ১

খ. চিত্র ২

গ. চিত্র ৩

ঘ. চিত্র ৪

৫. মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

- মিউকর
- নাইট্রোব্যাক্টেরিয়া
- রাইজোবিয়াম

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i.

খ. ii, iii

গ. ii

ঘ. iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আরিফ স্কুল থেকে বাসায় ফেরার পথে রাস্তা থেকে চটপটি কিনে খায়। বাসায় ফেরার কিছুক্ষণের মধ্যে হঠাৎ পেটে ব্যথা অনুভব করে এবং জ্বরও দেখা দেয়। সে বারে বারে টয়লেটে যেতে থাকে এবং একসময় শারীরিক অবস্থা খারাপ হলে বাবা মা তাকে নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

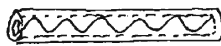
ক. আরিফের রোগটির নাম কি ?

খ. ঐ রোগটি কীভাবে সংক্রমিত হয়? বর্ণনা কর।

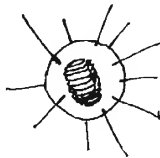
গ. আরিফের পেটে ব্যথার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আরিফ চিকিৎসকের শরণাপন্ন না হলে কী ক্ষতি হত ? আলোচনা কর।

২.



A



B

ক. B চিত্রের অনুজীবটির নাম কী?

খ. A চিত্রের অনুজীবটির কোষের ২টি প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।

গ. B চিত্রের জীবটির বেঁচে থাকার জন্য অন্য একটি জীবদেহের কেন প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. A চিত্রের জীবটি কীভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? আলোচনা কর।

দশম অধ্যায়

প্রাণী জগৎ

আমাদের বাসভূমি এ পৃথিবীতে নানা পরিবেশে নানা রকমের প্রাণী বাস করে। এ সব প্রাণীর মধ্যে কতকগুলো অতি ক্ষুদ্র আবার অনেকে প্রকাণ্ড বড়। কেউ স্থলে বিচরণ করে আবার কেউ পানিতে বাস করে। অনেকে ডানা মেলে আকাশে উড়ে বেড়ায়। কেউ কেউ বুকে ভর দিয়ে চলে। প্রাণী জগতের অনেক সদস্য যেমন মানুষের উপকার করে থাকে তেমনি অনেকেই মানুষের ক্ষতিও করে থাকে। মেবুদড আছে বা নেই এর উপর ভিত্তি করে প্রাণীদের দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন

(১) যেসব প্রাণীর মেবুদড বা শিরদাঁড়া নেই তাদেরকে অমেবুদডী প্রাণী বলে। যথা : কেঁচো, মাকড়সা, কাঁকড়া, বিছা প্রভৃতি।

(২) যে সব প্রাণীর মেবুদড বা শিরদাঁড়া আছে তাদেরকে মেবুদডী প্রাণী বলে। যথা : মানুষ, গরু, ছাগল, মাছ প্রভৃতি।

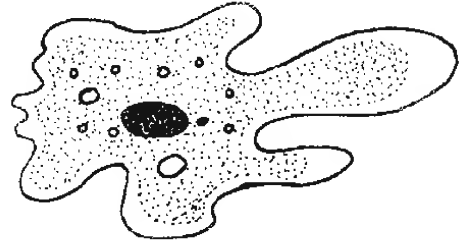
অমেবুদডী প্রাণী

এ পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের অমেবুদডী প্রাণী রয়েছে। দেহের কোষ সংখ্যা, দেহের বহিরাবরণের ধরন, দেহের খড়ায়ন, রেচন, রক্ত সংবহনতন্ত্র, ছিদ্র, আকৃতি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে অমেবুদডী প্রাণীদের কতগুলো বড় বড় দলে ভাগ করা হয়েছে। এ সব বড় বড় দলকে পর্ব বলা হয়। প্রাণী জগতকে মোট দশটি প্রধান পর্বে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে নয়টি পর্বই অমেবুদডী প্রাণীদের। মেবুদডী প্রাণীরা কর্ডাটা পর্বের অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে প্রাণিজগতের পর্বগুলোর নাম, উদাহরণ ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল।

১। পর্বের নাম : Protozoa (প্রোটোজোয়া): উদাহরণ : অ্যামিবা, এন্টামিবা ও ম্যালেরিয়া পরজীবী।

প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

- (১) এক কোষী প্রাণী, দেহের সব কাজ একটি কোষ দিয়ে সম্পন্ন করে থাকে।
- (২) অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়।
- (৩) ক্ষণপদের সাহায্যে চলাচল করে থাকে।
- (৪) একক অথবা দলবন্দ্যভাবে বাস করে।
- (৫) মুক্তজীবী বা পরজীবী হয়ে থাকে।
- (৬) কোষে নিউক্লিয়াস আছে।
- (৭) আকার বিভিন্ন, যেমন : গোলাকার, ডিম্বাকৃতি, লম্বাকৃতি অথবা অনিয়মিত।

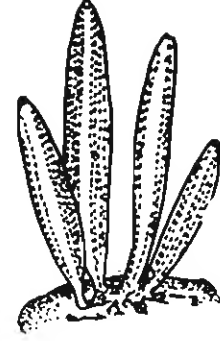


চিত্র ১০.১ : অ্যামিবা

২। পর্বের নাম : Porifera (পরিফেরা) : এ পর্বের দেহের আবরণে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে। সে কারণে এদেরকে পরিফেরা বা ছিদ্রযুক্ত প্রাণী বলে। উদাহরণ : লিউকোসোলেনিয়া।

প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

- (১) বহুকোষ বিশিষ্ট জলজ প্রাণী।
- (২) দেহে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে।
- (৩) ছিদ্র দিয়ে পানির সাথে খাদ্য ও অক্সিজেন শরীরে প্রবেশ করে এবং দূষিত পদার্থ বের হয়।
- (৪) স্বাধীনভাবে চলতে পারে না।
- (৫) অধিকাংশ সমুদ্রে বাস করে। তবে কিছু কিছু স্বাদু পানিতেও বাস করে।
- (৬) স্পঞ্জ নামে পরিচিত।

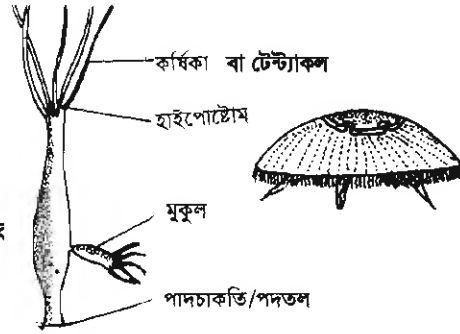


চিত্র ১০.২ : লিউকোসোলেনিয়া

৩। পর্বের নাম : Cnidaria (নিডারিয়া) বা ফাঁপা দেহবিশিষ্ট প্রাণী : দেহ ফাঁপা। এ ফাঁপা অংশ দেহগহ্বর ও পরিপাক যন্ত্র উভয়েরই কাজ করে। এ অংশকে সিলেন্টেরন বলে। যথা : প্রবাল, জেলি ফিশ, হাইড্রা ইত্যাদি।

প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

- (১) দেহ নলের মতো ফাঁপা।
- (২) মুখ আছে, পায়ু নেই।
- (৩) বহুকোষী প্রাণী।
- (৪) দেহের আবরণের কোষগুলো দুই স্তরে সাজানো থাকে। দুই স্তরের মধ্যে জেলির মতো একটি স্তর থাকে।
- (৫) খাদ্য গ্রহণ ও চলাচলের জন্য হাতের মত আঁকড়া বা টেন্টাকল আছে।

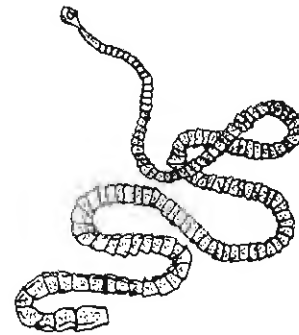


চিত্র ১০.৩ : হাইড্রা ও জেলি ফিশ

৪। পর্বের নাম : Platyhelminthes (প্লাটিহেলমিনথিস) বা চ্যাপ্টা ক্রিমি : চ্যাপ্টা দেহ বিশিষ্ট ক্রিমি জাতীয় প্রাণী এ পর্বের অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণ : ফিতা ক্রিমি ও যকৃৎ ক্রিমি।

প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

- (১) বহুকোষী প্রাণী।
- (২) পরজীবী প্রাণী।
- (১) দেহ ফিতার মতো চ্যাপ্টা। দেহ গহ্বর থাকে না।
- (২) মাথায় চোষক আছে।
- (৩) মুখ আছে, পায়ু নেই।
- (৪) অনেকের দেহ বহির্ভাগে খণ্ডায়িত।



চিত্র ১০.৪ : ফিতা ক্রিমি

৫। পর্বের নাম : Nematoda (নেমাটোডা) বা গোল ক্রিমি : গোলাকার ক্রিমি এ পর্বের অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণ : গুঁড়া ক্রিমি, হুক ওয়ার্ম, কেঁচো ক্রিমি, ফাইলেরিয়া ক্রিমি।

প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

- (১) দেহ গোল, অখণ্ডিত এবং প্রান্ত সরু।
- (২) মুখ ও পায়ু আছে।
- (৩) পানিতে ও মাটিতে মুক্তভাবে বাস করে।
- (৪) অনেকেই উদ্ভিদ বা অন্য প্রাণীতে পরজীবী হিসেবে বাস করে।

৬। পর্বের নাম : Annelida (অ্যানিলিডা) : দেহ আংটির মতো খণ্ড খণ্ড অংশে তৈরি। উদাহরণ : কেঁচো, জোক ইত্যাদি।

প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

- (১) দেহ আংটির মতো খণ্ড খণ্ড অংশে তৈরি।
- (২) দেহের প্রতি খণ্ডে কাঁটার মত সিঁটি আছে যা চলতে সাহায্য করে।
- (৩) বহুকোষী প্রাণী।
- (৪) মুখ ও পায়ু আছে।
- (৫) জলে ও স্থলে ভেজা মাটিতে বাস করে।

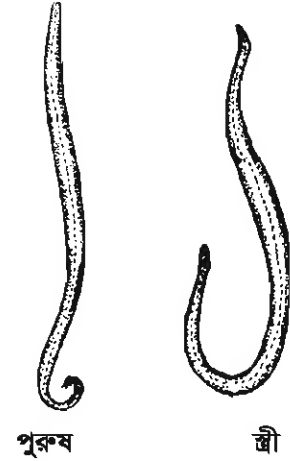
৭। পর্বের নাম : Arthropoda (আর্থ্রোপোডা) বা সন্ধিপদ প্রাণী :
এ পর্বের প্রত্যেকটি প্রাণীর কমপক্ষে তিন জোড়া পা থাকে।
উদাহরণ : চিংড়ি, কাঁকড়া, বিছা, তেলাপোকা, মাছি ইত্যাদি।

প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

- (১) দেহ খণ্ডায়িত। খণ্ডকগুলো মাথা, বক্ষ ও উদর ইত্যাদি বিভিন্ন অংশে বিন্যস্ত।
- (২) দেহের প্রায় প্রতি খণ্ডে এক জোড়া সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ বা পা থাকে।
- (৩) ত্বকে কাইটিন নামক একটি বিশেষ যৌগ থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ত্বক খুব দৃঢ়।
- (৪) বিভিন্ন ধরনের খাবার খায়। সে জন্য চোয়াল বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়।



চিত্র ১০.৭ : কাঁকড়া ও আরশোলা



চিত্র ১০.৫ : গোল ক্রিমি

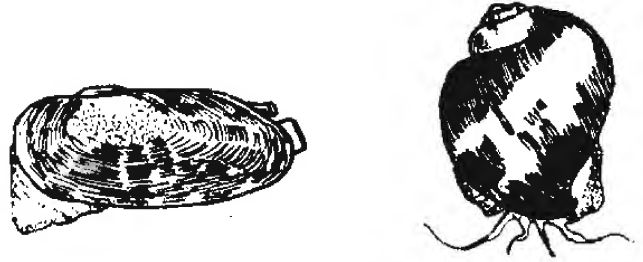


চিত্র ১০.৬ : কেঁচো

৮। পর্বের নাম : Mollusca (মলাস্কা) : দেহ নরম ও খোলক দিয়ে আবৃত। উদাহরণ : শামুক, বিনুক, অক্টোপাস ইত্যাদি।

প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

- (১) দেহ নরম, খড়ায়িত নয়।
- (২) দেহ শক্ত খোলক দিয়ে আবৃত।
- (৩) দেহের নিচের (অক্ষীয়) দিকে পেশিবহুল পা থাকে এবং উপরের দিকে অল্প ও অন্যান্য অঙ্গ থাকে।
- (৪) অধিকাংশ সাগরে ও মিঠাপানিতে এবং কিছু সংখ্যক স্থলে বাস করে।

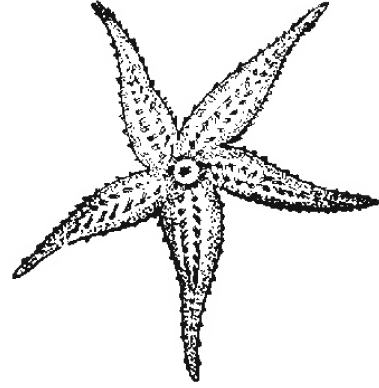


চিত্র ১০.৮ : বিনুক ও শামুক

৯। পর্বের নাম : Echinodermata (একাইনোডার্মাটা) : এ পর্বের সকল প্রাণী সামুদ্রিক। যথা : তারা মাছ (Star fish), সি আর্চিন, সি লিলি ইত্যাদি।

প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

- (১) ত্বক ছোট ছোট শক্ত পাত দিয়ে ঢাকা থাকে। পাতগুলো চুন জাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরি।
- (২) দেহের বাহিরে ছোট বড় অনেক কাঁটা থাকে।
- (৩) এদের বাহুগুলো কেন্দ্র থেকে চাকার পাখির (Spoke) মত বাইরের দিকে ছড়ানো থাকে।
- (৪) অধিকাংশই সমুদ্রের তলদেশে বালি, কাদা বা পাথরের উপর মুক্তভাবে থাকে। সি লিলি ডাঁটার সাহায্যে তলদেশে আঁকড়ে থাকে, চলাচল করতে পারে না।



চিত্র ১০.৯ : তারা মাছ

১০। পর্বের নাম : Chordata (কর্ডাটা) : মেরুদণ্ডী প্রাণীরা এ পর্বের সদস্য।

মেরুদণ্ডী প্রাণী কী এবং তাদের শ্রেণীবিভাগ

যে সব প্রাণীদের দেহের পিঠের দিকে মেরুদণ্ড থাকে তাদের মেরুদণ্ডী প্রাণী বলে। যেমন : মাছ, ব্যাঙ, কুমির, পাখি, বাঘ, মানুষ ইত্যাদি। এদের সাথে কয়েকটি সরল গঠনের সামুদ্রিক প্রাণীদের নিয়ে কর্ডাটা পর্ব গঠিত।

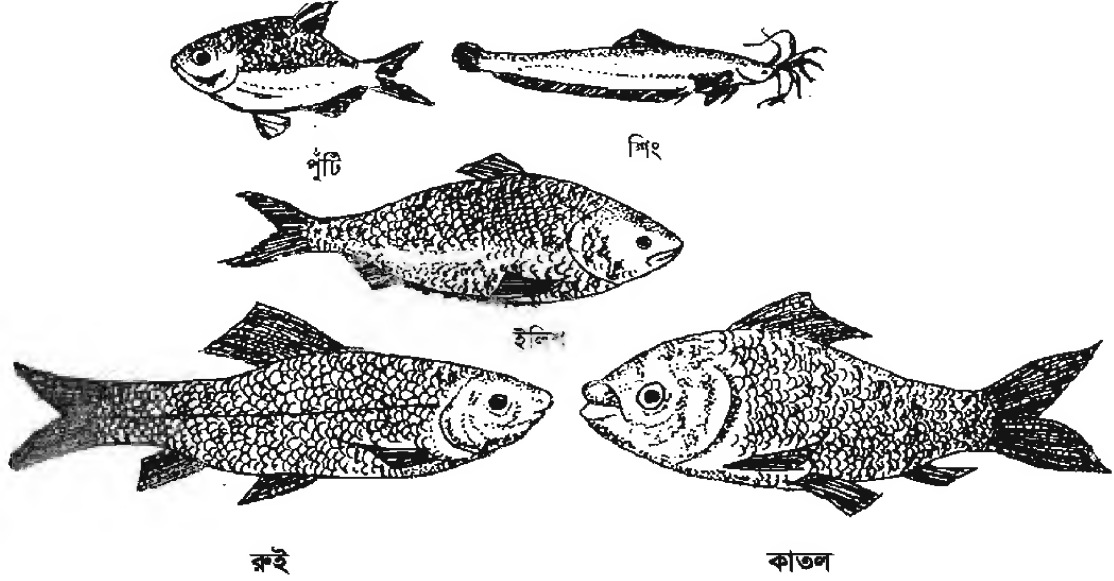
কর্ডাটা পর্বের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

- ১। পিঠের দিকে ভ্রূণ অবস্থায় স্থিতিস্থাপক দণ্ডের মত নটকর্ড থাকে। নটকর্ডই পরে মেরুদণ্ডে রূপান্তরিত হয়।
- ২। গলবিল অঞ্চলে (মাথার পিছনে) শ্বসন ছিদ্র থাকে।
- ৩। পিঠের দিকে ফাঁপা স্নায়ুরজ্জ্ব থাকে।
- ৪। পায়ুর পিছনে লেজ থাকে।

বাহ্যিক গঠন বৈশিষ্ট্য, জীবনধারণ পদ্ধতি, চলন ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে এদের বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ উল্লেখ করা হল।

১। শ্রেণীর নাম : Pisces (পিসেস) বা মৎস্যকুল :

সব রকমের মাছ এ শ্রেণীর সদস্য। মিঠা ও লোনা উভয় ধরনের পানিতে বাস করে। মৎস্যকুলের মধ্যে রয়েছে ইলিশ, বুই, কাতল, মৃগেল, পুঁটি, কৈ, বোয়াল, শোল, গজার, শিং, চিংড়ি, মাগুর, আইর, টেংরা, মেনি, নৃপচান্দা, রিটা, কোরাল, হাঙ্গর ইত্যাদি।



চিত্র ১০.১০ : মৎস্যকুল

বশিষ্ট্য

- ১) অধিকাংশ মাছের আঁইশ আছে এবং কোন কোন মাছে আঁইশ নেই। যেমন শিং, বোয়াল, মাগুর, টেংরা ইত্যাদি।
- ২) ফুলকা আছে, ফুসফুস নেই।
- ৩) দেহে জোড় ও বেজোড় পাখনা আছে।
- ৪) ডিম পাড়ে, ডিম ফুটে বাচ্চা হয়।

২। শ্রেণীর নাম : Amphibia (অ্যাম্ফিবিয়া) বা উভচর :

মরুদভী প্রাণীর মধ্যে কতকগুলো জল ও স্থল উভয় স্থানে বাস করে তাদের উভচর প্রাণী বলে। এদের ডিম ও লার্ভা পানি ছাড়া বাঁচে না। যেমন কুনো ব্যাঙ, সোনা ব্যাঙ, গেছো ব্যাঙ ইত্যাদি।



চিত্র ১০.১১ : উভচর প্রাণী

বৈশিষ্ট্য

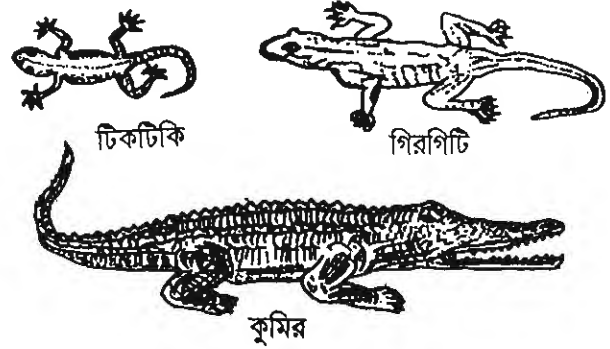
- (১) দেহের লোম, পালক বা আইশ নেই। ত্বক কোমল।
- (২) চারটি পা আছে কিন্তু নখ নেই।
- (৩) ফুসফুস ও ফুলকা আছে।
- (৪) ঘাড় নেই, মাথা দেহের সঙ্গে যুক্ত।
- (৫) ব্যাঙ জিহ্বা দিয়ে শিকার ধরে খাবার গিলে খায়।
- (৬) শীতল রক্তবিশিষ্ট।

৩। শ্রেণীর নাম : **Reptilia** (রেপটিলিয়া) বা সরীসৃপ

যে সকল মেৰুদণ্ডী প্রাণী বুকে ভর দিয়ে চলে তাদেরকে সরীসৃপ বলে। সরীসৃপদের মধ্যে রয়েছে টিকটিকি, কাছিম, কচ্ছপ, সাপ, কুমির, ঘড়িয়াল, গুঁইসাপ, গিরগিটি প্রভৃতি।

বৈশিষ্ট্য

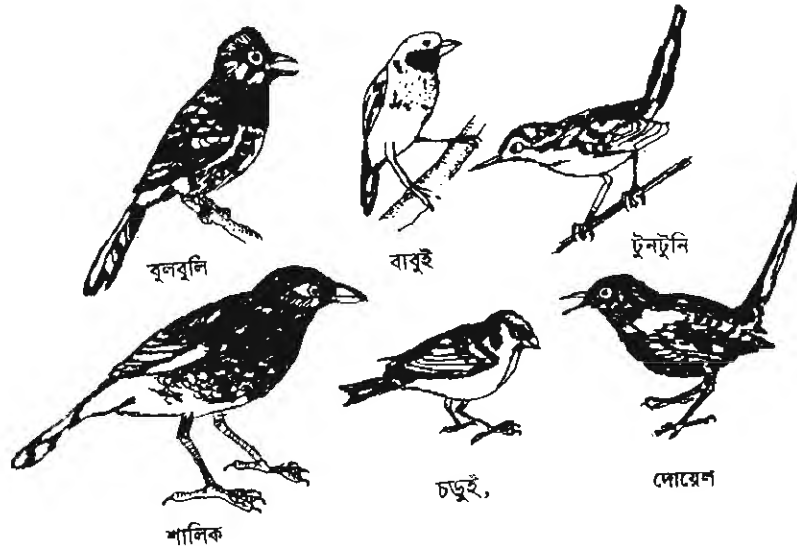
- (১) বুকে ভর দিয়ে চলে।
- (২) চামড়া খসখসে ও আইশ বা শক্ত আবরণযুক্ত।
- (৩) ফুসফুস আছে।
- (৪) শীতল রক্ত বিশিষ্ট।
- (৫) সাধারণত চতুষ্পদী, কিন্তু সাপের পা অপসৃত।
পায়ে নখর থাকে।
- (৬) ডিম পাড়ে।



চিত্র ১০.১২ : সরীসৃপ প্রাণী

৪। শ্রেণীর নাম : **Aves** (এভিস) বা পক্ষীকুল

মেৰুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে যাদের পালক আছে তাদেরকে পাখি বলা হয়। যেমন হাঁস, মুরগি, কবুতর, চডুই, বাবুই, টুনটুনি, মাছরাঙ্গা, কাক, কোকিল, ময়না, টিয়া, চিল, শকুন, ঈগল, শালিক, বক, সারস, ময়ূর, কিউই, এমু, উটপাখি ইত্যাদি। কিউই, এমু ও উটপাখি উড়তে পারে না কিন্তু দৌড়াতে পারে কারণ এদের ডানা অপুষ্ট কিন্তু পা সুগঠিত।

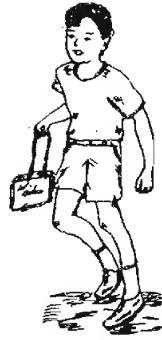


চিত্র ১০.১৩ : পক্ষীকুল

বৈশিষ্ট্য

- (১) দেহ পালকে ঢাকা।
- (২) দাঁত নেই, চঞ্চু আছে।
- (৩) ফুসফুস ও বায়ু থলি আছে।
- (৪) উষ্ণ রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী।
- (৫) এদের বড় হাড়গুলো ফাঁপা ও হালকা।

৫। শ্রেণীর নাম : Mammalia (ম্যামালিয়া) বা স্তন্যপায়ী : যেসব প্রাণী সন্তান প্রসব করে এবং সন্তানরা শিশুকালে মায়ের দুধ পান করে থাকে তাদেরকে স্তন্যপায়ী প্রাণী বলে। স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে রয়েছে : মানুষ, বিড়াল, গরু, মহিষ, কুকুর, হাতি, ঘোড়া, বাঘ, ভাল্লুক, বানর, বেজি, নীল তিমি, সজারু, হুঁদুর, হরিণ ইত্যাদি।



মানুষ



গরু



হুঁদুর

বৈশিষ্ট্য

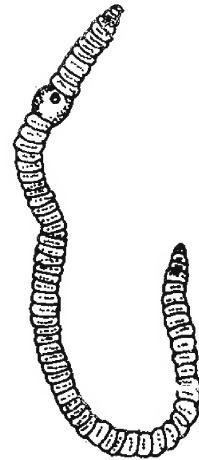
- (১) দেহ লোমে আবৃত থাকে।
- (২) সন্তান প্রসব করে এবং শিশু মায়ের দুধ পান করে।
- (৩) চতুষ্পদী, শুধু মানুষই দ্বিপদী।
- (৪) আঙুলে নখ থাকে। অনেকের নখ খুরে রূপান্তরিত।
- (৫) উষ্ণ রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী।

চিত্র ১০.১৪ : স্তন্যপায়ী প্রাণী

কেঁচো ও টিকটিকির পরিচিতি

কেঁচো

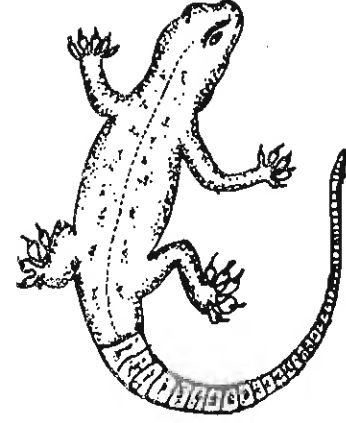
কেঁচো সাধারণত সঁাতসেঁতে মাটিতে বাস করে। শুষ্ক স্থানে কেঁচো বাস করতে পারে না। কেঁচো আলো ও তাপ সহ্য করতে পারে না। এরা দিনে গর্তে বাস করে। রাতে খাদ্যের জন্য বের হয়। কেঁচো সাত আট ইঞ্চি লম্বা হয়ে থাকে। দেহ গোলাকার এবং সম্মুখ দিকের অগ্রভাগ সূচালো। কেঁচোর চোখ, কান ও ফুসফুস নেই। ত্বকের সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাস চালায়। তাছাড়া ত্বক অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ। কেঁচোর দেহ আংটির মত প্রায় ১৫০টি খণ্ডকে বিভক্ত। প্রতি খণ্ডকে চারজোড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিটি বা কাঁটা আছে যা দিয়ে চলাফেরা করে। কেঁচো মাটিতে গর্ত করে। এর ফলে বায়ু ও সার মাটির ভেতর সহজে প্রবেশ করে। এতে মাটি উর্বর হয়। মাটি নরম থাকে। মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে বলে কেঁচোকে ‘প্রকৃতির লাঙল’ বলা হয়।



চিত্র ১০.১৫ : কেঁচো

টিকটিকি

সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী। শরীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁইশ দিয়ে আবৃত। টিকটিকির দেহ মাথা, ঘাড়, ধড় ও লেজ এ চারটি অংশে বিভক্ত। এদের রক্ত লাল। এরা শীতল রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী। এদের চারটি পা, দুইটি চোখ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলো দাঁত আছে। পায়ের তলায় বিশেষ ধরনের তুলতুলে মাংসপিণ্ড (প্যাড) আছে। এর সাহায্যে এরা ছাদের তলায় কিংবা খাড়া দেয়ালে অতি সহজে চলাচল করতে পারে। টিকটিকির লেজ কেটে গেলে ঐ অংশ পুনরায় গজায়। টিকটিকি এক সজে ২০টি পর্যন্ত ডিম পাড়ে। পোকা মাকড় খেয়ে জীবনধারণ করে। টিকটিকির দুই চোখ পৃথক পৃথক ভাবে নাড়াতে পারে তাই এরা বেশি দেখে। টিকটিকি ক্ষতিকর পোকামাকড় খেয়ে আমাদের উপকার করে থাকে।



চিত্র ১০.১৬ : টিকটিকি

অমেবুদন্তী প্রাণী (কেঁচো) ও মেবুদন্তী প্রাণীর (টিকটিকি) তুলনা

কেঁচো	টিকটিকি
১) সঁাতসঁতে মাটিতে বাস করে।	১) শুকনা জায়গায় বাস করে।
২) দেহের বাইরের ত্বক নরম ও আর্দ্র	২) দেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁইশ দ্বারা আবৃত।
৩) নিশাচর প্রাণী।	৩) দিবা রাত্র চলাচল করে থাকে।
৪) দেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহখণ্ডকে বিভক্ত।	৪) দেহে মাথা, ধড়, ঘাড় ও লেজ আছে।
৫) কেঁচোর দাঁত নেই।	৫) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁত আছে।
৬) পা ও লেজ নেই।	৬) চার পা ও একটি লেজ আছে।
৭) ত্বকের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।	৭) ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।
৮) চোখ নেই।	৮) দুইটি চোখ আছে।
৯) মেবুদন্ত নেই।	৯) মেবুদন্ত আছে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি মেরুদণ্ডী প্রাণী ?
 ক. অ্যামিবা
 গ. স্পঞ্জ
 খ. বেজি
 ঘ. মাছি
২. কোনটির মাথায় চোষক থাকে ?
 ক. চ্যাপ্টা ক্রিমি
 গ. অ্যানেলিডা
 খ. সুতা ক্রিমি
 ঘ. সন্ধিপদ প্রাণী
৩. কোন প্রাণীকে প্রকৃতির লাজল বলে ?
 ক. কেঁচো
 গ. তেলাপোকা
 খ. প্রোটোজোয়া
 ঘ. সুতাক্রিমি
৪. নীল তিমি কোন শ্রেণীর প্রাণী ?
 ক. স্তন্যপায়ী
 গ. মৎস্যকুল
 খ. পক্ষীকুল
 ঘ. সরীসৃপ
৫. দাঁত নেই কোন শ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণীর ?
 ক. পক্ষীকুলের
 গ. মৎস্যকুলের
 খ. উভচরের
 ঘ. সরীসৃপের
৬. মলাস্কা পর্বের প্রাণীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে
 i. অধিকাংশই লবণাক্ত পানিতে বাস করে
 ii. দেহ শক্ত খোলক দিয়ে আবৃত
 iii. দেহ খড়ায়িত
 পক্ষীকুল

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i
 গ. ii ও iii
 খ. i ও ii
 ঘ. i, ii ও iii
৭. উভচর প্রাণী তাদের বলবো যাদের
 i. ফুসফুস ও বায়ু থলি আছে
 ii. ফুসফুস ও ফুলকা আছে
 iii. ফুলকা আছে, ফুসফুস নেই

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i
 গ. iii
 খ. ii
 ঘ. i, ii ও iii

৮.



চিত্রের প্রাণীটির পর্ব হচ্ছে

ক. Arthropoda

খ. Annelida

গ. Platyhelminthes

ঘ. Nematoda

৯. চিত্রের প্রাণীটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

i. দেহের প্রতি খণ্ডে সিটি আছে

ii. মাথায় চোষক আছে

iii. মুখ আছে, পায়ু নেই

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

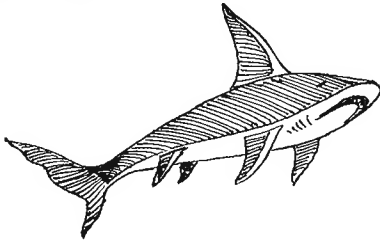
খ. ii

গ. iii

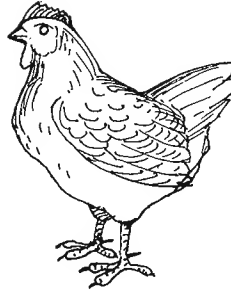
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.



A



B



C

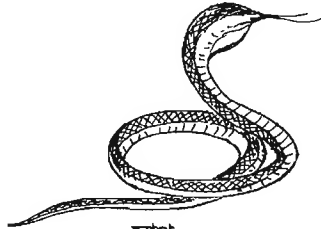
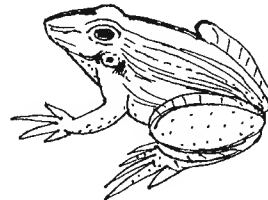
ক. চিত্র B এর প্রাণীটি কোন শ্রেণীভুক্ত?

খ. চিত্র C এর প্রাণীটি অন্য দুটি প্রাণী থেকে আলাদা কেন?

গ. উপরের চিত্রের একটি প্রাণীর সাথে ডলফিনকে কেন একত্রে রাখবে ব্যাখ্যা কর

ঘ. উটপাখি ও চিত্র B এক শ্রেণীভুক্ত হলেও উটপাখি একটু আলাদা আলোচনা কর।

২.

সাপ
Aব্যাঙ
B

K. চিত্র A কী জাতীয় প্রাণী?

খ. চিত্র B প্রাণীটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।

গ. চিত্র B এর প্রাণীর জীবনে দুই ধরনের শ্বসনতন্ত্র দেখা যায় ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্র A এর প্রাণীটি চিত্র B এর প্রাণীটির উপর কীভাবে নির্ভরশীল এবং পরিবেশে এর প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর পরস্পর নির্ভরশীলতা

পানি, কার্বন ও অক্সিজেন চক্র

বৈঁচে থাকার জন্য পানি, কার্বন এবং অক্সিজেন অপরিহার্য। জীব কোষের প্রোটোপ্লাজমের শতকরা ৭৫-৯০ ভাগ পানি। তাই পানির অভাবে কোষ তথা জীব বাঁচতে পারে না।

জীবের বৈঁচে থাকার জন্য খাদ্য দরকার। এ খাদ্য তৈরিতে কার্বন এর যৌগরূপে কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহৃত হয়। আবার জীবের শ্বাসকার্য সম্পাদনের জন্য দরকার অক্সিজেন যার অভাবে কোন জীব এক মুহূর্তও বৈঁচে থাকতে পারে না।

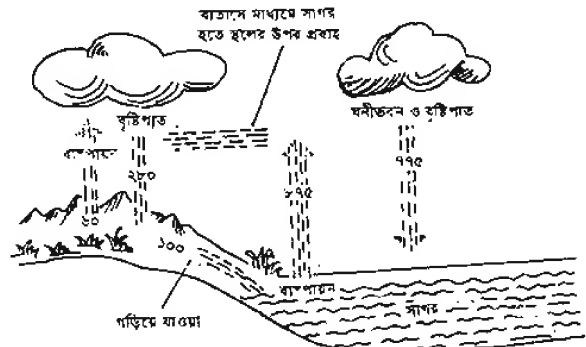
তাহলে দেখা যায় যে পানি, কার্বন এবং অক্সিজেন এদের কোনটির অভাবেই পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। এগুলো সব সময়ই ব্যবহৃত হচ্ছে। অথচ পরিবেশে এদের পরিমাণ খুব একটা কমছে না। এর কারণ এই যে এদের যেমন ব্যবহার হচ্ছে অন্যদিকে আবার তৈরিও হচ্ছে। এবার আমরা জানার চেষ্টা করি কীভাবে পানি, কার্বন এবং অক্সিজেন প্রকৃতিতে চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে।

পানি চক্র

বৈঁচে থাকার জন্য পানি প্রত্যেক জীবের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। পানি ছাড়া কোন জীব বাঁচতে পারে না। আমাদের দেহের প্রায় ৭০% পানি।

ভূপৃষ্ঠে পানির প্রধান উৎস হচ্ছে সমুদ্র। এছাড়াও রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল, হ্রদ ইত্যাদি। সূর্যের তাপে এসব জলাশয় থেকে পানি বাষ্প হয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে এবং সেখানে ঘনীভূত হয়ে মেঘের সৃষ্টি হয়। পরে সে মেঘ থেকে হয় বৃষ্টি। এভাবে বৃষ্টির মাধ্যমে আবার পানি ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে।

ভূপৃষ্ঠ এ পানি শোষণ করে নেয়। শোষণ করা পানির কিছু অংশ গাছপালার শিকড় মূলের সাহায্যে শোষণ করে। বাকি অংশ মাটির ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নদ-নদী, জলাশয় হয়ে সমুদ্রে পৌঁছে।



চিত্র ১১.১ : পানি চক্র

গাছপালার প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় পানি বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। এ বাষ্প থেকে মেঘের সৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টিপাতের ফলে আবার ভূপৃষ্ঠে পানি ফিরে আসে। এভাবেই ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন জলাশয় থেকে পানি বাষ্পে পরিণত হয়ে মেঘের সৃষ্টি হচ্ছে এবং মেঘ থেকে বৃষ্টিরূপে আবার ভূপৃষ্ঠে আসছে। এভাবে পানির বারবার ঘুরে আসাকে পানি চক্র বলে।

পানি চক্রের গুরুত্ব

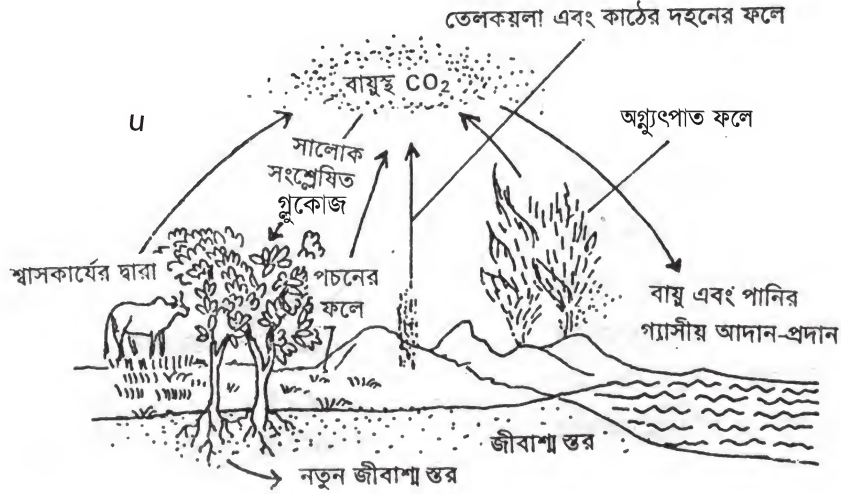
(১) পরিবেশের অন্যতম মূল উপাদান হল পানি। আবহাওয়ার উপর পানির প্রভাব অপরিমিত। বায়ুর আর্দ্রতা রক্ষার্থে পানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গাছপালার প্রস্বেদনের ফলে বায়ু আর্দ্র থাকে এবং বৃষ্টিপাত ঘটে। এতে পরিবেশে যে শুষ্ক ঠান্ডা থাকে তাই নয়, গাছপালার উৎপাদনও বেড়ে যায়। পাশাপাশি পরিবেশে পানির ভারসাম্য রক্ষা হয়।

(২) মরু অঞ্চলে গাছপালা নেই বলে সেখানে বৃষ্টিপাত খুব কম। গাছপালা নেই বলে সেখানকার পরিবেশে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি। ফলে পরিবেশ উত্তপ্ত হয়।

কার্বন চক্র

জীবদেহ গঠনে কার্বনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কোন জৈব পদার্থ কার্বন ছাড়া তৈরি হয় না। অর্থাৎ যেখানে জীবন আছে সেখানেই কার্বন আছে।

বায়ুমণ্ডলে কার্বনের প্রধান উৎস হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস। স্বাভাবিকভাবে বায়ুতে এ গ্যাসের পরিমাণ হল প্রায় ০.০৩৬%। বিভিন্ন উৎস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুতে আসে।



চিত্র ১১.২ : কার্বন চক্র

সবুজ উদ্ভিদ সরাসরি বায়ু থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে। এ সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড জৈব যৌগে পরিণত হয়, যা উদ্ভিদের দেহে জমা থাকে। কোন প্রাণী নিজে নিজে খাদ্য তৈরি করতে পারে না। প্রত্যেক প্রাণী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সবুজ উদ্ভিদের তৈরি করা খাদ্য গ্রহণ করে। অর্থাৎ কার্বন যৌগ গ্রহণ করে কার্বনের প্রয়োজন মেটায়।

জীব একাধিক পরিবেশ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড রূপে কার্বন গ্রহণ করে। অপরদিকে শ্বসনের সময় খাদ্যের কার্বন যৌগ ভেঙে কার্বন ডাইঅক্সাইড সৃষ্টি করে। এভাবে পরিবেশে কার্বন ফিরিয়ে দেয়।

মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহের কার্বন যৌগ ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক কর্তৃক বিশ্লেষিত হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড রূপে পরিবেশে ফিরে আসে। এভাবেই জীব ও পরিবেশের মধ্যে কার্বনের আদান প্রদান চলে। তাছাড়া বিভিন্ন জ্বালানি যেমন কাঠ, কয়লা, কাগজ, কেরোসিন, পেট্রোল, ডিজেল ইত্যাদির দহনেও কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয় এবং বায়ুতে ফিরে যায়। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময়ও কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে কার্বন চক্র দিয়েই প্রকৃতিতে কার্বনের ভারসাম্য রক্ষা পায়। যে প্রক্রিয়ায় জীব ও পরিবেশের মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড এর আদান প্রদানের মাধ্যমে প্রকৃতিতে কার্বনের ভারসাম্য রক্ষা পায় তাকে কার্বন চক্র বলে।

কার্বন চক্রের গুরুত্ব

(১) জীবজগৎ খাদ্যের জন্য সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। এ প্রক্রিয়াতেই সবুজ উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করে। খাদ্য তৈরিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতিতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ কমে গেলে উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করতে পারবে না। ফলে সকল জীব খাদ্যাভাবে মারা যাবে।

(২) অপরদিকে প্রকৃতিতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেলে জীবের বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না। এজন্যই প্রকৃতিতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের সমতা বজায় রাখতে কার্বন চক্রের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু একমাত্র সবুজ উদ্ভিদই খাদ্য তৈরিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে পরিবেশ সূস্থ রাখে। তাই আমাদের উচিত গাছ লাগিয়ে গাছপালার সংখ্যা বাড়ানো।

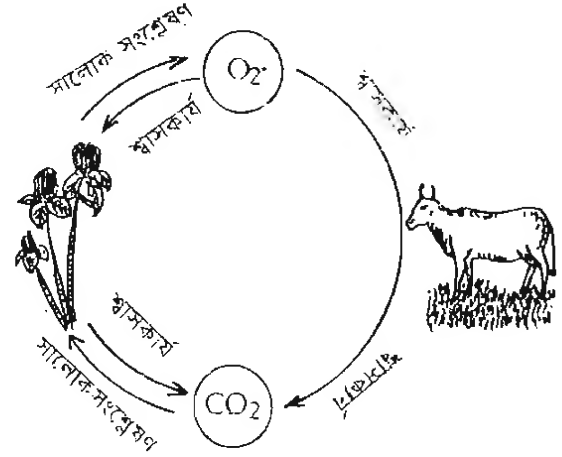
অক্সিজেন চক্র

অক্সিজেন বায়ুর একটি উপাদান। বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ শতকরা প্রায় ২১ ভাগ। পানিতেও অক্সিজেন দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। জীবের জন্য বায়ু এবং পানি উভয়ই অক্সিজেনের উৎস। জীবনধারণের জন্য অক্সিজেন অপরিহার্য। অক্সিজেন ছাড়া স্থলজ বা জলজ কোন জীবই বাঁচতে পারে না। কারণ শ্বসনের জন্য অক্সিজেন দরকার। স্থলজ উদ্ভিদ বায়ু থেকে এবং জলজ উদ্ভিদ পানি থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে শ্বাসকার্য চালায়। জীবের শ্বাসকার্য ছাড়া কোন কিছু পোড়ানোর জন্য অক্সিজেন দরকার।

নানা ধরনের ব্যবহারের ফলে মনে হয় পরিবেশে অক্সিজেন কমতে কমতে এমন দিন আসবে যখন পরিবেশে অক্সিজেনের অভাব দেখা দেবে। ফলে কোন জীব আর বাঁচতে পারবে না। আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হলেও এটা সত্য যে পরিবেশে কখনও অক্সিজেনের অভাবের সম্মুখীন হবে না কারণ পরিবেশে যেভাবে অক্সিজেনের ঘাটতি হচ্ছে ঠিক একইভাবে অক্সিজেনের এ ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থাও রয়েছে।

শ্বসনের সময় খাদ্যের সঙ্গে অক্সিজেন বিক্রিয়া করে। এর ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং পানি উৎপন্ন হয়। এরা উভয়েই অক্সিজেনের যৌগ। এ বিক্রিয়ায় মুক্ত অক্সিজেন পরিবর্তিত হয়ে অক্সিজেন যৌগে পরিণত হয় এবং পরিবেশে ফিরে যায়।

সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং পানির সাহায্যে শর্করাজাতীয় খাদ্য তৈরি করে। এতে উপজাত হিসেবে অক্সিজেন মুক্ত হয় এবং তা পরিবেশে ফিরে যায়। যেহেতু সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদ অক্সিজেন তৈরি করে তাই পরিবেশে প্রচুর পরিমাণে সবুজ উদ্ভিদ থাকা দরকার। শহরাঞ্চলে গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা উদ্ভিদের পরিমাণ কম থাকায় গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা শহরাঞ্চলে অক্সিজেনের পরিমাণ কম। তাই শহরাঞ্চলে বেশি করে গাছ লাগিয়ে বা শাকসবজি চাষ করে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা করা দরকার।



চিত্র ১১.৩ : অক্সিজেন চক্র

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে উদ্ভিদ শ্বসনের সময় অক্সিজেন গ্রহণ করে। অন্যদিকে সালোকসংশ্লেষণের সময় অক্সিজেন মুক্ত করে। এদিকে অক্সিজেন গ্রহণ এবং অন্যদিকে ত্যাগের ফলে পরিবেশে অক্সিজেনের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে। একেই অক্সিজেন চক্র বলে।

অক্সিজেন চক্রের গুরুত্ব

(১) সালোকসংশ্লেষণের জন্য পরিবেশে অক্সিজেনের সমতা বজায় থাকে।

(২) এ চক্রের মাধ্যমেই জীবের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড এর ভারসাম্য রক্ষা পায়।

সালোকসংশ্লেষণ

যাদের জীবন আছে তারাই জীব। জীব বলতে উদ্ভিদ, প্রাণী এবং অণুজীব সকলকেই বোঝায়। বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যেক জীব খাদ্য গ্রহণ করে। খাদ্য ছাড়া কোন জীব বাঁচতে পারে না। কারণ খাদ্য দেহের গঠন এবং বিভিন্ন জৈবিক কাজের জন্য শক্তি যোগায়। কোন প্রাণী নিজে খাদ্য তৈরি করতে পারে না। খাদ্যের জন্য প্রাণী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। উদ্ভিদ কিছু খাদ্যের জন্য প্রাণীর ওপর নির্ভরশীল নয়। উদ্ভিদ নিজেই নিজের খাদ্য তৈরি করতে পারে অর্থাৎ উদ্ভিদ স্বভোজী।

যে প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদ ক্লোরোফিলযুক্ত কোষে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে পানি এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড এর বিক্রিয়া ঘটিয়ে শর্করাজাতীয় খাদ্য উৎপন্ন করে এবং উপজাত হিসেবে অক্সিজেন ত্যাগ করে তাকে সালোকসংশ্লেষণ বলে।



সালোকসংশ্লেষণ পদ্ধতিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানির বিক্রিয়ার ফলে খাদ্য তৈরি হয়।

ফ্যাক্টরিতে কোন কিছু তৈরি করার জন্য যেমন কাঁচামাল সরবরাহের দরকার হয় তেমনি উদ্ভিদ দেহেও খাদ্য তৈরির জন্য দরকার কাঁচামাল সরবরাহের। উদ্ভিদ দেহে খাদ্য তৈরির জন্য যে কাঁচামালের দরকার হয় তা হল পানি এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড। পানি এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ক্লোরোফিলযুক্ত কোষে সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে শর্করাজাতীয় খাদ্য উৎপন্ন হয়। ফ্যাক্টরিতে কাঁচামাল থেকে কোন কিছু তৈরির সময় অতিরিক্ত অন্য দ্রব্যও উৎপন্ন হয়। এদের উপজাত বলে, যেমন সাবান তৈরির সময় উপজাত হিসেবে গ্লিসারিন তৈরি হয়। তেমনি সালোকসংশ্লেষণে অক্সিজেন উপজাত হিসেবে তৈরি হয়।

সবুজ উদ্ভিদ দিনের বেলায় যতক্ষণ সূর্যালোক পায় ততক্ষণ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া চালায় এবং অক্সিজেন উৎপন্ন করে পরিবেশে ত্যাগ করে। এভাবেই বায়ুতে অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। একমাত্র সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াতেই সবুজ উদ্ভিদ দিয়ে বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

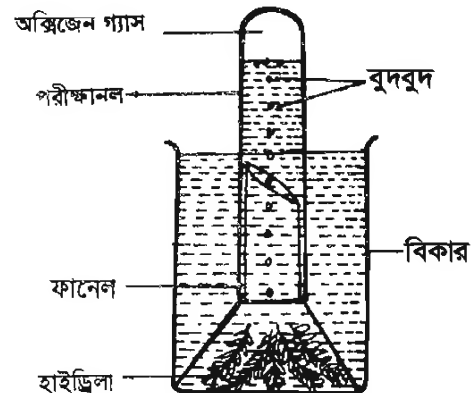
তাই বনাঞ্চলের বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড এর পরিমাণ কম থাকে। শহরাঞ্চলে গাছপালা কম থাকায় গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলের বায়ু দূষিত অর্থাৎ এখানকার বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেশি এবং অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে।

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ অক্সিজেন ত্যাগ করে

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ অক্সিজেন ত্যাগ করে। পরীক্ষাটি আমরা নিজেরাই তৈরি করতে পারি। কীভাবে পরীক্ষাটি করবো বলছি শোন।

এ পরীক্ষণের জন্য যোগাড় করতে হবে কিছু সজীব জলজ উদ্ভিদ বা উদ্ভিদের অংশ। একটা ফানেল, একটা পরখ নল, একটা বিকার এবং দেয়াশলাই। আশেপাশের পুকুর থেকেই শ্যাওলা যোগাড় করা সম্ভব।

এবার উদ্ভিদগুলো বিকারে রেখে ফানেল দিয়ে ঢেকে দেই। তারপর বিকারটিতে এমনভাবে পানি ঢালি যাতে ফানেলটির নল পানিতে ডুবে থাকে। এবার পরখ নলটি পানি পূর্ণ করে আঙুল দিয়ে চেপে ধরে ফানেলের উপর উপুড় করে রাখি। এ কাজটা কিছু খুব সাবধানে করতে হবে।



চিত্র ১১.৪ : সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের অক্সিজেন নির্গমন

যাতে পরখ নল থেকে পানি পড়ে না যায়। তারপর বিকারটিকে কিছু সময়ের জন্য সূর্যালোকে রেখে লক্ষ করি। দেখা যাবে যে, বিকার থেকে গ্যাস বেরিয়ে পরখ নলে ঢুকছে আর পরখ নলের পানি বেরিয়ে নিচে বিকারে জমা হচ্ছে। এভাবে পরখ নলটি গ্যাস দিয়ে ভর্তি হয়ে গেলে উল্টো অবস্থাতে পরখ নলটি আঙ্গুল দিয়ে চেপে মুখ বন্ধ করে বের করে এনে শিখাহীন জ্বলন্ত দিয়াশলাই এর কাঠি পরখ নলটির মুখে ধরি। দেখব কাঠিটি উজ্জ্বলভাবে জ্বলে উঠবে। পরখ নলটি অক্সিজেন গ্যাসে ভর্তি বলেই কাঠিটি এভাবে জ্বলে উঠেছে।

এভাবে উপরের পরীক্ষণ দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদ অক্সিজেন ত্যাগ করে।

সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং অক্সিজেনের ভারসাম্য রক্ষা

বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ প্রায় ২১% এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ প্রায় ০.০৩৬%। সমগ্র জীব জগৎ শ্বসনের জন্য পরিবেশ থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং পরিবেশে কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে। এতে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন এর পরিমাণ কমে যায় এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়। এতে মনে হয় যে অতি শীঘ্রই পরিবেশে অক্সিজেন শেষ হয়ে যাবে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিবেশ ভরে যাবে। তা কিন্তু হয় না। এর কারণ হল সকল সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় পরিবেশ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। এভাবে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবেশে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড এর ভারসাম্য বজায় থাকে।

শ্বসন

জীবদেহে বিভিন্ন জৈবিক কাজ সম্পাদনের জন্য শক্তির দরকার। জীবদেহে প্রতিনিয়ত যে সব জৈবিক কাজ চলে যেমন নতুন কোষ তৈরি, দেহের বিভিন্ন অঙ্গে খাদ্য পৌঁছানো, উদ্ভিদে ফুল ও বীজ উৎপাদন ইত্যাদি কার্যক্রমে শক্তির দরকার। জীব এ শক্তি পায় শর্করাজাতীয় খাদ্য থেকে। সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এ খাদ্য তৈরি করে।

সব শক্তির উৎস সূর্য। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদ যখন শর্করাজাতীয় খাদ্য তৈরি করে তখন সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত হয়ে স্থিতি শক্তিরূপে খাদ্যে জমা হয়।

কোষে খাদ্যের সাথে অক্সিজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। এর ফলে খাদ্যে সঞ্চিত স্থিতি শক্তি জৈবিক কাজের উপযোগী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এ প্রক্রিয়াকে শ্বসন বলে। অন্যভাবে বলা যায় যে, কোষের খাদ্যবস্তুর জারণের ফলে কাজ করার উপযোগী শক্তি উৎপন্ন করার প্রক্রিয়াকে শ্বসন বলে।

শ্বসনের মাধ্যমে উৎপন্ন শক্তি দিয়ে দেহের সকল কাজ সম্পন্ন হয়

শখ করে তুমি টবে একটা গাছ লাগালে। এরপর দরকার হবে এর যত্ন করা, যেমন ঠিকমত পানি দেওয়া এবং সূর্যালোকে রাখা। পানি বা সূর্যালোক এর যে কোন একটির অভাব হলে গাছ খাদ্য তৈরি করতে পারবে না এবং খাদ্যের অভাবে মরে যাবে।

কোনো মানুষ যদি দিনের পর দিন না খেয়ে থাকে তাহলে আস্তে আস্তে সে নিস্বেজ হয়ে পড়বে। চলন ক্ষমতা পর্যন্ত তার থাকবে না। এভাবে দীর্ঘদিন চললে আস্তে আস্তে সে মারা যাবে।

এ থেকে বোঝা যায় যে খাদ্য ছাড়া কোন জীব বাঁচতে পারে না। কারণ খাদ্য ছাড়া দেহের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপন্ন হয় না।

শ্বসন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষে খাদ্যের সাথে অক্সিজেন মিলিত হয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়। এ বিক্রিয়ার ফলে অর্থাৎ শ্বসনের মাধ্যমে খাদ্য থেকে কাজের উপযোগী শক্তি উৎপন্ন হয়। এ শক্তি জীবদেহের যাবতীয় কাজ চালায়।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর পরস্পর নির্ভরশীলতা

উদ্ভিদ ও প্রাণী মিলেই জীবজগৎ। জীবনধারণের জন্য এরা একে অন্যের সাহায্য ছাড়া বাঁচতে পারে না। এদের জীবনযাত্রা পৃথক বলে মনে হলেও বেঁচে থাকার তাগিদে এরা একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল:

(১) উদ্ভিদ কোষে ক্লোরোফিল নামক এক প্রকার সবুজ কণিকা থাকে যা খাদ্য তৈরিতে একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করতে পারে। কিন্তু প্রাণী কোষে ক্লোরোফিল থাকে না বলে কোন প্রাণী খাদ্য তৈরি করতে পারে না। সকল প্রাণী সরাসরি খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল। কোন প্রাণী প্রত্যক্ষভাবে খাদ্য হিসেবে উদ্ভিদ ভক্ষণ করে আবার কোন প্রাণী পরোক্ষভাবে উদ্ভিদ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে। কোনো কোনো পতঙ্গাভুক উদ্ভিদ যেমন কলস উদ্ভিদ আমিষ জাতীয় খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য কীটপতঙ্গের উপর নির্ভরশীল।

(২) উদ্ভিদ ও প্রাণী অক্সিজেন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের জন্য পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। উদ্ভিদ ও প্রাণী শ্বসনের সময় অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে। সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বায়ু থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। এভাবে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের সমতা রক্ষায় উদ্ভিদ ও প্রাণী পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

(৩) প্রাণীর মলমূত্র, দেহাবশেষ ইত্যাদি মাটিতে মিশে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে যা উদ্ভিদের জন্য দরকার।

(৪) কোনো কোনো উদ্ভিদের পরাগায়ন কীটপতঙ্গের ওপর নির্ভরশীল। জীবন ধারণের জন্য কীটপতঙ্গ মধুর সন্ধানে যখন ফুলে ফুলে বিচরণ করে, তখনই পরাগায়ণ ঘটে। কোনো কোনো ফুলে পাখির সাহায্যে পরাগায়ণ ঘটে।

(৫) মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণী পাকা ও মিষ্টি ফল খাওয়ার জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায় এবং খেয়ে বীজগুলো ফেলে দেয়। এভাবে প্রাণীরা বীজের বিস্তারণে সাহায্য করে। আবার অনেক ক্ষেত্রে কোনো কোনো ফলের বীজ পাকস্থলিতে হজম না হয়ে প্রাণীর মলের সাথে বেরিয়ে যায়। এভাবে প্রাণীর মাধ্যমেও বীজের বিস্তারণ ঘটে।

(৬) আম, লিচু ইত্যাদি গাছে লাল পিঁপড়া বাসা তৈরি করে বাস করে। এরা ঐ গাছের ফলের রস খেয়ে বেঁচে থাকে এবং গাছকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

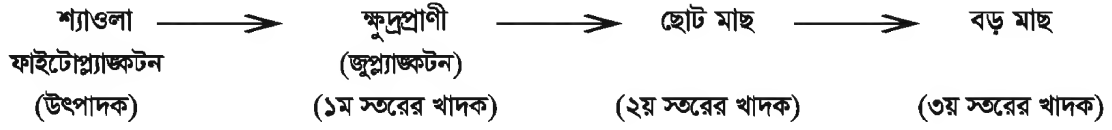
উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, উদ্ভিদ ও প্রাণী জীবনধারণের জন্য একে অন্যের উপর নির্ভরশীল।

খাদ্য শৃঙ্খল

পৃথিবীতে বিভিন্ন জীব একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। কেউ এককভাবে বাঁচতে পারে না। শক্তির কথাই ধরা যাক। বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটি জীবনে যত রকম কাজ করতে হয় তার প্রতিটির জন্যই প্রয়োজন হয় শক্তির। এ শক্তি আসে খাদ্য থেকে। কিন্তু সব জীবই তাদের নিজের জন্য খাদ্য উৎপাদন করতে পারে না। এরা অন্য প্রাণী বা উদ্ভিদ থেকে জীবনধারণ করে। এদের খাদক বলে। এভাবে এক একটি পরিবেশে শক্তির জন্য একদল প্রাণী অপর দলের উপর নির্ভরশীল। একটি পুকুর এবং সেখানে বসবাসকারী বিভিন্ন জীবের মধ্যে খাদ্য খাদক সম্পর্ক আলোচনা করা যাক।

পুকুরে ভাসমান ছোট ছোট শ্যাওলা জন্মে। এদের বলে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন। এরা সবুজ, তাই সূর্যের আলোতে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য উৎপাদন করতে পারে। যা কোনো প্রাণী পারে না। এদের বলে উৎপাদক। এ সব উৎপাদকদের আবার খুবই ছোট প্রাণীরা খায়। এ সব প্রাণীরাও ভাসমান। এদের বলে জুপ্ল্যাঙ্কটন। এ সব প্রাণী যারা উৎপাদকদের খায়, তাদের বলে প্রথম স্তরের খাদক। এদের আবার খায় ছোট ছোট মাছ বা কোনো কীটপতঙ্গ। প্রথম স্তরের খাদকদের যারা খায় তাদের বলে দ্বিতীয় স্তরের খাদক। আবার এদের যারা খায় তাদের বলে তৃতীয় স্তরের খাদক। এ ভাবে এক একটি পরিবেশে উৎপাদক থেকে শুরু করে সর্বশেষ খাদক স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন জীবের (খাদ্য ও খাদক)

মধ্যে উৎপাদক কর্তৃক সংগৃহীত শক্তি প্রবাহের ধারাকে বলে খাদ্য শৃঙ্খল। অর্থাৎ



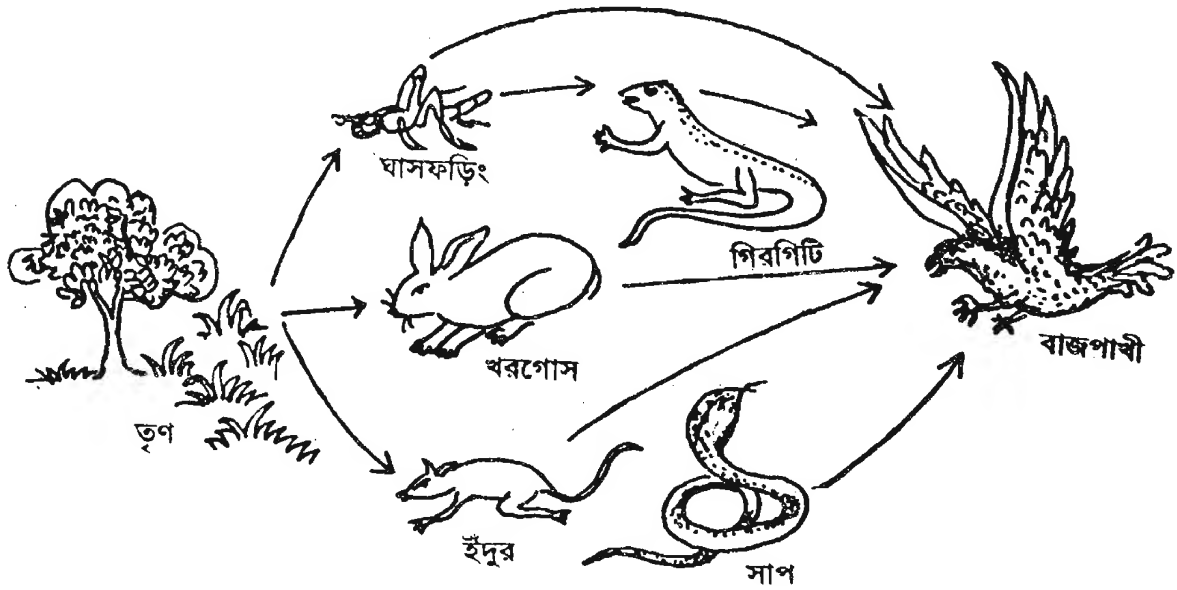
উৎপাদক সৌরশক্তির যে অংশ সংগ্রহ করে, প্রতিটি খাদক স্তরে তার ৮০-৯০% কমে যায়। তাই একটি পুকুরে যে পরিমাণ তৃণভোজী মাছ (বুই, কাতলা, মৃগেল, বোয়াল ইত্যাদি) উৎপন্ন হবে মাংসাশী মাছ (শিং, মাগুর) তার থেকে অনেক কম উৎপন্ন হয়।

এখানে স্থলজ পরিবেশের একটি সহজ খাদ্য শৃঙ্খলের উল্লেখ করা হল।

ধানগাছ → ঘাস ফড়িং বা পামরি পোকা → ব্যাঙ → সাপ → বাজ পাখি।

খাদ্য জাল

জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক প্রকারের খাদ্য শৃঙ্খল দেখা যায়। এ খাদ্য শৃঙ্খলগুলো বিভিন্ন প্রাণী দিয়ে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত। এ খাদ্য শৃঙ্খলগুলোই মিলিতভাবে তৈরি করে একটি খাদ্য জাল। অর্থাৎ কোন জীব সম্প্রদায়ে যে সমস্ত খাদ্য শৃঙ্খল থাকে সেগুলো মিলিতভাবে একটি খাদ্য জাল সৃষ্টি করে।

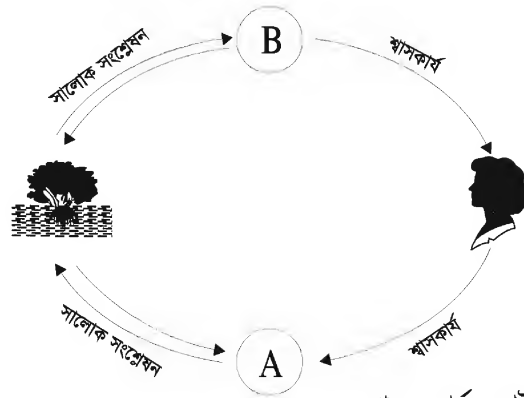


চিত্র ১১.৬ : খাদ্য জাল

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আমাদের দেহকোষের প্রায় শতকরা কত অংশ পানি ?
 ক. ৬০%
 গ. ৭০%
 খ. ৬৫%
 ঘ. ৮০%
২. বায়ুর আর্দ্রতা রক্ষায় কোনটি গুরুত্বপূর্ণ ?
 ক. বায়ু প্রবাহ
 গ. সূর্যালোক
 খ. পানি
 ঘ. বায়ু চাপ
৩. কোন জাতীয় খাদ্য উপাদান থেকে জীব শক্তি পায় ?
 ক. আমিষ
 গ. লবণ
 খ. শর্করা
 ঘ. ভিটামিন
৪. একটি পুকুরে ২য় স্তরের খাদক হচ্ছে
 ক. মাগুর মাছ
 গ. মলা মাছ
 খ. ফাইটোপ্লাঙ্কটন
 ঘ. জুপ্ল্যাঙ্কটন
৫. খাদকের ধাপ যত বেশি হবে শক্তি তত
 ক. বেড়ে যাবে
 গ. সমান থাকবে
 খ. কমে যাবে
 ঘ. সামান্য বেড়ে যাবে
৬. নিচের চিত্রে 'A' চিহ্নিত গ্যাসটির নাম কী ?



- ক. অক্সিজেন
 গ. কার্বন মনোঅক্সাইড
 খ. কার্বন ডাইঅক্সাইড
 ঘ. ওজোন
৭. ফাইটোপ্লাঙ্কটন ও জুপ্ল্যাঙ্কটন
 i. পুকুরে ভাসমান থাকে
 ii. খাদ্য উৎপাদন করে
 iii. প্রথম স্তরের খাদক

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i
 গ. iii
 খ. ii
 ঘ. i ও ii

দ্বাদশ অধ্যায়

মেৰুদণ্ডী প্ৰাণীৰ পৰিচিতি ও বৈশিষ্ট্য

বেঁচে থাকার জন্য দরকার খাদ্য। খাদ্যের ছয়টি উপাদানের মধ্যে প্রধান উপাদান হল আমিষ। দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধির জন্য দরকার আমিষ। আমিষের অন্যতম প্রধান উৎস হচ্ছে মাছ। আমিষ ছাড়া মাছে আরো রয়েছে খনিজ লবণ এবং ভিটামিন।

পৃথিবীতে মানুষের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় আমিষের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ আসে মাছ থেকে। বহু আগে থেকেই আমাদের দেশের মানুষ আমিষের প্রধান উৎস হিসেবে মাছ খেয়ে আসছে। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের শতকরা ৮০ ভাগ আমিষের চাহিদা পূরণ হয় মাছ থেকে। নদীমাতৃক বাংলাদেশে মাছ শুধু সহজলভ্যই নয়, অন্য প্রাণিজ আমিষের তুলনায় সহজ পাচ্য এবং দামেও সস্তা।

মাছ একটি জলজ মেৰুদণ্ডী প্ৰাণী। পুকুর দিঘি, ডোবা নালা, খাল বিল, হাওড় বাঁওড়, নদী নালা, সমুদ্র ইত্যাদি জলাশয় থেকে মাছ পাওয়া যায়।

মাছ একটি মেৰুদণ্ডী প্ৰাণী

মেৰুদণ্ডী প্ৰাণীৰ নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো মাছে রয়েছে বলে মাছ একটি মেৰুদণ্ডী প্ৰাণী।

- ১) মাছের মেৰুদণ্ড আছে।
- ২) মাছের দেহ আঁইশ দিয়ে আবৃত।
- ৩) বিভিন্ন পাখনা রয়েছে যা দিয়ে পানিতে সাঁতার কাটতে পারে।
- ৪) শ্বসনের জন্য ফুলকা রয়েছে।
- ৫) মাছের দেহে পায়ুর পিছনে মাংসল লেজ আছে।

ৰুই মাছের বহিঃ অঙ্গসংস্থান

মাছের মধ্যে ৰুই সবচেয়ে পরিচিত মাছ। ৰুই মাছ আঁইশ বিশিষ্ট। এদের মেৰুদণ্ড আছে। এরা তৃণভোজী এবং মিঠা পানিতে বাস করে। এ দেশের নদী নালা, খাল বিল, হাওড় বাঁওড়, পুকুর ইত্যাদি জলাশয়ে প্রচুর ৰুই মাছ পাওয়া যায়। ৰুই মাছ পানির মধ্যস্তরে বাস করে। শ্যাওলা, পচা পাতা ইত্যাদি এদের প্রিয় খাদ্য।

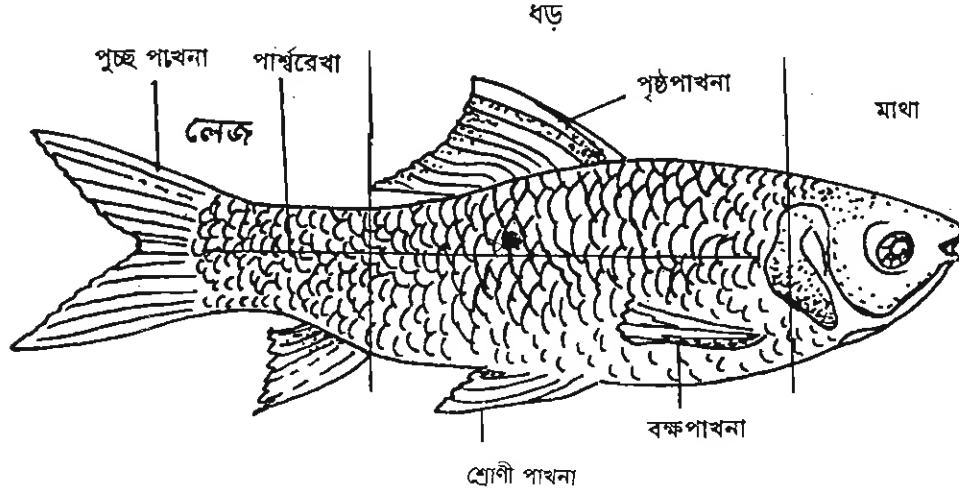
বাহ্যিক গঠন

আকার ও রং : ৰুই মাছের দেহ লম্বাটে এবং দুপাশ চাপা। বলা চলে কতকটা পটলের ন্যায় অর্থাৎ দেহের মাঝখানটা মাথা ও লেজের তুলনায় মোটা। পেটের দিক রূপালি সাদা এবং পিঠ ও পিঠের কাছাকাছি অংশ কালচে বাদামি রঙের। পাখনাগুলো লালচে রঙের। ৰুই মাছ এক মিটারের মতো লম্বা হয়ে থাকে। ৰুই মাছের দেহ প্রধান তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা : মাথা, ধড় ও লেজ।

মাথা : ৰুই মাছের মাথা ধড়ের তুলনায় ছোট। মাথার সামনের দিকের সামান্য নিচে এর মুখ অবস্থিত। মুখের উপরে ও নিচে দুটো পুরু ঠোঁট। ৰুই মাছের উপরের ঠোঁটে এক জোড়া বার্বেল থাকে। মুখের পিছনভাগে উপরের দিকে রয়েছে দুইটি ছিদ্র। এদের নাসারন্ধ্র বলে। প্রতিটি নাসারন্ধ্রের পেছনে রয়েছে একটি করে চোখ। চোখের আকৃতি গোলাকার। মুখের পরবর্তী অংশ অর্থাৎ মাথার শেষ ভাগের দুই পাশে রয়েছে দুইটি অর্ধ চন্দ্রাকার কানকো। প্রতিটি কানকের নিচে থাকে ৪টি করে চিবুনির মতো ফুলকা।

ধড় : কানকোর পর থেকে শুরু করে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত অংশকে ধড় বলে। বুই মাছের দেহের এ অংশ মাথা ও লেজের তুলনায় মোটা। ধড়ের শেষ অংশের নিচের দিকে একটা সামান্য ফোলা অংশ থাকে। এখানেই রয়েছে বুই মাছের পায়ু।

লেজ : পায়ুর পর থেকে দেহের শেষ প্রান্ত অর্থাৎ ধড়ের পেছনের দিকে দেহের বাকি অংশকে লেজ বলে। লেজটি দুই পাশে চাপা।



চিত্র ১২.১ : বুই মাছের বাহ্যিক গঠন

আঁইশ : বুই মাছের দেহ আঁইশ দিয়ে ঢাকা। আঁইশগুলো মসৃণ এবং আকৃতি প্রায় গোলাকার। মাথা ও পাখনাতে আঁইশ থাকে না। আঁইশগুলো সারি বেধে সুন্দরভাবে একটির পর একটি এমনভাবে সাজানো থাকে যেন একটি আঁইশ তার পেছনের আঁইশটির সামান্য অংশ ঢেকে রাখে। দেহ থেকে নিঃসৃত পিচ্ছিল শ্লেষ্মা আত্মরক্ষায় সাহায্য করে।

পার্শ্ব রেখা : বুই মাছের দেহের দুপাশ বরাবর প্রতি পার্শ্বে একটি করে, মোট দুটো পার্শ্ব রেখা থাকে। এ পার্শ্ব রেখা দুই মাছকে পানিতে দেহের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

পাখনা : বুই মাছের দেহে দুই জোড়া যুগ্ম পাখনা এবং তিনটি বেজোড় পাখনা মিলে মোট সাতখানা পাখনা থাকে।

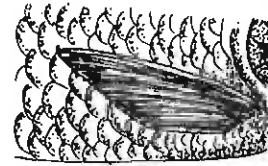
যুগ্ম পাখনা : যুগ্ম পাখনা দুইটি হচ্ছে (ক) এক জোড়া বক্ষ পাখনা এবং (খ) এক জোড়া শ্রোণী পাখনা।

(ক) বক্ষ পাখনা : এ পাখনা দুই কানকোর পেছনে দেহের দুই ধারে অবস্থিত। এতে অনেকগুলো পাখনা রশ্মি থাকে। পাখনা রশ্মি দেখতে অনেকটা কাঠির মতো।

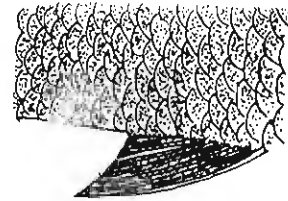
(খ) শ্রোণী পাখনা : দ্বিতীয় যুগ্ম পাখনার নাম শ্রোণী পাখনা। এরা পায়ুর একটু সামনে এবং বক্ষ পাখনার পেছনে থাকে। এ পাখনাতেও পাখনা রশ্মি আছে।

বেজোড় পাখনা : বেজোড় পাখনা তিনটি হচ্ছে (ক) পৃষ্ঠ পাখনা, (খ) পায়ু পাখনা এবং (গ) পুচ্ছ পাখনা।

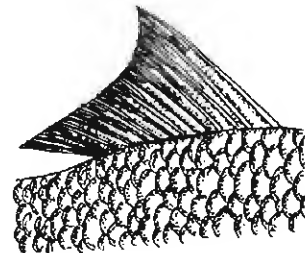
(ক) পৃষ্ঠ পাখনা : মাথার পেছন পিঠের দিকে ধড়ের মাঝামাঝি পৃষ্ঠ পাখনা অবস্থিত। পাখনাটি বেশ বড় এবং দেখতে তিনকোণা। এতে অনেকগুলো পাখনা রশ্মি আছে।



চিত্র ১২.২ : বক্ষ পাখনা



চিত্র ১২.৩ : শ্রোণী পাখনা

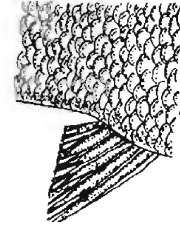


চিত্র ১২.৪ : পৃষ্ঠ পাখনা

(খ) পায়ু পাখনা : পায়ুর পেছনে পেটের দিকে পায়ু পাখনার অবস্থান। এতে অল্প সংখ্যক পাখনা রশ্মি আছে।

(গ) পুচ্ছ পাখনা : এটি তৃতীয় বেজোড় পাখনা। লেজের শেষ প্রান্তে এর অবস্থান। উপরে ও নিচে সমান ভাগে বিভক্ত। এতে অনেকগুলো পাখনা রশ্মি থাকে।

পাখনার কাজ : পাখনার সাহায্যে বুই মাছ পানিতে চলাচল ও দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে।



চিত্র ১২.৫ : পায়ু পাখনা



চিত্র ১২.৬ : পুচ্ছ পাখনা

খাদ্য হিসেবে মাছের প্রয়োজনীয়তা

(১) প্রোটিনের উৎস : দেহের ক্ষয় পূরণ ও গঠনের জন্য আমিষ গুরুত্বপূর্ণ। মাছ প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস। মাছ সহজ পাচ্য। এতে রয়েছে লবণ ও ভিটামিন। মাছের আর একটি বাড়তি সুবিধা হচ্ছে মাছ রোদে শুকিয়ে শুটকি করে অনেক দিন পর খাওয়া যায়। লবণ দিয়ে মাছ সংরক্ষণ করেও অনেক দিন পর খাওয়া যায়।

(২) রোগীর পথ্য : বিভিন্ন মাছ যথা : পাবদা, ট্যাংরা, শিং, মাগুর ইত্যাদি মাছ রোগীর পথ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এসব মাছ সহজে হজম হয় এবং দ্রুত দেহের শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে।

(৩) ভিটামিনের উৎস : হাড়ের যকৃৎ থেকে প্রাপ্ত তেলে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন এ ও ডি বিদ্যমান। এ তেল শিশুদের দাঁত ও হাড়ের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

(৪) খনিজ উপাদানের উৎস : মাছে প্রচুর খনিজ উপাদান থাকে যা হাড়ের গঠন ও দৃষ্টি শক্তি বাড়াতে সহায়তা করে। ছোট মাছের কাঁটা দেহে ক্যালসিয়ামের অভাব দূর করে।

(৫) সুপ তৈরিতে : চীন ও ফিলিপাইনে হাঙর মাছের পাখনা দিয়ে সুপ তৈরি হয়। এ সুপ সে সব দেশে উপাদেয় খাদ্য হিসেবে আদৃত।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মাছের অবদান

নদী মাতৃক দেশ বাংলাদেশ। এ দেশের অর্থনীতিতে মাছের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

আমাদের জাতীয় আয়ের শতকরা চারভাগ এবং রপ্তানি আয়ের প্রায় এগার ভাগ আসে মাছ সম্পদ থেকে। শুধু খাদ্য হিসেবেই নয় আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং বেকার সমস্যা সমাধানে মাছ একটি বিরাট ভূমিকা পালন করে। এছাড়া মাছ চাষ আমাদের বিরাট জনগোষ্ঠীর একটা অংশে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সাহায্য করে।

(১) বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন : বিশ্বব্যাপী মাছের চাহিদা প্রচুর রয়েছে। আমাদের দেশে মাছ চাষের উপযোগী যে পরিমাণ জলাশয় রয়েছে সে সমস্ত জলাশয় এবং হাজা মজা পুকুর সংস্কার করে মাছ চাষের ব্যবস্থা করলে মাছের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। ফলে আমাদের খাদ্য তালিকায় মাছের চাহিদা মেটানোর পর মাছ বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব হবে। এতে দেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে। এছাড়া বড় মাছের আইশ দিয়ে তৈরি শৌখিন জিনিস বিদেশে রপ্তানি করেও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

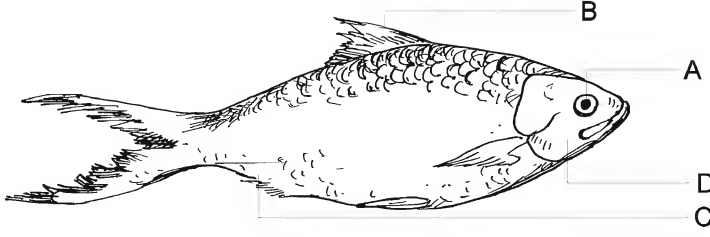
- (২) গৃহপালিত পশুপাখির খাদ্য : মাছের আইশ, পাখনা, নাড়ি ভুঁড়ি ইত্যাদি গৃহপালিত পশুপাখির উত্তম খাবার। মাছ শুকিয়ে যে গুঁড়ো তৈরি করা হয় মাছের সে শুকনো গুঁড়ো হাঁস মুরগির পুষ্টিকর খাবার।
- (৩) ক্ষেতের সার : কোনো কোনো ফসলের ক্ষেত্রে মাছের গুঁড়ো সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- (৪) মশা দমনে : কই, ভেদা, ফলি, গাম্পি ইত্যাদি মাছ আবদ্ধ পানিতে মশার মুককীট (লার্ভা) ও শূককীট (পিউপা) খেয়ে মশা দমনে সহায়তা করে।
- (৫) চাবুক তৈরি : শঙ্কর মাছের লেজ দিয়ে চাবুক তৈরি করা হয়।
- (৬) জুতা তৈরি : হাঙর মাছের চামড়া জুতা ও ব্যাগ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। শিরীষ কাগজ হিসেবেও হাঙরের চামড়া ব্যবহৃত হয়।
- (৭) শখ : অনেকে শখ করে রঙিন মাছ অ্যাকুরিয়ামে পুষে থাকেন। এতে মনের খোরাকের পাশাপাশি ঘরের সৌন্দর্যও বাড়ে।
- (৮) অবসর সময় কাটান : অনেকে বড়শি দিয়ে মাছ ধরে অবসর সময় কাটান।
- (৯) সাবান তৈরি : কোনো কোনো মাছ থেকে সংগৃহীত তেল সাবান তৈরির উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
- (১০) কর্মসংস্থান : মাছ চাষ থেকে শুরু করে মাছ শিকার, মাছ ধরার জাল ও যন্ত্রপাতি তৈরি করে বিক্রয়, মাছ বাজারজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং রপ্তানিকরণে বহুলোক কাজ করার সুযোগ পায়। এতে বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- কোন মাছ পানির মধ্যস্তরে বাস করে ?
ক. কাতল
খ. বুই
গ. মৃগেল
ঘ. কালিবাউস
- বুই মাছের কানকো কোন প্রকৃতির হয় ?
ক. গোলাকার
খ. ডিম্বাকার
গ. চন্দ্রাকার
ঘ. অর্ধচন্দ্রাকার
- হাঙ্গারের যকৃৎ থেকে প্রাপ্ত তেলে কোন ভিটামিন পাওয়া যায় ?
ক. এ
খ. বি
গ. সি
ঘ. ই
- চীন ও ফিলিপাইনে সুপ তৈরিতে কোন মাছের পাখনা ব্যবহৃত হয় ?
ক. কোরাল
খ. ইলিশ
গ. হাঙ্গার
ঘ. রিঠা
- বুই মাছের মাথা ধড়ের তুলনায় কী রূপ ?
ক. বড়
খ. সামান্য বড়
গ. সমান
ঘ. ছোট

৬. নিচের চিত্রের কোন অংশটি মাছের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে?



ক. A
গ. C

খ. B
ঘ. D

৭. রুই মাছের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

- পানির উপরের স্তরে বাস করে।
- বেজোড় পাখনা তিনটি।
- ফুলকার সংখ্যা আটটি।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
গ. ii ও iii

খ. ii
ঘ. i, ii ও iii

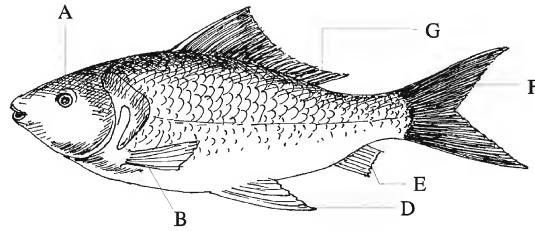
৮. মলা মাছের কাটায় বেশি পরিমাণে থাকে

ক. ভিটামিন এ
গ. ক্যালসিয়াম

খ. ভিটামিন ডি
ঘ. ফসফরাস

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.



- চিত্রের মাছটি কোন পানিতে বাস করে ?
- চিত্রের মাছটির A অংশের কাজ ব্যাখ্যা কর।
- তোমার পরিচিত ঐ মাছটির মতো একই শ্রেণীভুক্ত একটি মাছের চিত্র অংকন করে B, C ও F অংশ চিহ্নিত কর।
- একটি পুকুরের বাস্তুতন্ত্রে এ মাছটির ভূমিকা বর্ণনা কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আলো

তুমি যে এ বইটি পড়ছো, আলো না থাকলে কি তা পারতে? পারতে না। শুধু বই কেন আলো না থাকলে এ বিশ্বজগতের কোনো কিছুই আমরা দেখতে পেতাম না। কিন্তু আলো কি দেখা যায়? তোমার চার পাশে চেয়ে দেখ। চেয়ার, টেবিল, ঘরবাড়ি, গাছপালা বা অন্য কিছু তোমার চোখে পড়ছে। কিন্তু আলো নামে কোন কিছু কি তুমি দেখতে পাবে? পাবে না। কারণ আলো দেখা যায় না। আলোর সৌন্দর্য এখানেই যে আলো বস্তুকে দৃশ্যমান করে, কিন্তু নিজে অদৃশ্য। আমরা আলোকিত বস্তুকে দেখি, আলো দেখি না। আমরা কোনো বস্তুকে শুধু তখনই দেখতে পাই যখন বস্তুটি থেকে আলো আমাদের চোখে এসে পড়ে। আলো আমাদের চোখের ভেতরে প্রবেশ করলে স্নায়ুর মাধ্যমে খবরটি পৌঁছে যায় মস্তিষ্কে। তখন আমাদের সেই বস্তুটি দেখার অনুভূতি জাগে, অর্থাৎ আমরা বস্তুটি দেখতে পাই।

তোমরা আগেই জেনেছ, আলো শক্তির একটি রূপ। আলো শক্তির সেই রূপ যা আমাদের চোখে প্রবেশ করে দর্শনের অনুভূতি জাগায়।

আলোর প্রধান উৎস হচ্ছে সূর্য। দিনের বেলায় আমরা সূর্য থেকে আলো পাই। সূর্য আলোর প্রাকৃতিক উৎস। রাতের বেলায় আমরা আলো পাই বৈদ্যুতিক বাল্ব, মোমবাতির শিখা, হারিকেনের বাতি ইত্যাদি থেকে। এগুলো মানুষের তৈরি আলোর উৎস।

সূর্য থেকে পৃথিবীতে কিসের মধ্য দিয়ে আলো আসে? তৃতীয় অধ্যায়ে তোমরা জেনেছ বায়ুমণ্ডলের উপরে রয়েছে মহাশূন্য। সুতরাং সূর্য থেকে আলো এ মহাশূন্যের মধ্য দিয়েই আসে। অর্থাৎ আলো চলাচলের জন্য কোনো মাধ্যম প্রয়োজন হয় না। আলো শূন্যের মধ্য দিয়ে চলাচল করতে পারে। আবার কোনো কোনো পদার্থের মধ্য দিয়েও আলো চলাচল করতে পারে। যেমন সূর্যের আলো বায়ুমণ্ডল ভেদ করে পৃথিবী পৃষ্ঠে পৌঁছায়। কাচ বা পানির মধ্য দিয়েও আলো চলাচল করতে পারে। বায়ু, কাচ, পানি ইত্যাদি যে সকল মাধ্যম দিয়ে আলো সহজে চলাচল করতে পারে তাদের স্বচ্ছ মাধ্যম বলে। আবার কিছু কিছু পদার্থের মধ্য দিয়ে আলো চলাচল করতে পারে না। এদের অস্বচ্ছ মাধ্যম বলে। যেমন কাঠ, লোহা, ইট, কাগজ ইত্যাদি। এক টুকরো সাদা কাগজ নিয়ে মাঝখানে এক ফোঁটা তেল দিয়ে ভেজাও। এবার কাগজের টুকরোটি আলোর সামনে ধরলে দেখবে যে তৈলাক্ত স্থান দিয়ে কিছুটা আলো আসছে। এ ধরনের বস্তু যার মধ্য দিয়ে আলো আংশিক চলাচল করতে পারে তাদের ঈষদচ্ছ মাধ্যম বলে। একটি স্বচ্ছ কাচকে ঘষলে তা ঈষদচ্ছ হবে। স্বচ্ছ মাধ্যমে আলো সরল রেখায় চলে। আলোর এ সরল রৈখিক গথকে আলোক রশ্মি বলে।

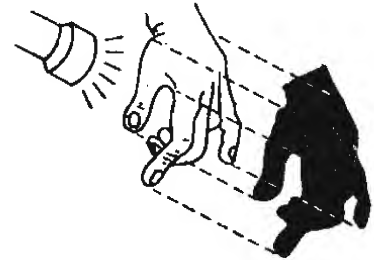
ছায়া, প্রচ্ছায়া, উপচ্ছায়া

যে কোনো আলোর উৎসের যেমন টর্চবাতি, মোমবাতি, বৈদ্যুতিক বাতির সামনে তোমার হাতটি ধর। পেছনে একটি সাদা কাগজ ধরলে দেখবে কাগজের কিছুটা অংশ অন্ধকারাচ্ছন্ন বা কালো। এ কালো অঞ্চলের আকার তোমার হাতের আকারের মতোই। বলা হয় কাগজের উপর তোমার হাতের ছায়া পড়েছে।

ছায়া পড়ে কারণ

- ১) আলো অস্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়ে যেতে পারে না।
- ২) আলো স্বচ্ছ মাধ্যমে সরল রেখায় চলে এবং
- ৩) আলোক রশ্মি অস্বচ্ছ পদার্থের কিনারা ঘেঁষে বাকতে পারে না।

তোমার হাত অস্বচ্ছ বস্তু। তাই আলো হাত ভেদ করে যেতে পারে না। আবার আলো সরল রেখায় চলে এবং হাতের কিনারা ঘেঁষে বেকে যেতে পারে না।



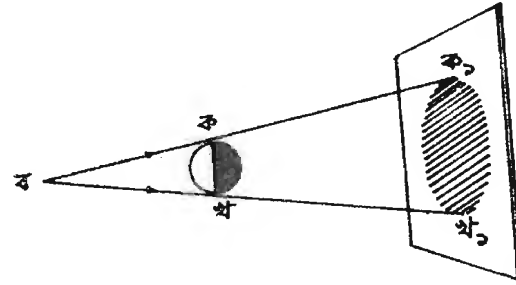
চিত্র ১৩.১ : ছায়া

সুতরাং আলো হাতের পেছনের অংশে গিয়ে পৌঁছাতে পারে না। ফলে হাতের পেছনে হাতের আকারের অন্ধকারময় স্থানের সৃষ্টি হয়, একে হাতের ছায়া বলে। সাধারণভাবে আলোর সামনে কোন অস্বচ্ছ বস্তু থাকলে বস্তুটির পেছনের কিছুটা অঞ্চলে আলো যেতে পারে না। ফলে সেই অঞ্চলটি অন্ধকার বা কালো দেখায়। অস্বচ্ছ বস্তুর পেছনে সৃষ্ট এ অন্ধকার বা কালো অঞ্চলকে বস্তুটির ছায়া বলে।

অস্বচ্ছ বস্তুর যে ছায়া পড়ে এবং ছায়ার পরিসীমা বস্তুর পরিসীমার অনুরূপ তা থেকে প্রমাণিত হয় যে আলো সরল রেখায় চলে।

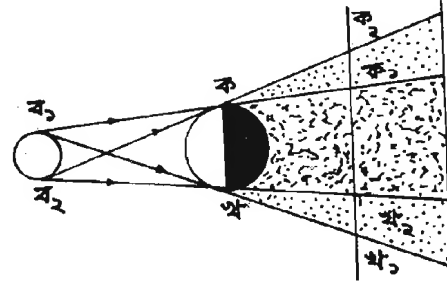
ছায়া দুই ধরনের প্রচ্ছায়া এবং উপচ্ছায়া। তুমি একটি অতি ক্ষুদ্র অর্থাৎ বিন্দু আলোক উৎসের সামনে একটি গোলাকার অস্বচ্ছ বস্তু যেমন ফুটবল রাখো। পেছনে একটি সাদা পর্দা রাখলে তার উপর গোলাকার গাঢ় কালো ছায়া পড়বে। এ ছায়াকে প্রচ্ছায়া বলে (চিত্র ১৩.২)। ব বিন্দু উৎস

থেকে ব ক আলোক রশ্মি ফুটবলের ক কিনারা ঘেঁষে পর্দার k_1 বিন্দুতে পড়ে। অনুরূপে, ব খ রশ্মি ফুটবলের খ কিনারা ঘেঁষে পর্দার x_1 বিন্দুতে পড়ে। বলটি অস্বচ্ছ। তাই ব ক এবং ব খ এর মধ্যবর্তী রশ্মিগুলো বল ভেদ করে পর্দায় পৌঁছাতে পারে না। অর্থাৎ পর্দার k_1x_1 এর মাঝের অংশে কোনো আলোক রশ্মি এসে পড়তে পারে না। তাই এ অংশটি থাকে সম্পূর্ণ অন্ধকার। পর্দার উপর সৃষ্ট এ গোলাকার গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন বা কালো অঞ্চলকে ফুটবলের প্রচ্ছায়া বলে।



চিত্র ১৩.২ : প্রচ্ছায়া

আলোক উৎস সাধারণত বিন্দু হয় না, কিছুটা বড় হয়। যেমন বৈদ্যুতিক বাল্ব, মোমবাতি বা সূর্য। চিত্র ১৩.৩ এ ধরনের একটি উৎস দেখানো হয়েছে। আলোক উৎসটি B_1 থেকে B_2 পর্যন্ত বিস্তৃত। তাই এ ধরনের উৎসকে আলোর বিস্তৃত উৎস বলে। এ উৎসকে অসংখ্য বিন্দু উৎস হিসেবে ধরা যায়। B_1 বিন্দু থেকে B_1K আলোক রশ্মি ফুটবলের ক কিনারা ঘেঁষে পর্দায় k_1 বিন্দুতে পড়ে। B_2K আলোক রশ্মি পর্দায় x_1 বিন্দুতে পড়ে।



চিত্র ১৩.৩ : উপচ্ছায়া

অর্থাৎ B_1 বিন্দু থেকে নির্গত আলোক রশ্মি অস্বচ্ছ বস্তু ক খ কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হয়ে পর্দায় k_1x_1 অংশে ছায়া সৃষ্টি করবে। একইভাবে B_2 বিন্দু থেকে নির্গত রশ্মি k_2x_2 অংশে ছায়া সৃষ্টি করবে। B_1 উৎসের সর্বোচ্চ বিন্দু এবং B_2 সর্বনিম্ন বিন্দু। সুতরাং B_1B_2 এর মাঝের সকল বিন্দু থেকে নির্গত আলো রশ্মি পর্দায় k_2x_2 অংশের ভেতরেই বস্তুর ছায়া সৃষ্টি করবে। এখন লক্ষ করলে দেখবে যে, আলোক উৎসের কোনো অংশ থেকেই আলো পর্দার k_2x_2 অংশে পৌঁছাতে পারে না। ফলে এ অংশে গাঢ় কালো ছায়া সৃষ্টি হয়। এ ছায়াকে প্রচ্ছায়া বলে। পর্দায় k_1k_2 অংশ উৎসের নিচের বিন্দু থেকে আলো পায় না কিন্তু তার উপরের অংশ থেকে পায়। অনুরূপ x_1x_2 অংশ উৎসের উপরের বিন্দু থেকে না পেলেও নিচের অংশ থেকে আলো পায়। সুতরাং পর্দার k_1k_2 এবং x_1x_2 অংশে আংশিক আলোকিত ছায়া সৃষ্টি হয়। এ হালকা কালো বা ধূসর ছায়াকে উপচ্ছায়া বলে।

সুতরাং আমরা দেখলাম ছায়ার দুইটি অংশ প্রচ্ছায়া এবং উপচ্ছায়া। ছায়ার যে অংশে আলো একেবারেই পৌঁছাতে পারে না অর্থাৎ যে অংশ সম্পূর্ণ অন্ধকার তাকে প্রচ্ছায়া বলে। ছায়ার যে অংশে কিছুটা আলো পৌঁছায় সেই আংশিক আলোকিত, আংশিক অন্ধকার অংশকে উপচ্ছায়া বলে। প্রচ্ছায়া অঞ্চল থেকে আলোক উৎসের কোনো অংশই দেখা যায় না।

উপচ্ছায়া অঞ্চল থেকে আলোক উৎস আংশিক দেখা যায়। চিত্র ১৩.২ এবং চিত্র ১৩.৩ লক্ষ কর। দেখবে যে

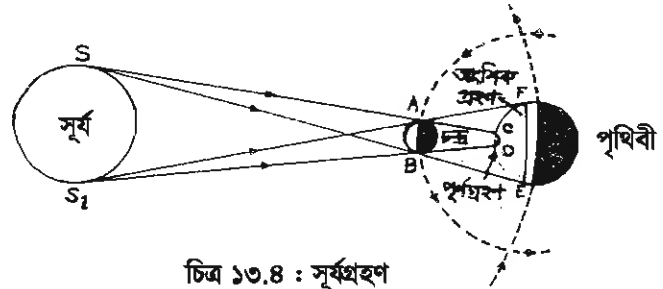
- ১) পর্দা দূরে সরালে প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া উভয়ের আকার বড় হবে, কাছে আনলে ছোট হবে।
- ২) প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়ার আকার, উৎস দূরে সরালে ছোট হবে, কাছে আনলে বড় হবে।
- ৩) বস্তুটি পর্দার কাছে আনলে, অর্থাৎ উৎস থেকে দূরে সরালে প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া ছোট হবে, পর্দা থেকে দূরে সরালে ছায়া বড় হবে।

সূর্য গ্রহণ

১৯৯৫ সালের ২৪ শে অক্টোবর বাংলাদেশের কোথাও কোথাও পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখা গেছে। বাংলাদেশের জন্য এটি ছিল এ শতাব্দির শেষ পূর্ণ সূর্যগ্রহণ। ঘটনাটি বিরল। তাই সবার মনেই বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা জাগে। অনেকে পূর্ণ গ্রহণ দেখার জন্য সুদূর হিরণ পয়েন্ট পর্যন্ত যায়। তুমি নিজেও হয়তো এ সূর্যগ্রহণ দেখে থাকবে। মনে হয় যেন একটি কালো ছায়া সূর্যকে আস্তে আস্তে ঢেকে ফেলেছে। এ সূর্যগ্রহণ প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া সৃষ্টিরই একটি প্রাকৃতিক ঘটনা।

তোমরা জান পৃথিবী সূর্যের গ্রহ, আর চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে অবিরত ঘুরছে আর চাঁদ ঘুরছে পৃথিবীর চারদিকে। সূর্যকে আলোর একটি বিস্তৃত উৎস হিসেবে ধরা যায়। পৃথিবী এবং চাঁদ অস্বচ্ছ বস্তু। সূর্যের আলোতে চাঁদ আলোকিত। তাই আমরা চাঁদ দেখতে পাই। অমাবস্যার রাতে আমরা চাঁদ দেখতে পাই না। পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে চাঁদ তখন

সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে আসে। তাই সূর্যের আলো চাঁদের যে দিকে পড়ে সে দিক পৃথিবী থেকে দেখা যায় না। কোনো কোনো অমাবস্যায় সূর্য, চাঁদ এবং পৃথিবী এক সরল রেখায় এসে যায়। তখন চাঁদের ছায়া পৃথিবীর কোনো অঞ্চলে এসে পড়ে (চিত্র ১৩.৪)। পৃথিবীর ঐ অঞ্চল থেকে তাই সূর্যকে তখন সম্পূর্ণ দেখা যায় না। একেই সূর্যগ্রহণ বলে।

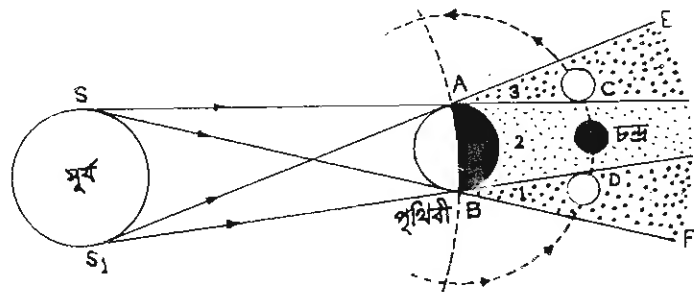


চিত্র ১৩.৪ : সূর্যগ্রহণ

সূর্য একটি বিস্তৃত আলো উৎস এবং চাঁদ একটি বিস্তৃত অস্বচ্ছ বস্তু। তাই দুই রকমের ছায়াই উৎপন্ন হয়, প্রচ্ছায়া এবং উপচ্ছায়া। পৃথিবী পৃষ্ঠের যে অঞ্চলে প্রচ্ছায়া পড়ে সেই অঞ্চল থেকে সূর্যকে একেবারেই দেখা যায় না। এ অঞ্চলটি গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। এ অঞ্চলের গ্রহণকে তাই সূর্যের পূর্ণ গ্রহণ বলে (চিত্র ১৩.৪ এ CD অঞ্চল)। উপচ্ছায়া অঞ্চল থেকে সূর্যকে আংশিক দেখা যায়। সুতরাং এ অঞ্চলে সূর্যের আংশিক গ্রহণ হয় (চিত্র ১৩.৪ এ OD ব্যতীত EF অঞ্চল)। যে অঞ্চলে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হয় সেই অঞ্চলটি অনেক সময় রাতের মত অন্ধকার হয়ে যায় এবং আকাশে তারা দেখা যায়।

চন্দ্রগ্রহণ

সূর্যের চারদিকে পৃথিবী এবং পৃথিবীর চারদিকে চাঁদ ঘুরতে ঘুরতে একসময় সূর্য এবং চাঁদের মাঝে পৃথিবী এসে পড়ে। সেই সময় চাঁদের যে দিকে সূর্যের আলো পড়ে সেই দিকটি পৃথিবীর এক অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণ দেখা যায়। পূর্ণ আলোকিত এ চাঁদই পূর্ণিমার চাঁদ, অর্থাৎ সেইদিন পূর্ণিমা হয়। কোনো কোনো পূর্ণিমায় সূর্য,



চিত্র ১৩.৫ : চন্দ্রগ্রহণ

পৃথিবী এবং চাঁদ এক সরলরেখায় চলে আসে। তখন পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়ে। ফলে চাঁদকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে দেখা যায় না। একে চন্দ্র গ্রহণ বলে (চিত্র : ১৩.৫)।

আকারে সূর্য সবচেয়ে বড়, পৃথিবী তার চেয়ে ছোট এবং চাঁদ সবচেয়ে ছোট। পৃথিবীর প্রচ্ছায়া তাই চাঁদের চেয়ে বড় হয়। ঘুরতে ঘুরতে চাঁদ যখন এ প্রচ্ছায়ার (চিত্রে CD অঞ্চলে) মধ্যে সম্পূর্ণ ঢুকে যায় তখন চাঁদকে একেবারেই দেখা যায় না, কারণ চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই। একে চাঁদের পূর্ণ গ্রহণ বলে। চাঁদ যখন আংশিকভাবে প্রচ্ছায়ার মধ্যে থাকে তখন চাঁদের সেই অংশটি শুধু দেখা যায় না। একে চাঁদের আংশিক বা খণ্ডগ্রহণ বলে। চন্দ্রগ্রহণের ঠিক আগে ও পরে চাঁদ থাকে উপচ্ছায়া অঞ্চলে। তখন চাঁদকে কিছুটা কম উজ্জ্বল বা ম্লান দেখায়।

তোমাদের মনে এখন নিশ্চয়ই প্রশ্ন জেগেছে প্রতি পূর্ণিমা এবং অমাবস্যা চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ হয় না কেন?

এর কারণ পৃথিবীর কক্ষপথ এবং চাঁদের কক্ষপথ এক সমতলে অবস্থিত নয়। পৃথিবীর কক্ষতল চাঁদের কক্ষতলের সঙ্গে প্রায় 5° কোণ করে হেলে আছে। তাই প্রতি অমাবস্যায় সূর্য, চাঁদ এবং পৃথিবী এক সরলরেখায় আসে না এবং যে পূর্ণিমায় সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ একই সরলরেখায় আসে শুধুমাত্র সেই পূর্ণিমাতেই চন্দ্রগ্রহণ হয়।

আলোর প্রতিফলন

তুমি এ বইটি কীভাবে দেখতে পাচ্ছ? কোনো উৎস থেকে আলো বাতাসের ভিতর দিয়ে এসে বই এর উপর পড়ছে। বই অসচ্ছ পদার্থ তাই বই এর মধ্য দিয়ে আলো যেতে পারে না। বই এ বাধা পেয়ে আলো যখন তোমার চোখে গিয়ে পড়ে তখন তুমি বইটি দেখতে পাও। এ রকম আলো কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে অন্য কোনো মাধ্যমে বাধাপ্রাপ্ত হলে সেই আলোর কিছু অংশ বা সম্পূর্ণ অংশ মাধ্যম দুইটির বিভেদতলে দিক পরিবর্তন করে আবার প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে। এ ঘটনাটিকে আলোর প্রতিফলন বলে। যে বিভেদ তল থেকে আলো প্রতিফলিত হয় তাকে প্রতিফলক বলে। আয়না বা অন্যান্য মসৃণ বা চকচকে বস্তু ভাল প্রতিফলক।

আলো কোনো বস্তুর উপর পড়লে তার কতটা অংশ প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসবে তা নির্ভর করে বস্তুটির মসৃণতা ও প্রকৃতির ওপর। আলো যখন কোন অস্বচ্ছ মাধ্যম যেমন বই এর উপর পড়ে তখন কিছু অংশ শোষিত হয়, অধিকাংশই প্রতিফলিত হয়। অস্বচ্ছ বস্তুটির তল যদি খুব মসৃণ এবং চকচকে হয় তবে প্রায় সবটুকু আলোই প্রতিফলিত হয়। কিন্তু অস্বচ্ছ বস্তুটি যদি আবার কালো হয় তবে আলোর অধিকাংশই শোষিত হয় খুব সামান্য অংশই প্রতিফলিত হয়। কালো বস্তুতে আলো সম্পূর্ণভাবে শোষিত হয়, ফলে প্রতিফলিত হয় না। অপরপক্ষে বস্তুটি সম্পূর্ণ সাদা হলে আলো শোষিত হয় না, সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়। অর্থাৎ যে বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয় না সেই বস্তু কালো দেখায়। যে বস্তু থেকে আলো যত বেশি প্রতিফলিত হয় সেই বস্তু তত সাদা দেখা যায়।

দ্বিতীয় মাধ্যমটি যদি স্বচ্ছ হয়, যেমন কাচ বা পানি, তবে আলোর সামান্য অংশ প্রতিফলিত হয়, অধিকাংশই স্বচ্ছ মাধ্যমের মধ্যে চলে যায়। কিছু অংশ প্রতিফলিত হয় বলেই আমরা কাচ বা পানি দেখতে পাই। বাতাসে আলো প্রতিফলিত হয় না বলে বাতাস দেখতে পাই না। প্রকৃতপক্ষে কোন বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হলেই শুধু বস্তুটি দেখা যায়।

সুষম ও বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন

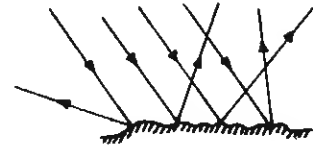
মাঠে একটি ফুটবল নিয়ে গিয়ে সোজা নিচের দিকে ফেলে দাও। মাঠ যদি সমান হয় তবে ফুটবলটি মাটিতে পড়ে আবার সোজা উপর দিকে উঠবে। কিন্তু মাঠ যদি অসমান বা এবড়োখেবড়ো হয় তবে মাটিতে পড়ে সোজা উপরে না উঠে এদিক-ওদিক চলে যাবে।

একই রকম, আলোররশ্মি যদি কোন মসৃণ তলের উপর পড়ে তবে তা কয়েকটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রতিফলিত হয়। একে নিয়মিত বা সুষম প্রতিফলন বলে। আয়না, পালিশ করা কঠিন তল বা ঐ ধরনের যে কোনো মসৃণ তলে সুষম প্রতিফলন হয়। সুষম প্রতিফলনে আলোক উৎসের প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়।

আয়নায় সুসম প্রতিফলনের ফলে আয়নার সামনে দাঁড়ালে তোমার প্রতিবিম্ব তুমি দেখতে পাও।



চিত্র ১৩.৬ : সুসম প্রতিফলন

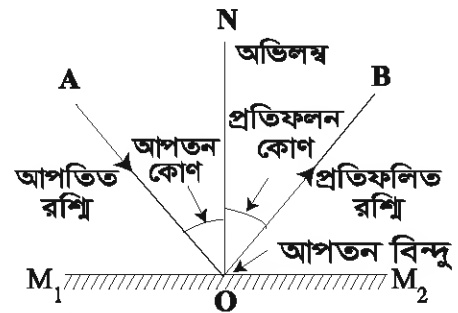


চিত্র ১৩.৭ : বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন

একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোকরশ্মি যদি কোন অমসৃণ তলের উপর পড়ে, তবে সেগুলি কোন নির্দিষ্ট দিকে সমান্তরালভাবে প্রতিফলিত হয় না, এক এক রশ্মি এক এক দিকে প্রতিফলিত হয়। অর্থাৎ রশ্মিগুলো বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে যায়। এই রকম প্রতিফলনকে অনিয়মিত বা বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন বলে। ঘরের দেয়ালে, খসখসে কাগজ, ঘষা কাচ ইত্যাদি অধিকাংশ বস্তু যা আমরা দেখতে পাই, এদের থেকে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন হয়। বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনের কোনো প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় না, যে বস্তু থেকে প্রতিফলন হয় সেই বস্তুটিই দেখা যায়। তোমার বই এর পাতা থেকে আলোকরশ্মির বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন হচ্ছে, তাই বই এর পাতা দেখতে পাচ্ছ। তোমরা সবাই হয়ত সিনেমা দেখেছ। সিনেমার পর্দাটি কী রং এর এবং খুব মসৃণ কিনা খেয়াল করেছে? দেখবে যে, সিনেমার পর্দা সাদা এবং অমসৃণ। এর কারণ কী? এর কারণ, পর্দা মসৃণ হলে সুসম প্রতিফলন হত, ফলে কেবল কোনো নির্দিষ্ট দিকের দর্শকরাই ছবি দেখতে পেত। পর্দা অমসৃণ হওয়ায় বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন হয় অর্থাৎ আলো চারদিকে ছড়িয়ে যায়। ফলে সব দিকের দর্শকরাই ছবি দেখতে পায়। আর পর্দা সাদা রং এর হয় কারণ সাদা বস্তু থেকে সবচেয়ে বেশি আলো প্রতিফলিত হয়। ফলে ছবি উজ্জ্বল দেখায়।

প্রতিফলনের সূত্র

আলোর সুসম প্রতিফলন কয়েকটি নিয়ম বা সূত্র মেনে চলে। সমতল দর্পণ বা আয়নায় আলোকরশ্মি এসে পড়লে সুসম প্রতিফলন হয়। ধরা যাক, আলোকরশ্মি AO বরাবর এসে M_1M_2 আয়নার O বিন্দুতে পড়েছে এবং OB পথে প্রতিফলিত হয়েছে। আলোর উৎস থেকে যে আলোকরশ্মি প্রতিফলক তলের উপর পড়ে তাকে আপতিত রশ্মি বলে। AO আপতিত রশ্মি। যে বিন্দুতে আপতিত রশ্মি এসে পড়ে তাকে আপতন বিন্দু বলে। O আপতন বিন্দু। যে আলোক রশ্মি প্রতিফলক তল থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে তাকে প্রতিফলিত রশ্মি বলে। OB প্রতিফলিত রশ্মি। আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত লম্বকে অভিলম্ব বলে। ON অভিলম্ব। আপতিত রশ্মি অভিলম্বের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে আপতন কোণ বলে। কোণ AON আপতন কোণ। প্রতিফলিত রশ্মি অভিলম্বের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে প্রতিফলন কোণ বলে। কোণ BON প্রতিফলন কোণ।



চিত্র ১৩.৮ : আলোর প্রতিফলন

আলোর প্রতিফলনের সূত্র দুইটি

প্রথম সূত্র : আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে প্রতিফলকের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে থাকে।

দ্বিতীয় সূত্র : আপতন কোণ সর্বদা প্রতিফলন কোণের সমান হয়।

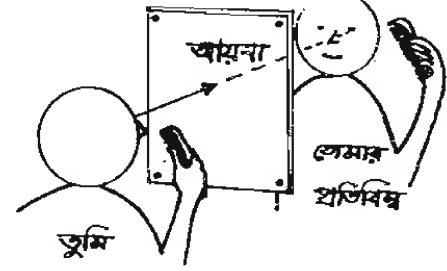
তুমি আলোর প্রতিফলন দেখতে চাও? একটি আয়নাকে সূর্যের দিকে ধরে এদিক-ওদিক ঘোরাও। খেয়াল কর সূর্য রশ্মি কীভাবে প্রতিফলিত হয়।

প্রতিবিম্ব

তুমি একটি আয়নার সামনে দাঁড়ালে কী দেখ? তোমার প্রতিচ্ছবি দেখ। মনে হয় আয়নার পেছনে তুমি দাঁড়িয়ে আছ। এটিই তোমার প্রতিবিম্ব।

আমরা জানি কোনো বস্তু থেকে আলোকরশ্মি যখন আমাদের চোখে এসে পড়ে শুধু তখনই বস্তুটি দেখতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে তোমার দেহ থেকে সরাসরি আলোকরশ্মি এসে তোমার চোখে পড়ছে না। দেহের প্রতিটি বিন্দু থেকে আলোকরশ্মি আয়নার উপর পড়ে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এসে তোমার চোখে পড়ছে। তাই তুমি 'তোমাকে' দেখছো না, দেখছো তোমার প্রতিবিম্বকে। অর্থাৎ বস্তুর কোনো বিন্দু থেকে আলোকরশ্মি প্রতিফলক পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত হয়ে যে বিন্দু থেকে ফিরে আসছে বলে মনে হয় সেই বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর প্রতিবিম্ব বলে। এ প্রতিবিম্ব প্রতিফলনের পেছনে গঠিত হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু কোন পর্দার উপর এ প্রতিবিম্ব ফেলা যায় না। কারণ আয়না ভেদ করে আলোক রশ্মি পেছনে যেতে পারে না। তাই এ প্রতিবিম্বের কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। এজন্য এ প্রতিবিম্বকে অবাস্তব প্রতিবিম্ব বলে। কিন্তু তুমি সিনেমা হলে যে ছবি দেখ তা সিনেমার পর্দার উপরে গঠিত প্রতিবিম্ব। সিনেমার প্রজেক্টর এর সাহায্যে ফিল্ম এর প্রতিবিম্ব পর্দার উপর ফেলা হয়। এখানে আলোকরশ্মি প্রকৃতপক্ষে পর্দার উপর মিলিত হয়। এ প্রতিবিম্বকে তাই বাস্তব প্রতিবিম্ব বলে।

অতএব, বলা যায়, কোনো বিন্দু থেকে আগত আলোকরশ্মি যদি প্রতিফলিত হয়ে দ্বিতীয় কোনো বিন্দুতে মিলিত হয়, অথবা দ্বিতীয় কোন বিন্দু থেকে ফিরে আসছে বলে মনে হয়, তবে ঐ দ্বিতীয় বিন্দুটিকে প্রথম বিন্দুর প্রতিবিম্ব বলা হয়। প্রতিবিম্ব দুই ধরনের হতে পারে। বাস্তব প্রতিবিম্ব এবং অবাস্তব প্রতিবিম্ব। যে প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত রশ্মি প্রকৃতপক্ষে মিলিত হয় এবং বা পর্দার উপর ফেলা যায় তাকে বাস্তব প্রতিবিম্ব বলে। যে প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত রশ্মি প্রকৃতপক্ষে মিলিত হয় না, প্রতিবিম্ব থেকে আসছে বলে মনে হয় তাকে অবাস্তব প্রতিবিম্ব বলে। অবাস্তব প্রতিবিম্ব পর্দার উপর ফেলা যায় না।

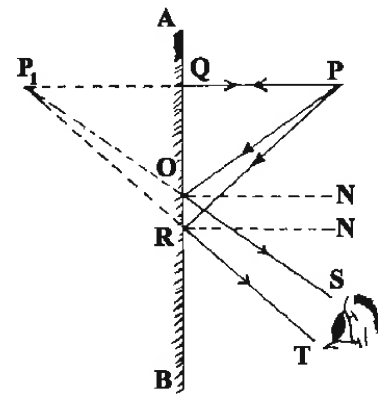


চিত্র ১৩.৯ : প্রতিবিম্ব

সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব গঠন

যে মসৃণ তলে প্রতিফলনের সূত্র অনুযায়ী আলোকরশ্মির সুসম প্রতিফলন হয় তাকে দর্পণ বলে। আমাদের সবচেয়ে পরিচিত দর্পণ হচ্ছে আয়না। পাতলা মসৃণ কাচের এক দিকে রুপার প্রলেপ দিয়ে এই দর্পণ তৈরি করা হয়। যে দর্পণের প্রতিফলক তল সমতল তাকে সমতল দর্পণ বলে।

১৩.১০ নং সমতল দর্পণে একটি বিন্দু বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন দেখান হয়েছে। AB একটি সমতল দর্পণ। P একটি বিন্দু বস্তু। P থেকে আলোকরশ্মি সবদিকে যায়। PQ রশ্মি দর্পণে লম্বভাবে Q বিন্দুতে পড়েছে। এখানে আপতন কোণ শূন্য সুতরাং প্রতিফলনের সূত্র অনুযায়ী প্রতিফলন কোণও শূন্য হবে। অর্থাৎ রশ্মিটি QP পথে ফিরে আসবে। PO এবং PR অপর দুইটি রশ্মি বাঁকাভাবে দর্পণে পড়েছে। প্রতিফলনের সূত্র অনুযায়ী এ দুইটি রশ্মি যথাক্রমে OS এবং RT পথে প্রতিফলিত হয়। এ দুইটি রশ্মিকে পিছনের দিকে বাড়ালে P_1 বিন্দুতে মিলিত হয়। অর্থাৎ প্রতিফলিত রশ্মি P_1 বিন্দু থেকে আসছে বলে মনে হয়। অতএব, P_1 বিন্দু P বিন্দুর অবাস্তব প্রতিবিম্ব।



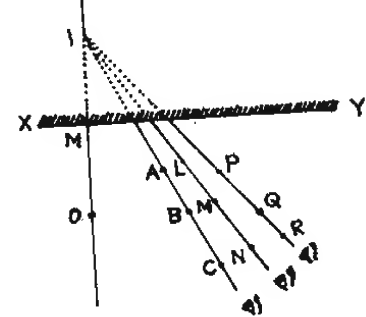
চিত্র ১৩.১০ : সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব গঠন

বস্তু, দর্পণ ও প্রতিবিম্বের পারস্পরিক অবস্থান

তুমি একটি পরীক্ষার সাহায্যে সমতল দর্পণে গঠিত প্রতিবিম্বের অবস্থান নির্ণয় করতে পার।

পরীক্ষা : একটি ড্রইং বোর্ড বা সমতল টেবিলের উপর একটি সাদা কাগজ পিন দিয়ে আটকাও। কাগজে XY সরল রেখা টান। এ সরল রেখা বরাবর খাড়াভাবে একটি দর্পণ এমনভাবে রাখ যেন এর প্রতিফলক তল XY রেখার সাথে মিলে যায়। দর্পণের সামনে O বিন্দুতে একটি পিনকে খাড়া করে বসাও।

এবার তিনটি পিন A, B এবং C কে খাড়া করে এমনভাবে বসাও যেন এ তিনটি পিন এবং O বিন্দুতে অবস্থিত পিনের প্রতিবিম্ব I একই সরল রেখায় দেখা যায়। একইভাবে আরো তিনটি পিন L, M, N এবং তিনটি পিন P, Q, R বসাও যেন L, M, N এবং I একটি সরল রেখায় এবং P, Q, R এবং I আরেকটি সরল রেখায় দেখা যায়। এখন দর্পণটি সরিয়ে পেনসিল দিয়ে CBA, NML এবং RQP বিন্দুগুলো দিয়ে তিনটি সরল রেখা আঁক। তিনটি সরল রেখাই I বিন্দু বরাবর। সুতরাং রেখা তিনটিকে পেছনের দিকে বাড়ালে I বিন্দুতে মিলিত হবে। অতএব O বিন্দুতে অবস্থিত পিনের প্রতিবিম্ব I বিন্দুতে অবস্থিত। এখন একটি স্কেল দিয়ে মাপলে দেখা যাবে $OM = IM$ । অর্থাৎ দর্পণ থেকে বস্তুর দূরত্ব = দর্পণ থেকে প্রতিবিম্বের দূরত্ব।



চিত্র ১৩.১১ : সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব গঠন

আলোর ব্যবহার

কোন কিছু দেখতে হলে আলোর প্রয়োজন। আলোর এ অতি প্রয়োজনীয় ব্যবহার ছাড়াও অন্যান্য ব্যবহার রয়েছে। শহরের রাস্তার মোড়ে লাল, হলুদ, সবুজ আলোর সংকেত দিয়ে গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তোমরা অনেকেই হয়ত দেখেছ। রাতের বেলায় যারা রেল গাড়িতে চড়েছ তারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ যে, স্টেশন থেকে গাড়ি ছাড়ার নির্দেশ দেন গার্ড সাহেব বাঁশি বাজিয়ে এবং একই সাথে একটি সবুজ বাতি দুলিয়ে সংকেত দিয়ে। সমুদ্রে অনেক সময় দুইটি জাহাজের মধ্যে আলোক সংকেত দিয়ে বার্তা আদান প্রদান করা হয়। আলোক সংকেতের এ ধরনের অনেক ব্যবহার রয়েছে।

ক্যামেরা দিয়ে তোমার ফটো তুলতে হলে আলোর প্রয়োজন। আলো ছাড়া ফটো তোলা যায় না।

একাদশ অধ্যায়ে তোমরা জেনেছ যে, উদ্ভিদ খাদ্য সংগ্রহ করে সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায়। এ প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন সূর্য রশ্মির।

আলোর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদন। কিছু বিশেষ ধরনের পদার্থ আছে যাদের উপর আলো পড়লে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। সিলিকন এ ধরনের একটি পদার্থ। সিলিকন দিয়ে সৌরকোষ তৈরি করা হয়। সৌরকোষে আলোক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

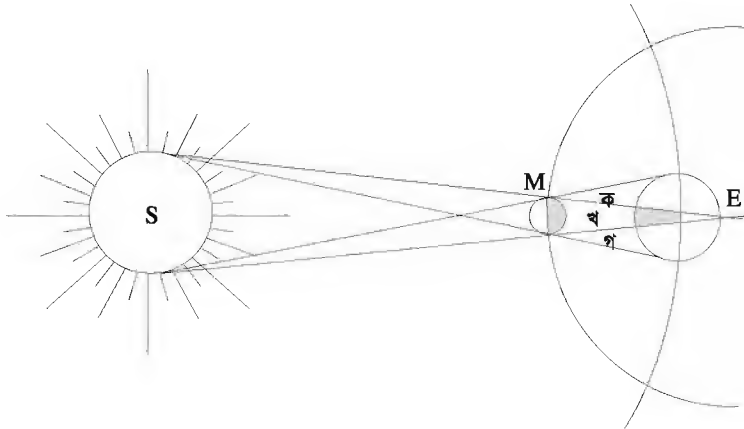
- চন্দ্রগ্রহণ হয়
 - প্রতি অমাবস্যায়
 - প্রতি পূর্ণিমাতে
 - যে অমাবস্যায় সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ এক সরল রেখায় হয়
 - যে পূর্ণিমাতে সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ এক সরল রেখায় হয়
- সাদা কাগজের উপরে হাত ধরলে কাগজের কিছু অংশ অন্ধকার বা কালো দেখায়, কারণ
 - আলোকরশ্মি হাতের পদার্থের কিনারা ঘেঁষে বাঁকতে পারে না
 - প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়ার আকার, উৎস দূরে সরালে ছোট হবে, কাছে আনলে বড় হবে
 - আলো হাতের মধ্য দিয়ে যেতে পারে না

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i
 - খ. i ও ii
 - গ. i ও iii
 - ঘ. i, ii ও iii
- আয়নায় যে প্রতিচ্ছবি দেখে সেটি কী?
 - ক. প্রচ্ছায়া
 - খ. উপচ্ছায়া
 - গ. অবাস্তব প্রতিবিম্ব
 - ঘ. বাস্তব প্রতিবিম্ব
 - দর্পণের তলের সঙ্গে 30° কোণ করে আলোকরশ্মি পড়লে প্রতিফলন কোণের মান কত ?
 - ক. 30°
 - খ. 85°
 - গ. 60°
 - ঘ. 90°

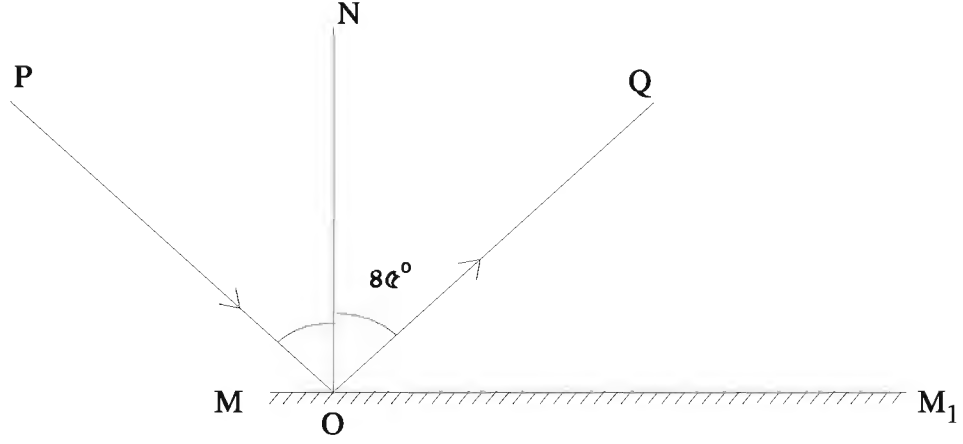
সৃজনশীল প্রশ্ন

১.



- ক. 'ক' চিহ্নিত স্থানটির সংজ্ঞা দাও।
- খ. ছায়া পড়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- গ. 'খ' ও 'গ' চিহ্নিত ছায়াগুলো কীভাবে গঠিত হয় চিত্র এঁকে বর্ণনা কর।
- ঘ. চিত্রে কিসের গ্রহণ দেখানো হয়েছে। তার সচিত্র বর্ণনা দাও।

২.



- ক. চিত্রে আলোর কী ধরনের প্রতিফলন দেখানো হয়েছে ?
- খ. এ ক্ষেত্রে কেন এ ধরনের প্রতিফলন হচ্ছে ?
- গ. যুক্তিসহ PON কোণের পরিমাণ নির্ণয় কর ।
- ঘ. P অবস্থানে দাঁড়িয়ে একজন ব্যক্তি তাঁর প্রতিবিম্ব MM_1 আয়নায় দেখতে পাবে কিনা চিত্রটুকু ব্যাখ্যা কর ।

চতুর্দশ অধ্যায়

চুম্বক

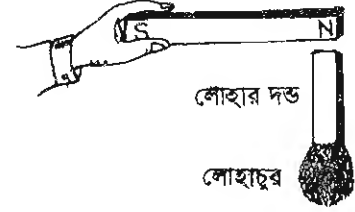
তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে জেনেছ যে, চুম্বক এক প্রকার পদার্থ যার আকর্ষণী ও দিকদর্শী ধর্ম আছে। চুম্বক আকর্ষণী ধর্মের জন্য চৌম্বক পদার্থকে আকর্ষণ করে। দিকদর্শী ধর্মের জন্য চুম্বক বাধাহীন অবস্থায় সবসময় উত্তর-দক্ষিণ বরাবর মুখ করে থাকে। চৌম্বক পদার্থকে ঘর্ষণ পদ্ধতি এবং বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে চুম্বকে পরিণত করা যায়।

চৌম্বক পদার্থকে চুম্বকে পরিণত করার আর কোনো পদ্ধতি আছে কি? চুম্বকের আকর্ষণ বল কতদূর পর্যন্ত কাজ করে? চুম্বক সবসময় উত্তর-দক্ষিণ বরাবর মুখ করে থাকে কেন? এ অধ্যায়ে তোমরা এসব প্রশ্নের জবাব পাবে।

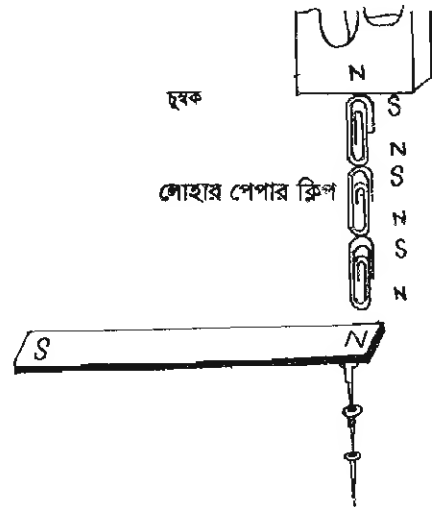
চৌম্বক আবেশ

পরীক্ষা : একটি লোহার পেরেক এবং কিছু লোহার গুঁড়া নাও। পেরেকটিকে লোহার গুঁড়ার মধ্যে ডুবাও। দেখবে সেটি লোহার গুঁড়াকে আকর্ষণ করছে না। এখন একটি দড় চুম্বক নিয়ে তার যে কোনো মেরু পেরেকটির কাছে বা সংস্পর্শে আনো। দেখবে এবার লোহার গুঁড়া পেরেকটির গায়ে লেগে থাকছে। অর্থাৎ পেরেকটি লোহার গুঁড়াকে আকর্ষণ করছে (চিত্র ১৪.১ ক)। দড় চুম্বকটি সরিয়ে নাও। দেখবে পেরেকের গা থেকে লোহার গুঁড়াগুলো পড়ে যাবে। এতে বোঝা যায় যে দড় চুম্বকের প্রভাবে লোহার পেরেকটি একটি অস্থায়ী চুম্বকে পরিণত হয়েছিল। লোহার গুঁড়া যদি না পাও তবে কতগুলো লোহার পেরেক বা লোহার পেপার ক্লিপ দিয়েও তুমি এ পরীক্ষাটি করতে পার। পেরেকগুলো বা লোহার পেপার ক্লিপ এক সজ্জা রাখলে একে অপরকে আকর্ষণ করে না। একটি দড় চুম্বককে পেরেকগুলোর বা ক্লিপগুলোর কাছে নাও। দেখবে লাফ দিয়ে কাছের পেরেকটি বা ক্লিপটি এসে চুম্বকের সাথে লেগে যাবে। এখন ধীরে ধীরে চুম্বকটি উপরে তুললে দেখবে প্রথম পেরেকের বা ক্লিপের তলায় আরেকটি পেরেক বা ক্লিপ ঝুলছে, তার তলায় আরেকটি। এভাবে একটি পেরেকের বা ক্লিপের চেইন তৈরি করা যায় (চিত্র ১৪.১ খ)। এতে বোঝা যায় যে, প্রতিটি পেরেকই বা ক্লিপই চুম্বকে পরিণত হয়েছে। এবার উপরের পেরেকটি বা ক্লিপটি এক হাত দিয়ে ধরে দড় চুম্বকটি সরিয়ে নাও। দেখবে পেরেকগুলো বা ক্লিপগুলো খসে পড়ল। এতে বোঝা যায় যে, চুম্বকের সংস্পর্শে পেরেকগুলো বা ক্লিপগুলো সাময়িকভাবে চুম্বকে পরিণত হয়েছিল।

লোহা একটি চৌম্বক পদার্থ। সুতরাং আমরা দেখলাম, একটি চুম্বককে একটি চৌম্বক পদার্থের কাছে বা সংস্পর্শে আনলে চৌম্বক পদার্থটি সাময়িকভাবে চুম্বকে পরিণত হয়। এ ঘটনাকে চৌম্বক আবেশ বলে অর্থাৎ, একটি চুম্বকের শুমাত্র উপস্থিতিতে অপর একটি চুম্বক পদার্থের ক্ষণস্থায়ীভাবে চুম্বকে পরিণত হওয়ার ঘটনাকে চৌম্বক আবেশ বলে। যতক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী চুম্বকটি উপস্থিত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত এ চুম্বকত্ব স্থায়ী হয়। চুম্বকটি সরিয়ে নিলে চৌম্বক পদার্থটি চুম্বকত্ব হারায়।



চিত্র ১৪.১ (ক) : চৌম্বক আবেশের পরীক্ষা

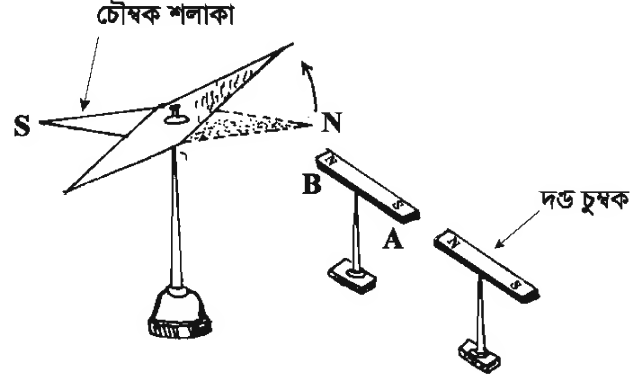


চিত্র ১৪.১ : (খ) চৌম্বক আবেশের পরীক্ষা

যে চুম্বকের উপস্থিতিতে চৌম্বক আবেশ ঘটে তাকে আবেশী চুম্বক বলে। এর চুম্বকত্বকে আবেশী চুম্বকত্ব বলে। আবেশের ফলে যে চৌম্বক পদার্থটি চুম্বকে পরিণত হয় তাকে আবিষ্ট চুম্বক বলে। এর চুম্বকত্বকে আবিষ্ট চুম্বকত্ব বলে।

আবিষ্ট চুম্বকের মেরুর প্রকৃতি আরেকটি পরীক্ষা করে জানা যায়।

পরীক্ষা : একটি শলাকা চুম্বক নাও। এটি উত্তর দক্ষিণ মুখ করে স্থির থাকবে। একটি দণ্ড চুম্বক নাও। উত্তর মেরুকে শলাকা চুম্বকটির উত্তর মেরুর দিকে মুখ করে এমন দূরত্বে রাখ যেন শলাকাটি দণ্ড চুম্বক দ্বারা প্রভাবিত না হয়, অর্থাৎ শলাকাটির উত্তর মেরু দণ্ড চুম্বকের বিকর্ষণ বলের ফলে দূরে সরে না যায়। এখন একটি কাঁচা লোহার দণ্ড AB চুম্বক দুইটির মাঝে রাখ। দেখা যাবে, চুম্বক শলাকাটির উত্তর মেরু সরে গেছে। অর্থাৎ লোহার দণ্ডটি চুম্বক শলাকাকে বিকর্ষণ করেছে। দুইটি সমমেরুর মধ্যেই শুধুমাত্র বিকর্ষণ হয়। সুতরাং লোহার দণ্ডের যে প্রান্ত শলাকার কাছে সে প্রান্তে উত্তর মেরু সৃষ্টি হয়েছে। আর যে প্রান্ত দণ্ড চুম্বকের উত্তর মেরুর কাছে সে প্রান্তে দক্ষিণ মেরু সৃষ্টি হয়েছে।



চিত্র ১৪.২ আবিষ্ট চুম্বকের মেরুর প্রকৃতি

অতএব, চৌম্বক আবেশের ফলে আবিষ্ট চুম্বকে, আবেশী মেরুর কাছের প্রান্তে বিপরীত মেরু এবং দূরের প্রান্তে সমমেরু সৃষ্টি হয়।

আগে আবেশ পরে আকর্ষণ

একটি চুম্বককে কোনো চৌম্বক পদার্থের কাছে আনলে তাদের মধ্যে আকর্ষণ হয়। এর কারণ কী, এখন বলতে পারবে? এর কারণ হল প্রথমে চৌম্বক আবেশের ফলে চৌম্বক পদার্থটি সাময়িকভাবে চুম্বকে পরিণত হয় এবং আবেশী চুম্বকের কাছের প্রান্তে চৌম্বক পদার্থে বিপরীত মেরু সৃষ্টি হয়। বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। তাই চুম্বক এবং চৌম্বক পদার্থের মধ্যে আকর্ষণ হয়। সুতরাং বলা যায়, আগে আবেশ পরে আকর্ষণ হয়।

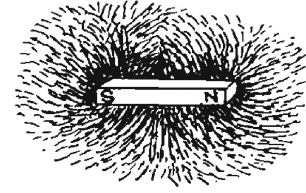
চৌম্বক ক্ষেত্র

আমরা জানি বল হচ্ছে ধাক্কা অথবা টান। ঘরের দরজা খুলতে তুমি হয় ধাক্কা দাও অথবা টান দাও। এ বল প্রয়োগ করতে হলে তোমাকে দরজা স্পর্শ করতে হবে। স্পর্শ না করে দূর থেকে এ বল প্রয়োগ করা যায় না। কিন্তু একটি চুম্বকের কাছে যদি তুমি একটি লোহার পেরেক রাখ চুম্বকটি পেরেককে স্পর্শ না করেও আকর্ষণ করবে। চৌম্বক বল প্রয়োগের জন্য স্পর্শের প্রয়োজন হয় না। দূর থেকে এ বল কাজ করে। যেকোন চুম্বকের চারপাশ জুড়ে কিছু স্থান আছে যেখানে যে কোন পেরেককে এ বল আকর্ষণ করবে। এ স্থানকে চৌম্বক ক্ষেত্র বলে।

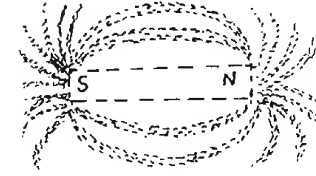
চৌম্বক বলের প্রভাব দেখতে হলে একটি ছোট শলাকা চুম্বক একটি চুম্বকের কাছে রাখ। দেখবে, শলাকাটি ঘুরে যাবে। আস্তে আস্তে শলাকাটি দূরে সরে যাবে, দেখবে ঘোরার পরিমাণ ক্রমেই কমছে। একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের পর আর একদমই ঘুরবে না। অর্থাৎ তখন চৌম্বক বলের কোন প্রভাব আর থাকে না। চুম্বকের চারপাশে একটি নির্দিষ্ট স্থান জুড়ে চৌম্বক বল কাজ করে।

অতএব, কোন চুম্বকের চারপাশের যে নির্দিষ্ট স্থান জুড়ে চুম্বকের প্রভাব থাকে সেই স্থানকে ঐ চুম্বকের ক্ষেত্র বলে। চৌম্বক ক্ষেত্রের যেকোনো স্থানে একটি চৌম্বক পদার্থ রাখলে তা আকর্ষণ বল অনুভব করবে।

চৌম্বক ক্ষেত্র দেখা যায় না। তবে তুমি এর প্রভাব দেখতে পার। একটি সাদা কাগজের উপর একটি দণ্ড চুম্বক রাখ। কিছু লোহার গুঁড়া কাগজের উপর ছড়িয়ে দাও। আস্তে আস্তে কাগজটিকে টোকা দাও। দেখবে, চিত্রে যেমন দেখান হয়েছে, লোহার গুঁড়াগুলো কোথাও ঘন, কোথাও হালকা হয়ে বিশেষভাবে সজ্জিত হয়েছে। এটিই একটি দণ্ড চুম্বকের চৌম্বক ক্ষেত্রের রূপ বা মানচিত্র। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম এই চৌম্বক ক্ষেত্র নামটি ব্যবহার করেন।



(ক)



(খ)

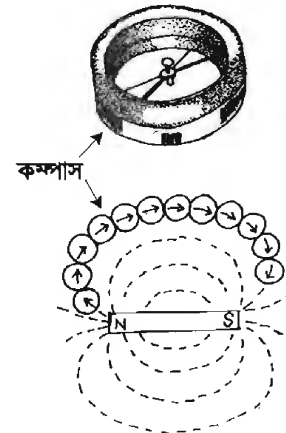
চিত্র ১৪.৩ : একটি দণ্ড চুম্বকের চৌম্বক ক্ষেত্র

চৌম্বক বলরেখা

এবার তোমাকে একটু কল্পনা করতে হবে। ধর, একটি দণ্ড চুম্বকের উত্তর মেঘুর কাছে একটি মুক্ত একক উত্তর মেঘু আনা হল। কী হবে? সমমেঘুর মধ্যে বিকর্ষণ হয়। সুতরাং একক উত্তর মেঘুটি দণ্ড চুম্বকের উত্তর মেঘু থেকে দূরে সরে যাবে। কিন্তু দণ্ড চুম্বকের দক্ষিণ মেঘু আবার একক উত্তর মেঘুটিকে আকর্ষণ করবে। এ আকর্ষণ বল বিকর্ষণ বলের চেয়ে কম, কারণ একক উত্তর মেঘুটি দণ্ড চুম্বকের দক্ষিণ মেঘু থেকে দূরে অবস্থিত। ফলে একক মেঘুটি সোজা দূরে সরে যাবে না, দক্ষিণ মেঘুর দিকে একটু বেঁকে যাবে। এভাবে এটি যত দূরে সরে যাবে, বিকর্ষণ বল তত কমতে থাকবে। আর আকর্ষণ বল বাড়তে থাকবে। ফলে চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে মুক্ত উত্তর মেঘুটি একটি বাঁকা পথে দণ্ড চুম্বকের উত্তর মেঘু থেকে দক্ষিণ মেঘুতে আসবে। এ পথকেই চৌম্বক বল রেখা বলে। অর্থাৎ কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রে একটি বাধামুক্ত একক উত্তর মেঘুর পথকে চৌম্বক বলরেখা বলে। চৌম্বক বলরেখার দিক হচ্ছে উত্তর মেঘু থেকে দক্ষিণ মেঘুর দিকে।

বাস্তবে বাধামুক্ত একক উত্তর মেঘুর কোনো অস্তিত্ব নেই। সুতরাং চৌম্বক বলরেখারও কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। এগুলো কাল্পনিক রেখা। এ কাল্পনিক রেখাগুলো দেখা গেলে কী রকম দেখাতো সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য একটি পরীক্ষা করে দেখতে পার।

পরীক্ষা : একটি ড্রয়িং বোর্ডের উপর একটি সাদা কাগজ পিন দিয়ে আটকাও। কাগজের মাঝখানে একটি দণ্ড চুম্বক রাখ। পেন্সিল দিয়ে চুম্বকটির সীমারেখা টান। একটি ছোট কম্পাস কাঁটাকে চুম্বকের উত্তর মেঘুর কাছে রাখ। কাঁটাটি স্থির হলে তার দুপ্রান্তে পেন্সিল দিয়ে দুইটি বিন্দু চিহ্ন দাও। এবার কম্পাসটি তুলে আবার এমনভাবে রাখ যেন কাঁটাটি স্থির হলে এর দক্ষিণ মেঘুর চিহ্ন আগের বারের উত্তর মেঘুর চিহ্নের উপর পড়ে। কাঁটার উত্তর মেঘু প্রান্তে পেন্সিল দিয়ে আরেকটি চিহ্ন দাও। এভাবে কম্পাসটি সরাতে এবং চিহ্ন দিতে থাক যেন প্রতিবারই কাঁটার দক্ষিণ মেঘু তার আগের বারের উত্তর মেঘুর চিহ্নে পড়ে। কম্পাসটি চুম্বকের দক্ষিণ মেঘুতে পৌঁছালে তা সরিয়ে রেখে বিন্দু চিহ্নগুলো পেন্সিল দিয়ে যোগ কর। এভাবে চুম্বকের উত্তর মেঘু থেকে দক্ষিণ মেঘু বরাবর যে বাঁকা রেখাটি পাবে সেটাই একটি চৌম্বক বলরেখা। এরপর কম্পাসটিকে আবার চুম্বকের উত্তর মেঘুর কাছে এনে প্রথমে যেখানে রেখেছিলে তার একটু পাশে রাখ। একই পদ্ধতি অনুসরণ করে আরেকটি চৌম্বক বলরেখা আঁক। এভাবে কম্পাসটি চুম্বকের উত্তর মেঘুর কাছে পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে রেখে একই পদ্ধতিতে অন্যান্য চৌম্বক বলরেখা আঁকা যায় (চিত্র ১৪.৪)। চৌম্বক বলরেখার এ চিত্রকে চৌম্বক ক্ষেত্রের মানচিত্র বলে।



চিত্র ১৪.৪ : চৌম্বক বলরেখা

চৌম্বক বলরেখার ধর্ম

- ১) দুইটি চৌম্বক বলরেখা কখনো পরস্পরকে ছেদ করে না।
- ২) বলরেখাগুলোর যেখানে ঘনত্ব বেশি, সেখানে চৌম্বক ক্ষেত্র শক্তিশালী, যেখানে রেখাগুলোর মধ্যে দূরত্ব বেশি সেখানে চৌম্বক ক্ষেত্র দুর্বল।
- ৩) চৌম্বক বলরেখাগুলো উত্তর মেৰু থেকে লম্বভাবে নির্গত হয় এবং দক্ষিণ মেৰুতে লম্বভাবে মিলিত হয়।

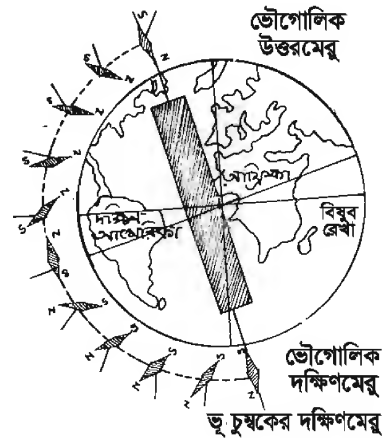
ভূ-চুম্বক

আমরা জানি, চুম্বকের দিকদর্শী ধর্ম আছে। অর্থাৎ একটি দণ্ড চুম্বকের মাঝখানে সুতো বেঁধে ঝুলিয়ে দিলে বাধাহীন অবস্থায় সেটি সবসময় উত্তর দক্ষিণ বরাবর মুখ করে থাকে। এ থেকে বোঝা যায় যে, চুম্বকটি নিশ্চয়ই শক্তিশালী চুম্বকের প্রভাবে আছে, না হলে সেটি যে কোনো দিকে মুখ করে থাকতো। কিন্তু আশেপাশে তো কোন চুম্বক নেই। এ অদৃশ্য চুম্বকটি কোথায়? তাহলে কি পৃথিবী নিজেই একটি চুম্বক? ঠিক তাই। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ড. গিলবার্ট বিভিন্ন পরীক্ষা করে এ সিদ্ধান্তে আসেন যে, পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক। পৃথিবীর এক মেৰু থেকে অন্য মেৰু পর্যন্ত লম্বা একটি বিরাট দণ্ড চুম্বক লুকানো আছে বলে কল্পনা করা হয়। এই কাল্পনিক চুম্বকেই ভূ চুম্বক বলে। ভূ চুম্বকের উত্তর মেৰু ভৌগোলিক দক্ষিণ মেৰুর দিকে এবং দক্ষিণ মেৰু ভৌগোলিক উত্তর মেৰুর দিকে অবস্থিত। অবাধে ঘুরতে পারে এমন একটি ঝুলন্ত চুম্বক শলাকাকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নিয়ে গেলে সেটি যে দিকে মুখ করে থাকে তা চিত্রে (চিত্র ১৪.৫) দেখানো হয়েছে। দেখা যায় যে, বিষুবরেখার কাছাকাছি শলাকাটি ভূপৃষ্ঠের সমান্তরাল অবস্থায় থাকে। তারপর যত উত্তরে নিয়ে যাওয়া যায় তত ভূপৃষ্ঠের দিকে ঝুঁকে পড়তে থাকে। ভৌগোলিক উত্তর মেৰু থেকে পশ্চিমে শলাকার উত্তর মেৰুটি সোজা নিচের দিকে মুখ করে থাকে। এতে বোঝা যায় যে, ভূ চুম্বকের দক্ষিণ মেৰু ভৌগোলিক উত্তর মেৰুর পশ্চিমে অবস্থিত। তাই সেটি শলাকার উত্তর মেৰুকে তার দিকে আকর্ষণ করে।

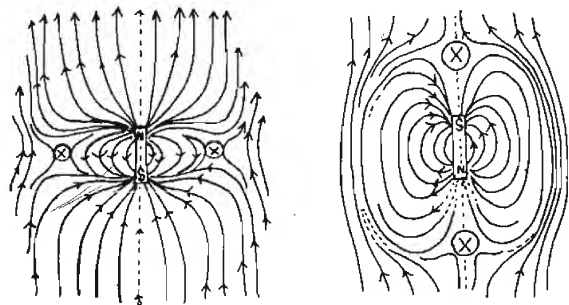
আবার ঝুলন্ত চুম্বক শলাকাটিতে যত দক্ষিণ দিকে নিয়ে যাওয়া যায় এর দক্ষিণ মেৰু তত ভূপৃষ্ঠের দিকে ঝুঁকে পড়তে থাকে। ভৌগোলিক দক্ষিণ মেৰু থেকে পূর্বে এটি সোজা নিচের দিকে মুখ করে থাকে। সুতরাং ভূ চুম্বকের উত্তর মেৰু ভৌগোলিক দক্ষিণ মেৰুর পূর্বে অবস্থিত। ভূ চুম্বকের দুই মেৰু যোগ করলে যে কাল্পনিক রেখা পাওয়া যায় তাকে ভূ চৌম্বক অক্ষ বলে।

নিষ্ক্রিয় বিন্দু

একটি দণ্ড চুম্বকের চৌম্বক ক্ষেত্রে একটি মুক্ত বিচ্ছিন্ন উত্তর মেৰু রাখলে তার উপর যেমন চুম্বকের প্রভাব থাকবে তেমন ভূ চুম্বকের প্রভাবও থাকবে। চুম্বকের কাছে তার প্রভাব বেশি, ভূ চুম্বকের প্রভাব কম। চুম্বক থেকে যত দূরে যাওয়া যাবে, এর প্রভাব তত কমতে থাকবে এবং ভূ চুম্বকের প্রভাব বাড়তে থাকে। দণ্ড চুম্বকের কেন্দ্র থেকে সমান দূরত্বে দুইটি বিন্দু পাওয়া যায় যেখানে দণ্ড চুম্বকের



চিত্র ১৪.৫ : চৌম্বক বলরেখা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভূ চুম্বকের প্রভাব



চিত্র ১৪.৬ : চৌম্বক বলরেখার মানচিত্র : নিষ্ক্রিয় বিন্দুর অবস্থান

প্রভাব এবং ভূ চুম্বকের প্রভাব সমান, কিন্তু বিপরীত। অর্থাৎ দণ্ড চুম্বক যদি উত্তর মেরুটিকে আকর্ষণ করে তবে ভূ চুম্বক তাকে সমান বলে বিকর্ষণ করবে। এ দুইটি সমান এবং বিপরীত বল একে অপরকে নিষ্ক্রিয় করবে। তাই এ দুইটি বিন্দুকে নিষ্ক্রিয় বিন্দু বলে। এ বিন্দুতে উত্তর মেরুটি স্থির থাকবে। অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় বিন্দুতে চুম্বকের কোন প্রভাব থাকে না, প্রভাব হল শূন্য।

উপরের চিত্রে ভূ চৌম্বক ক্ষেত্রে একটি দণ্ড চুম্বকের উত্তর মেরু উত্তর দিকে রাখলে এবং উত্তর মেরু দক্ষিণ দিকে রাখলে নিষ্ক্রিয় বিন্দুর অবস্থান কোথায় হবে তা দেখানো হয়েছে। ক্রস (X) চিহ্নগুলো নিষ্ক্রিয় বিন্দু।

চুম্বকের ব্যবহার

আমরা মাইক্রোফোনের সামনে মুখ রেখে কথা বলি, গান গাই। মাইক্রোফোন শব্দ শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে। আবার স্পীকার এ বিদ্যুৎ শক্তিকে পুনরায় শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত করে। তাই আমরা কথা বা গান শুনতে পাই। মাইক্রোফোন এবং স্পীকারে চুম্বক ব্যবহার করে এ শক্তির রূপান্তর করা হয়। চুম্বকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবহার হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদনে। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে আবিষ্কার করেন যে, একটি তারের কুণ্ডলীর মধ্যে একটি চুম্বক দ্রুত প্রবেশ করালে বা কুণ্ডলীর মধ্যে থেকে বের করে নিয়ে এলে তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। এ নীতির উপর ভিত্তি করেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। চুম্বক ব্যবহার করে যে যন্ত্রের সাহায্যে এভাবে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় তার নাম ডায়নামো বা জেনারেটর।

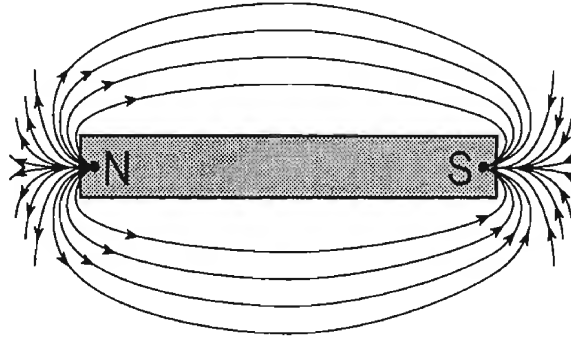
ক্রেন দিয়ে ভারী ভারী জিনিস তুলতে হয়ত তুমি দেখছ। চৌম্বক পদার্থের তৈরি ভারী জিনিস যেমন, মোটর গাড়ি তোলার জন্য যে ক্রেন ব্যবহার করা হয় সেগুলোতে অনেক সময় চুম্বক ব্যবহার করা হয়। ক্রেনে চুম্বকের আকর্ষণী ধর্ম কাজে লাগানো হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- কোনো চুম্বকের চারপাশের যতটুকু স্থান জুড়ে তার প্রভাব থাকে তাকে
ক. চৌম্বক ক্ষেত্র বলে
খ. চৌম্বক বলরেখা বলে
গ. ভৌচৌম্বক বলে
ঘ. নিষ্ক্রিয় বিন্দু বলে
- যে চুম্বকের উপস্থিতিতে চৌম্বক আবেশ ঘটে তাকে কী বলে ?
ক. আবেশী চুম্বক
খ. আবিষ্ট চুম্বক
গ. দণ্ড চুম্বক
ঘ. শলাকা চুম্বক
- চৌম্বক বল রেখার মধ্যে দূরত্ব কম হলে বলরেখার
ক. ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়
খ. ঘনত্ব হ্রাস পায়
গ. চৌম্বক ক্ষেত্র শক্তিশালী হয়
ঘ. নিষ্ক্রিয় বিন্দু পাওয়া যায়
- মাইক্রোফোনে ব্যবহৃত চুম্বক
ক. শব্দ শক্তিকে তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত করে
খ. বিদ্যুৎ শক্তিকে শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত করে
গ. বিদ্যুৎ শক্তিকে তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত করে
ঘ. শব্দ শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে

নিচের চিত্র হতে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



- চিত্রে চুম্বকের প্রান্তদ্বয়ে বলরেখাগুলোর ঘনত্ব বেশি হলে—
i. চুম্বক শক্তি সবচেয়ে বেশি হবে
ii. চৌম্বক প্রাবল্য বেশি হবে
iii. চৌম্বক ক্ষেত্র শক্তিশালী হবে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i
খ. i ও ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
- রেখার তীর চিহ্ন নির্দেশ করে
ক. চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক
খ. চৌম্বক বলরেখার দিক
গ. আকর্ষণ বলের দিক
ঘ. বিকর্ষণ বলের দিক

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.



চিত্র ১



চিত্র ২

উপরের চৌম্বক দণ্ড দুইটি নিকট দূরত্বে স্থাপন করা হল।

ক. চিত্রে 'N' এর অর্থ কী ?

খ. প্রথম চুম্বকটির জন্য চৌম্বক বলরেখা ব্যাখ্যা কর।

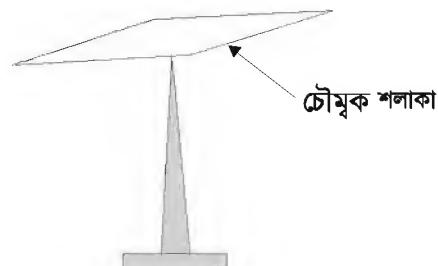
গ. চুম্বক দুইটির সৃষ্ট চৌম্বক বলরেখার ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

ঘ. দ্বিতীয় চুম্বকের জন্য বলরেখা অংকন করে নিষ্ক্রিয় বিন্দুর অবস্থান বর্ণনা কর।

২.



দণ্ড চুম্বক



চৌম্বক শলাকা

ক. চৌম্বক শলাকা কাকে বলে ?

খ. চিত্রে আকর্ষণের পূর্বে কীভাবে আবেশ ঘটবে ব্যাখ্যা কর।

গ. দণ্ড চুম্বক এবং চৌম্বক শলাকার মধ্যে চৌম্বক বলরেখায় অংকন করে এদের ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

ঘ. দণ্ড চুম্বকটি কীভাবে ভূচুম্বক দ্বারা প্রভাবিত হবে ব্যাখ্যা কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বিদ্যুৎ

আমরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে জেনেছি, বিদ্যুৎ দুই প্রকার : স্থির বিদ্যুৎ এবং চল বিদ্যুৎ। যে বিদ্যুৎ কোনো বস্তুতে আবদ্ধ থাকে, তাকে স্থির বিদ্যুৎ বলে। যে বিদ্যুৎ কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে অবিরাম কোনো নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হয় তাকে চল বিদ্যুৎ বলে। বিদ্যুতের অধিকাংশ ব্যবহারই চল বিদ্যুৎ রূপে হয়ে থাকে।

এ অধ্যায়ে আমরা চলবিদ্যুৎ সম্পর্কে আরো কিছু জানবো।

বিদ্যুৎ প্রবাহ ও চল বিদ্যুৎ

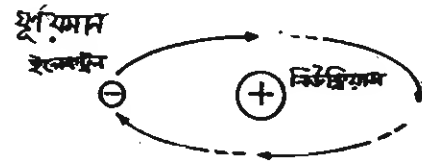
নদীতে পানির স্রোত বা প্রবাহ হয়তো তোমরা দেখেছ। পানির কণার এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছুটে চলার নাম পানির প্রবাহ। তেমনি বৈদ্যুতিক চার্জের বা চার্জিত কণার নির্দিষ্ট দিকে অবিরাম ছুটে চলাকে বলে বিদ্যুৎ প্রবাহ।

পানি উঁচু স্থান থেকে নিচু স্থানের দিকে প্রবাহিত হয়। নদীর পানির উৎস হচ্ছে পাহাড়ের বরফগলা পানি। পাহাড় উঁচুতে অবস্থিত। সেখান থেকে পানি গড়িয়ে নিচের দিকে প্রবাহিত হয়। সমুদ্রের স্তর নিচে। তাই নদীর পানি প্রবাহিত হয়ে এসে সমুদ্রে পড়ে।

চার্জ দুই প্রকার : ধনাত্মক চার্জ ও ঋণাত্মক চার্জ। ধনাত্মক চার্জে চার্জিত বস্তুকে তুলনা করা হয় বেশি উচ্চতায় অবস্থিত পানির সঙ্গে। আর ঋণাত্মক চার্জে চার্জিত বস্তুকে তুলনা করা হয় কম উচ্চতায় অবস্থিত পানির সঙ্গে। পানির উচ্চতা যত বাড়ে চাপও তত বেশি হয়। পানি বেশি চাপের স্থান থেকে কম চাপের স্থানের দিকে প্রবাহিত হয়। ধনাত্মক চার্জে চার্জিত বস্তুর বৈদ্যুতিক চাপ বেশি। ঋণাত্মক চার্জে চার্জিত বস্তুর বৈদ্যুতিক চাপ কম। তাই একটি ধনচার্জে চার্জিত বস্তুকে একটি ঋণচার্জে চার্জিত বস্তুর সঙ্গে কোন পরিবাহী দিয়ে যোগ করলে ধনচার্জ ঋণচার্জে চার্জিত বস্তুর দিকে প্রবাহিত হয়। এ চলমান চার্জই চল বিদ্যুৎ।

সুতরাং আমরা জানলাম –

কোন পরিবাহীর মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট দিকে ধনচার্জের প্রবাহকে বিদ্যুৎ প্রবাহ বলে। এ প্রবাহমান বিদ্যুতকে চল বিদ্যুৎ বলে। ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জে চার্জিত বস্তুর সংযোগের ফলে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়।



চিত্র ১৫.১ : পরমাণুর গঠন

এখানে জেনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রকৃতপক্ষে পরিবাহীর মধ্য দিয়ে

ধনচার্জ প্রবাহিত হয় না। প্রবাহিত হয় ইলেকট্রন। ইলেকট্রন

হল অতি ক্ষুদ্র কণিকা। প্রতিটি পরমাণুর মধ্যেই এক বা একাধিক ইলেকট্রন আছে। আর সকল পদার্থই পরমাণু দিয়ে

গঠিত। পরমাণু হল মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা। পরমাণুর কেন্দ্রের নাম নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসকে

ঘিরে ইলেকট্রনগুলো নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরছে, ঠিক যেমন

সৌরজগতে সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলো ঘুরছে। নিউক্লিয়াস দুই

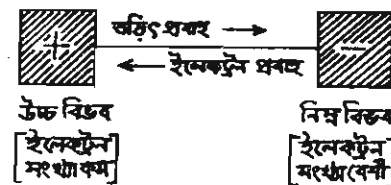
ধরনের কণিকা দিয়ে গঠিত : প্রোটন এবং নিউট্রন।

ইলেকট্রন ঋণাত্মক চার্জযুক্ত। প্রোটন ধনাত্মক চার্জযুক্ত।

নিউট্রনের কোন চার্জ নেই। প্রোটনের চার্জ ইলেকট্রনের চার্জের

সমান কিন্তু বিপরীত। সাধারণ অবস্থায় কোন পরমাণুতে সমান

সংখ্যক ইলেকট্রন এবং প্রোটন থাকে। তাই তা চার্জ নিরপেক্ষ।



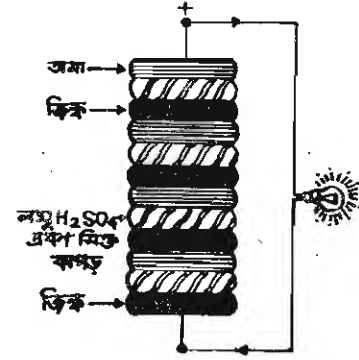
চিত্র ১৫.২ : বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক

কোন বস্তুতে ইলেকট্রনের আধিক্য হলে সেটি ঋণাত্মক চার্জযুক্ত হয়। আর ইলেকট্রনের ঘাটতি হলে হয় ধনাত্মক চার্জযুক্ত। ইলেকট্রন পরমাণুর কেন্দ্রের বাহিরের দিকে আছে বলে অপেক্ষাকৃত সহজে চলাচল করতে পারে। তাই একটি ধনাত্মক চার্জযুক্ত বস্তুকে একটি ঋণাত্মক চার্জযুক্ত বস্তুর সঙ্গে কোনো পরিবাহী দিয়ে যুক্ত করলে ইলেকট্রন ধনাত্মক চার্জযুক্ত বস্তুর দিকে প্রবাহিত হয়। এ ইলেকট্রন প্রবাহই প্রকৃতপক্ষে বিদ্যুৎ প্রবাহ। কিন্তু প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক ধরা হয় ধনাত্মক চার্জযুক্ত বস্তু থেকে ঋণাত্মক চার্জযুক্ত বস্তুর দিকে অর্থাৎ ইলেকট্রন প্রবাহের দিকের বিপরীত দিকে (চিত্র ১৫.২)।

বিদ্যুৎকোষ উদ্ভাবনের ইতিহাস

লুইগি গ্যালভানি ইটালির বোলোগনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শরীরতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি একদিন ব্যাঙ নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। একটি সদ্য চামড়া ছাড়ানো ব্যাঙ পিতলের আঙটা দিয়ে লোহার দড়ের সাথে আটকানো ছিল। তিনি লক্ষ করলেন যে, বাতাসে দোল খেয়ে যখনই ব্যাঙের পা লোহার দড়কে স্পর্শ করছে তখনই সেটি একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ছিটকে সরে যাচ্ছে। এ থেকে তিনি ভাবলেন যে ব্যাঙের শরীরই বিদ্যুতের উৎস।

সে সময় আবার ইটালির পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন আলেকসান্দ্রা ভোল্টা। তিনি গ্যালভানির মতের সাথে একমত হতে পারলেন না। তিনি মতপ্রকাশ করলেন, বিদ্যুতের উৎস ব্যাঙের শরীর নয়। দুইটি ভিন্ন জাতীয় ধাতু পিতল ও লোহার পরস্পরের সংস্পর্শে আসার ফলেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। ব্যাঙের শরীর বিদ্যুৎ পরিবাহী হিসেবে কাজ করে মাত্র। লোহাকে স্পর্শ করলে ব্যাঙের পায়ের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়ার জন্যই ঐ রকম ছিটকে যায়। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তাঁর মতবাদের সত্যতা হাতেনাতে প্রমাণ করে দেখান। তিনি অনেকগুলো একই আকারের তামা ও দস্তার পাত নিয়ে এমনভাবে সাজালেন যেনো পর্যায়ক্রমে দস্তা ও তামার পাত



চিত্র ১৫.৩ : ভোল্টার স্তূপ

একটির উপরে আরেকটি সাজানো থাকে। প্রতিটি দস্তা ও তামার পাতের মধ্যে পাতলা সালফিউরিক এসিডে ভেজানো কাপড় দিয়ে পাতগুলোকে পরস্পর থেকে আলাদা করলেন। এভাবে পাতগুলোর যে স্তূপটি গঠিত হল তার উপরে দস্তার পাত এবং নিচে তামার পাত থাকল। পাত দুইটিকে পরিবাহী তার দিয়ে একটি বাল্বের সাথে যুক্ত করে তিনি দেখালেন বাল্বটি জ্বলে উঠল অর্থাৎ তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়েছে। এভাবেই প্রথম বিদ্যুৎকোষ উদ্ভাবিত হয়।

সাধারণ বিদ্যুৎকোষ

রাসায়নিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে অবিরাম বিদ্যুৎ প্রবাহ বজায় রাখার কোন ব্যবস্থাকে বিদ্যুৎকোষ বলে। ভোল্টা মূলত যা আবিষ্কার করেন তা হল, দুইটি ভিন্ন জাতীয় পরিবাহীকে এসিড দিয়ে পৃথক করে বিদ্যুৎ প্রবাহ পাওয়া যায়। এ নীতির উপর ভিত্তি করে সাধারণ বিদ্যুৎকোষ নির্মাণ করা হয়। তাই এ কোষকে সরল ভোল্টীয় কোষও বলে।

প্রস্তুত প্রণালি

সাধারণ কোষ তৈরি করতে একটি কাচের পাত্র নেওয়া হয়। পাত্রটির প্রায় তিন চতুর্থাংশ পাতলা সালফিউরিক এসিড দিয়ে পূর্ণ করা হয়। একটি তামার পাত ও একটি দস্তার পাতকে পরস্পরের সঙ্গে স্পর্শ না করিয়ে খাড়া করে আংশিকভাবে এসিডের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়। পাত দুইটির উপরের প্রান্তে একটি করে স্ক্রু লাগানো থাকে। এই স্ক্রু সাথে তার লাগিয়ে বাইরের যার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করতে হবে তার দুই প্রান্তের সাথে যুক্ত করা হয়।

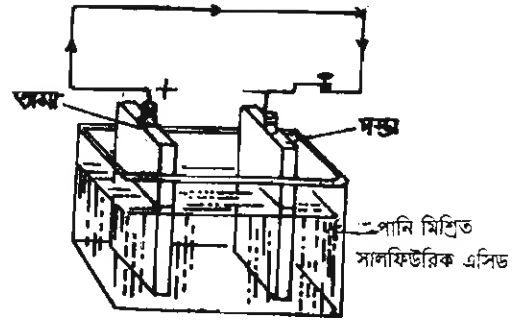
এসিডের সাথে দস্তার রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়। ফলে তামার পাতটি ধনাত্মক চার্জে এবং দস্তার পাতটি ঋণাত্মক চার্জে চার্জিত হয়। পাত দুইটিকে একটি পরিবাহী তার দিয়ে যুক্ত করলে দস্তার পাত থেকে তামার পাতের দিকে ইলেকট্রন প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তামার পাত থেকে দস্তার পাতের দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়।

সাধারণ কোষের কিছু ত্রুটি আছে। যার জন্য কিছুক্ষণ পর পরই বিদ্যুৎ প্রবাহ কম হয় বা থেমে যায়। দস্তার পাতও দ্রুত ক্ষয় হয়ে যায়। তাই বাস্তবে এ কোষ ব্যবহৃত হয় না। বিভিন্ন পদ্ধতিতে ত্রুটিমুক্ত করে ব্যবহারের জন্য উন্নত ধরনের কোষ বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন। এ ধরনের একটি কোষের নাম লেকল্যান্স কোষ।

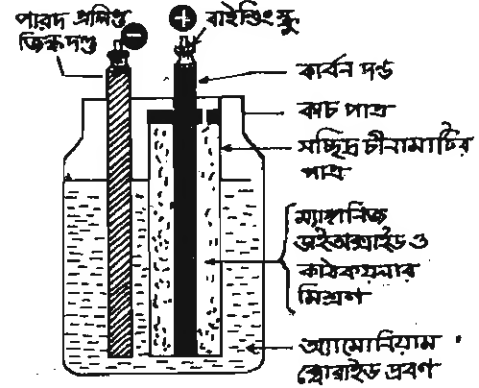
লেকল্যান্স কোষ

লেকল্যান্স কোষে সাধারণত একটি কাচের পাত্রে ঘন অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ থাকে। এর মধ্যে একটি পারদের প্রলেপ যুক্ত দস্তার দণ্ড এবং একটি সচ্ছিদ্র চীনা মাটির পাত্রকে ডুবিয়ে রাখা হয়। সচ্ছিদ্র পাত্রের মধ্যে একটি কার্বন দণ্ড খাড়াভাবে রেখে পাত্রটি ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড ও কয়লার গুঁড়ার (কার্বনের গুঁড়া) মিশ্রণ দিয়ে ভর্তি করা হয়। তারপর পাত্রের মুখটি পিচ দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। পিচের মধ্যে একটি ছোট ছিদ্র রাখা হয় যাতে ভিতরে উৎপন্ন গ্যাস বেরিয়ে যেতে পারে। দস্তা ও কার্বন দণ্ডের মাথায় একটি করে বন্ধনী স্ক্রু (বাইন্ডিং স্ক্রু) লাগানো থাকে।

এ কোষে কার্বন দণ্ড ধনাত্মক চার্জে এবং দস্তার দণ্ড ঋণাত্মক চার্জে চার্জিত হয়। দণ্ড দুটিকে একটি তার দিয়ে যুক্ত করলে কার্বন দণ্ড থেকে দস্তা দণ্ডের দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহ হয়।



চিত্র ১৫.৪ : সাধারণ বিদ্যুৎ কোষ

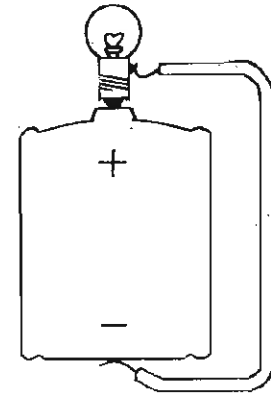


চিত্র ১৫.৫ : লেকল্যান্স কোষ

ব্যবহার : এ কোষ দিয়েও একটানা অনেকক্ষণ ধরে বিদ্যুৎ প্রবাহ বজায় রাখা যায় না। তাই যে সব ক্ষেত্রে বিরতিযুক্ত বিদ্যুৎ প্রবাহ দরকার, শুধুমাত্র সে সব ক্ষেত্রেই এ কোষ ব্যবহার করা হয়। বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ যন্ত্রে এ কোষ ব্যবহৃত হয়। সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় পরীক্ষাগারে বিভিন্ন পরীক্ষার কাজে।

বিদ্যুৎ বর্তনী

একটি টর্চ ব্যাটারির উপরে একটি টর্চ বাল্ব রাখ। বাল্বটি কি জ্বলবে? জ্বলবে না। একটি তার দিয়ে ব্যাটারি ও বাল্বটি যুক্ত কর, চিত্রে যেমন দেখান হয়েছে। এবার বাল্বটি জ্বলে উঠবে। বাল্ব এর ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়ার ফলেই সেটি জ্বলে। ব্যাটারির ধনাত্মক চার্জযুক্ত প্রান্ত থেকে বাল্ব এবং তারের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের এ পথকেই বিদ্যুৎ বর্তনী বলে। বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য সব সময় এ পথ বন্ধ বা পূর্ণ থাকতে হবে। কোন জায়গা খোলা থাকলে অর্থাৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকলে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় না। ঐ বর্তনীকে তখন খোলা বর্তনী বলে। বর্তনীতে একটি সুইচ বা চাবি লাগিয়ে সেটি খোলা বা বন্ধ করা যায়। তুমি যখন সুইচ অন কর তখন বর্তনী বন্ধ কর। যখন সুইচ অফ কর তখন বর্তনী খোল।

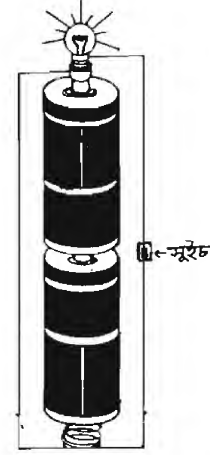


চিত্র ১৫.৭ : বিদ্যুৎ বর্তনী

সুতরাং বিদ্যুৎ উৎসের ধনাত্মক প্রান্ত থেকে ঋণাত্মক প্রান্তে বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য দুই প্রান্ত সংযোগকারী একটি বিদ্যুৎ পরিবাহী পূর্ণ বা বন্ধ পথ থাকতে হবে। এ পথকেই বিদ্যুৎ বর্তনী বলে।

টর্চ লাইটের কার্যনীতি

তোমরা সবাই টর্চ লাইট দেখেছ এবং হয়ত নিজেরাই ব্যবহার করেছ। টর্চ লাইট কীভাবে তৈরি করে, খেয়াল করেছে কী? দেখবে, টর্চ লাইট একটি চোঙাকৃতি ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরি। এ ধাতব খোলই বিদ্যুৎ পরিবাহী পথ হিসেবে কাজ করে। টর্চের সামনের দিক এমনভাবে তৈরি যাতে একটি বাল্ব পৌঁচিয়ে লাগান যায়। টর্চের মধ্যে ব্যাটারি ভরলে ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্তের সাথে বাল্ব এর নিচের প্রান্ত স্পর্শ করে থাকে। ব্যাটারি সরে যেয়ে বর্তনীতে যাতে কোন ফাঁক সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য একটি বিদ্যুৎ পরিবাহী স্প্রিং দিয়ে ব্যাটারিকে শক্ত করে রাখা হয়। স্প্রিংটি টর্চের নিচের ঢাকনার সাথে লাগানো থাকে। টর্চের গায়ে থাকে একটি সুইচ। এ সুইচ অন করলে বিদ্যুৎ বর্তনী পূর্ণ হয়, ফলে বাল্বটি জ্বলে ওঠে। সুইচ অফ করলে বর্তনীতে ফাঁক সৃষ্টি হয়, ফলে বাল্বটি নিভে যায়।



চিত্র ১৫.৮ : টর্চ লাইটের কার্যনীতি

টর্চের বাল্বটি খোলা না রেখে একটি অর্ধ গোলাকৃতি মসৃণ চকচকে বাটির মধ্যে রাখা হয়। সামনে একটি সমান কাচ থাকে। এতে বাল্বের আলো চারদিকে ছড়িয়ে যেতে পারে না। বাটিতে প্রতিফলিত হয়ে সব আলো সামনের দিকে পড়ে। ফলে সামনের আলোর ঔজ্জ্বল্য বাড়ে।

বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার

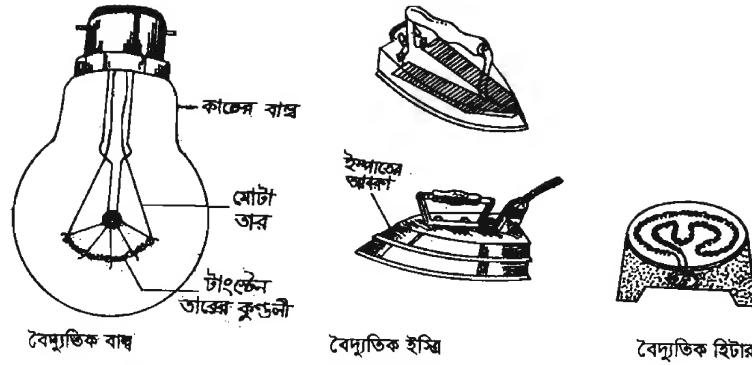
বিদ্যুৎ এক প্রকার শক্তি। সুতরাং বিদ্যুৎ শক্তিকে অন্যান্য শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। আমরা দৈনন্দিন জীবনের নানা কাজে বিদ্যুৎ শক্তিকে আলোক শক্তি এবং তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত করে ব্যবহার করে থাকি।

বৈদ্যুতিক বাল্ব : তুমি যখন বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালাও তখন বিদ্যুৎ শক্তিকে আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত কর। কোনো পরিবাহী তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে তারটি গরম হয়। তার যত সরল হয়, তত বেশি গরম হয়। আর যত বেশি গরম হয়, তত বেশি লাল হতে হতে শেষে সাদা ও উজ্জ্বল হয়ে যায়। ফলে তারটি থেকে আলো বের হয়। বৈদ্যুতিক বাল্বে এ ঘটনাই ঘটে। তাই বাল্ব জ্বলাকালে অত্যন্ত গরম হয়। তুমি খালি হাতে কখনো জ্বলন্ত বৈদ্যুতিক বাল্ব স্পর্শ করবে না। করলে হাত পুড়ে যেতে পারে।

বৈদ্যুতিক বাল্বের ভেতরে খুব সরু তারের একটি কুণ্ডলী থাকে। এ কুণ্ডলীকে ফিলামেন্ট বলে। ফিলামেন্ট টাংস্টেনের তার দিয়ে তৈরি। টাংস্টেনের গলনাঙ্ক অত্যন্ত বেশি, প্রায় 3410° সেলসিয়াস। তাই অনেক গরম হলেও এটি গলে যায় না। বাল্বটি সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য। সামান্য নাইট্রোজেন বা নিষ্ক্রিয় গ্যাস আর্গন ভরা থাকে।

তুমি যখন কোনো বৈদ্যুতিক বাতির সুইচ অন কর, তখন সেই বাল্বের ফিলামেন্টের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। ফলে অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে আলো দেয়। মার্কিন বিজ্ঞানী টমাস এডিসন ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কার করেন।

বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি : বৈদ্যুতিক ইস্ত্রিতেও বিদ্যুতের তাপ উৎপন্ন করার ধর্মকে কাজে লাগানো হয়। এতে একটি অত্রেয় প্লেটের গায়ে সরু নাইক্রোমের তার জড়ান থাকে। এ প্লেটের উপরে ও নিচে দুইটি অত্রেয় পাত দিয়ে ঢেকে লোহার পাত দিয়ে চেপে রাখা হয়। অত্র বিদ্যুৎ অপরিবাহী, কিন্তু তাপ পরিবাহী। তাই তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে তা লোহাকে স্পর্শ করে না। কিন্তু তার উত্তপ্ত হলে তা লোহাকে উত্তপ্ত করে। ইস্ত্রির বাইরের আবরণটি স্টেইনলেস স্টীলের তৈরি, ত্রিভুজাকৃতি এবং ভারী। নিচের তল খুব মসৃণ করা থাকে। তারের কুণ্ডলীর দুই প্রান্ত লম্বা মোটা তারের সাহায্যে প্রাণের সাথে লাগান থাকে। প্রাণ অন করলে কুণ্ডলীর ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে তাকে উত্তপ্ত করে। ফলে বাইরের ধাতব আবরণটি উত্তপ্ত হয়।



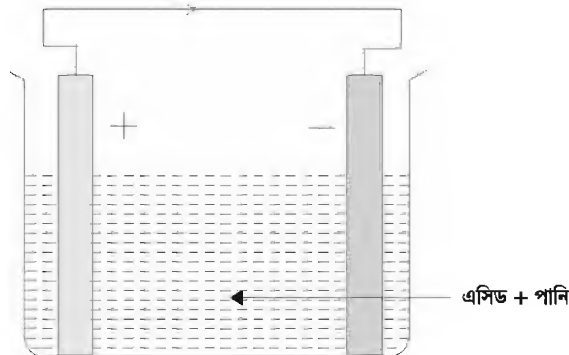
চিত্র ১৫.৯ : বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত

বৈদ্যুতিক হিটার : এতে চীনাটিরের তৈরি একটি গোল চাকতি থাকে। চাকতির মধ্য প্যাচানো খাঁজ কাটা থাকে। একটি নাইক্রোমের সরু লম্বা তারকে কুণ্ডলী করে এ খাঁজে বসানো থাকে। পায়াক্ত একটি ধাতব ফ্লেমের মধ্যে চাকতিটি বসানো থাকে। কুণ্ডলীর দুই প্রান্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের সাথে সংযোগের ব্যবস্থা থাকে। কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে তা উত্তপ্ত হয়ে লাল হয়ে যায় এবং প্রচুর তাপ বিকিরণ করে। এ তাপে রান্না বান্না করা যায়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- বিদ্যুৎ কোষ কে আবিষ্কার করেন?
 - লুইগি গ্যালভানি
 - জর্জ লেকল্যান্ড
 - আলোকসান্দ্রা ভোল্টা
 - টমাস এডিসন
- বিদ্যুৎ কোষে কোন শক্তিকে কোন শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়?
 - যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে
 - তাপ শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে
 - রাসায়নিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে
 - আলোক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে
- বৈদ্যুতিক বাল্বের ফিলামেন্ট কিসের তার দিয়ে তৈরি?
 - ইস্পাতের
 - টাংস্টেনের
 - নিকেলের
 - নাইক্রোমের
- লেকল্যান্ড কোষে ধনাত্মক দণ্ড হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
 - কার্বন
 - দস্তা
 - তামা
 - লোহা
- নিচের কোন বিবৃতিটি সঠিক?
 - বিদ্যুৎ সকল সময় উচ্চাপ হতে নিম্নচাপে প্রবাহিত হয়
 - ধনাত্মক চার্জে চার্জিত বস্তুর বৈদ্যুতিক চাপ কম থাকে
 - লেকল্যান্ড কোষে ম্যাগনেসিয়াম ডাইঅক্সাইড এবং কার্বন গুঁড়ার মিশ্রণ ব্যবহৃত হয়
 - তড়িৎ প্রবাহের দিক এবং ইলেকট্রন প্রবাহের দিক একই দিকে থাকে



চিত্রের আলোকে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৬. কোষের অভ্যন্তরে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়।
- উচ্চাপ হতে নিম্নচাপের দিকে
 - নিম্নচাপ হতে উচ্চ চাপের দিকে
 - বেশি সংখ্যক ইলেক্ট্রন হতে কম সংখ্যক ইলেক্ট্রনের দিকে

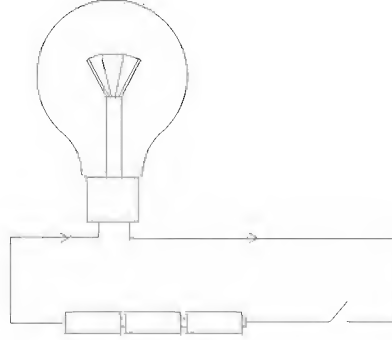
নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

৭. বিদ্যুৎ কোষটির দুই প্রান্ত পরিবাহী দিয়ে যুক্ত করলে
- দস্তার পাত হতে তামার পাতে ইলেক্ট্রন প্রবাহিত হয়
 - তামার পাত হতে দস্তার পাতে ইলেক্ট্রন প্রবাহিত হয়
 - তামার পাত হতে দস্তার পাতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়
 - দস্তার পাত হতে তামার পাতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়

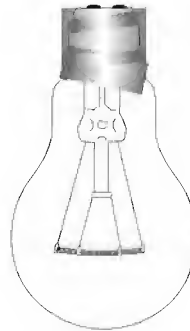
সৃজনশীল প্রশ্ন

১.



- বর্তনীতে সুইচ কী কাজে ব্যবহৃত হয় ?
- বর্তনীর তড়িৎ প্রবাহ ব্যাখ্যা কর।
- বর্তনীতে শক্তির রূপান্তর ব্যাখ্যা কর।
- ব্যাটারির স্থলে ল্যাকল্যান্স কোষ ব্যবহারে বর্তনীতে বিদ্যুৎ প্রবাহ সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

২.



বৈদ্যুতিক বাম্ব

- বাল্বটির ভেতরের গ্যাসটির নাম লিখ
- এ গ্যাসটির কাজ ব্যাখ্যা কর।
- একটি ব্যাটারির সাহায্যে বাল্বটি সংযোগ করে তড়িৎ প্রবাহ ব্যাখ্যা কর।
- অতিরিক্ত বৈদ্যুতিক প্রবাহের ফলে বাল্বটিতে কী ঘটতে পারে বলে তুমি মনে কর কারণসহ লিখ।

ষোড়শ অধ্যায়

ভূত্বক ও শিলা

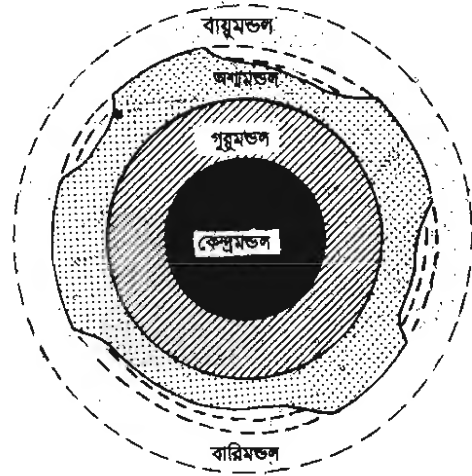
ভূঅভ্যন্তরের স্তরবিন্যাস

তোমরা আগেই জেনেছ যে পৃথিবী জন্মের সময় অত্যন্ত উত্তপ্ত গ্যাসীয় অবস্থায় ছিল। ধীরে ধীরে তাপ বিকিরণ করে প্রথমে তরল, পরে আরও শীতল হয়ে কঠিন আকার ধারণ করে। পৃথিবীর উপরিভাগের এ কঠিন আবরণের নাম দেওয়া হয়েছে ভূত্বক। এ ভূত্বকের নিচের তরল অংশ বিভিন্ন উপাদান দ্বারা গঠিত। পৃথিবীর অভ্যন্তরের তরল উপাদানগুলোর মধ্যে বেশি ভারীগুলো পৃথিবীর কেন্দ্রে, অপেক্ষাকৃত কম ভারীগুলো এর উপর এবং হালকাগুলো ভূত্বকের নিচে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত রয়েছে। ভূঅভ্যন্তরে এরূপভাবে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হওয়াকে ভূঅভ্যন্তরীণ স্তরবিন্যাস বলে। ভূতত্ত্ববিদগণ এ স্তরবিন্যাসকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যথা : (১) অশ্মমণ্ডল, (২) গুরুমণ্ডল ও (৩) কেন্দ্রমণ্ডল।

(১) অশ্মমণ্ডল : ভূত্বক ও তার নিম্নভাগ নিয়ে অশ্মমণ্ডল গঠিত। অশ্মমণ্ডলের উপরিভাগের পাতলা স্তরকে ভূত্বক বলে। এ অশ্মমণ্ডলের গভীরতা ১৬ থেকে ৪০ কিলোমিটার। অশ্মমণ্ডল অক্সিজেন, সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি উপাদান দ্বারা গঠিত। অশ্মমণ্ডলকে আমরা দুইটি স্তরে ভাগ করতে পারি। যথা : সিয়াল (Sial) ও সিমা (Sima) স্তর। সিলিকন ও অ্যালুমিনিয়ামের দ্বারা গঠিত সিয়াল স্তরটি সিলিকন ও ম্যাগনেসিয়াম দ্বারা গঠিত সিমা স্তরের চেয়ে হালকা। এ জন্য এ স্তরটি সিমা স্তরের উপরে অবস্থান করছে। এ অশ্মমণ্ডলের উপরিভাগ বায়ুমণ্ডল দ্বারা বেষ্টিত।

(২) গুরুমণ্ডল : অশ্মমণ্ডলের নিচে প্রায় ২,৮৮৫ কিলোমিটার পর্যন্ত গভীর মণ্ডলকে গুরুমণ্ডল বলা হয়। এ মণ্ডলটিও প্রধানত সিলিকন ও ম্যাগনেসিয়াম দ্বারা গঠিত। এ মণ্ডলটি বেশ উত্তপ্ত এবং এর চারদিকে প্রচণ্ড চাপ রয়েছে। এ কারণে এখানে অবস্থিত পদার্থসমূহ অনেকটা ঘন আলকাতরার মত কঠিন ও তরল অবস্থার মাঝামাঝি অবস্থায় আছে।

(৩) কেন্দ্রমণ্ডল : গুরুমণ্ডলের নিচে প্রায় ৩,৪৮৬ কিলোমিটার পর্যন্ত পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে বিস্তৃত মণ্ডলকে কেন্দ্রমণ্ডল বলে। কেন্দ্রমণ্ডল প্রধানত ভারী উপাদান যেমন, লোহা ও নিকেল দ্বারা গঠিত।



চিত্র ১৬.১ : পৃথিবীর স্তরবিন্যাস

ভূত্বক ও তার উপাদান

পৃথিবীর বাইরের কঠিন আবরণকে ভূত্বক বলে। এ ভূত্বক বিভিন্ন ধরনের শিলা ও খনিজ পদার্থ দ্বারা গঠিত। ভূত্বক যে সব উপাদান দ্বারা গঠিত সেগুলো হল অক্সিজেন, সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, লোহা, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও পটাসিয়াম। তবে ভূত্বকের শিলায় গড়ে শতকরা ৭৩.০৭ ভাগ অক্সিজেন ও সিলিকন এবং শতকরা প্রায় ২৬.৯৩ ভাগ অন্যান্য উপাদান থাকে।

খনিজ

ভূপৃষ্ঠ নানাপ্রকারের শিলা দ্বারা গঠিত। এ শিলা বিভিন্ন খনিজ উপাদানে তৈরি। খনিজ হল দুই বা ততোধিক মৌলিক উপাদান দ্বারা প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্ট পদার্থ যেমন : কোয়ার্টজ, ট্যাক্স, টোপাজ (পোখরাজ)। তোমরা হয়ত জান যে আমরা শরীরে যে ট্যালকম পাউডার ব্যবহার করি তা এ ট্যাক্স খনিজের গুঁড়ো। তবে এতে অল্প পরিমাণ সুগন্ধি ও গন্ধ প্রয়োজনে মেশানো হয়।

শিলা

ভূত্বক যে সকল উপাদান দ্বারা গঠিত তার সাধারণ নাম শিলা। দুই বা ততোধিক খনিজ পদার্থের সংমিশ্রণে এ সব শিলার সৃষ্টি হয়। শিলা বলতে কেবল কঠিন পদার্থকে বোঝায় না। তোমরা উঁচু শ্রেণীতে জানতে পারবে কাদা বা বালিও শিলার এক ধরনের রূপ।

শিলার শ্রেণীবিভাগ

উৎপত্তির ওপর ভিত্তি করে শিলাসমূহকে প্রধান তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা :

- (১) আগ্নেয় বা প্রাথমিক শিলা : যথা : গ্রানাইট, ব্যাসল্ট, ডোলোরাইট ইত্যাদি।
- (২) পাললিক বা স্তরীভূত শিলা : যথা : বেলেপাথর, চুনাপাথর, কয়লা, সৈন্ধব লবণ ইত্যাদি।
- (৩) রূপান্তরিত শিলা : যথা : মার্বেল, স্লেট, নিস, গ্রাফাইট ইত্যাদি।

(১) আগ্নেয় বা প্রাথমিক শিলা : কোটি কোটি বছর আগে উদ্ভূত পৃথিবী ঠাণ্ডা ও কঠিন হওয়ার সময় ভূপৃষ্ঠে সর্বপ্রথম যে শিলা গঠিত হয় তাকে প্রাথমিক শিলা বলে। এ শিলা উদ্ভূত গলিত পদার্থ থেকে সৃষ্টি হয়েছে বলে একে আগ্নেয় শিলা বলে। এ আগ্নেয় শিলায় কোনো স্তর নেই বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে অস্তরীভূত শিলা। এ জাতীয় শিলায় কোনো জীবাশ্ম নেই বলে একে অজীবাশ্ম শিলাও বলা হয়। বিভিন্ন প্রাণীর মৃতদেহ, গাছপালা লক্ষ লক্ষ বছর শিলাস্তরের মাঝে চাপা পড়ে জীবাশ্ম সৃষ্টি করে। গাছপালা বা অন্য কোনো প্রাণী ভীষণ উদ্ভূত গলিত পদার্থে ভস্ম বা গ্যাস হয়ে যায়। এ জন্য আগ্নেয় শিলায় জীবাশ্ম দেখা যায় না।

আগ্নেয় শিলার শ্রেণীবিভাগ

আগ্নেয় শিলাকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা : বহিঃজ ও অন্তঃজ আগ্নেয় শিলা। পৃথিবীর অভ্যন্তরের উদ্ভূত গলিত পদার্থ আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ বা ফাটল দিয়ে পৃথিবীর উপরে এসে ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে যে শিলার সৃষ্টি করে তাকে বহিঃজ আগ্নেয় শিলা বলে। এ শিলার কণা সূক্ষ্ম ও মসৃণ। সে কারণে এ জাতীয় শিলা খুব শক্ত। ব্যাসল্ট, পিউমিক পাথর, ব্রেসিয়া, টাফ প্রভৃতি বহিঃজ আগ্নেয় শিলার উদাহরণ।

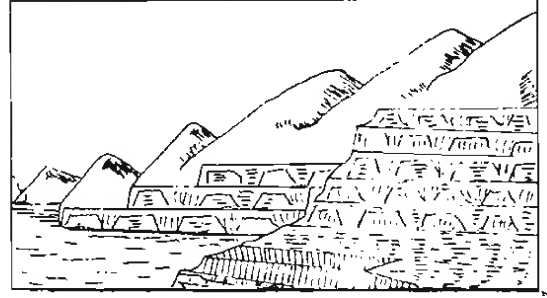
আবার কোনো কোনো সময় এ গলিত পদার্থ পৃথিবীর অভ্যন্তরে জমাট বেঁধে যে শিলার সৃষ্টি করে তাকে অন্তঃজ আগ্নেয় শিলা বলে। গ্রানাইট ও গ্যাব্রো অন্তঃজ আগ্নেয় শিলার উদাহরণ।

আগ্নেয় শিলার বৈশিষ্ট্য

- (১) স্তরবিহীন শিলা।
- (২) এ শিলায় কোনো জীবাশ্ম নেই।
- (৩) নির্দিষ্ট আকারে দানা বাঁধে।
- (৪) খুব শক্ত শিলা।

(২) পাললিক বা স্তরীভূত শিলা : উত্তাপ, বৃষ্টি, বায়ু, তুষার, হিমবাহ, নদী, সমুদ্রস্রোত ও তরঙ্গের আঘাতে আগ্নেয় শিলা চূর্ণবিচূর্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কাঁকর, নুড়ি, বালিকণায় পরিণত হয়। এরূপে ক্ষয়িত শিলাকণা নদী প্রবাহ ও বায়ুপ্রবাহ দ্বারা বাহিত হয়ে হ্রদ, সাগর বা মহাসাগরের তলদেশে পলি বা তলানিরূপে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়। ভূগর্ভের নিচের

উত্তাপ, জীবজন্তুর হাড়ের চূর্ণ ও নানাবিধ উদ্ভিদ দেহের রাসায়নিক ক্রিয়ায় ও উপরের পানির চাপে নিম্নস্তরের সঞ্চিত তলানি জমাট বেঁধে শিলায় পরিণত হয়। পলি দ্বারা এ শিলা গঠিত হয় বলে একে পাললিক শিলা বলে। এ পাললিক শিলায় জীবাশ্ম থাকে। এ শিলা স্তরে স্তরে গঠিত হয় বলে একে স্তরীভূত শিলাও বলে। হিমালয় ও আঙ্গস পর্বত পাললিক শিলা দ্বারা গঠিত পর্বত।



চিত্র ১৬.২ : পাললিক শিলা

পাললিক শিলার বৈশিষ্ট্য

- (১) স্তরে স্তরে গঠিত শিলা।
- (২) এ শিলায় জীবাশ্ম পাওয়া যায়।
- (৩) এ শিলায় খনিজ তেল (যেমন, পেট্রোল) পাওয়া যায়।

(৩) রূপান্তরিত শিলা : অনেক জায়গায় বিভিন্ন কারণে আগ্নেয় ও পাললিক শিলা ভূগর্ভের বেশ নিচে অবস্থান করে। ভূগর্ভের প্রচণ্ড উত্তাপ, চাপ ও রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে পরিবর্তিত হয়ে এক প্রকার নতুন শিলার সৃষ্টি হয়। এ শিলাকে রূপান্তরিত শিলা বলে। যেমন, বেলেপাথর রূপান্তরিত হয়ে কোয়ার্টজাইটে, চুনাপাথর রূপান্তরিত হয়ে মার্বেলে পরিণত হয় এবং কয়লা রূপান্তরিত হয়ে গ্রাফাইটে ও কাদা স্লেটে পরিণত হয়। পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি হল তাজমহল। এ তাজমহল মার্বেল দিয়ে নির্মিত।

রূপান্তরিত শিলার বৈশিষ্ট্য

- (১) এটি শিলার একটি পরিবর্তিত রূপ।
- (২) এ শিলা অত্যধিক কঠিন বলে সহজে ক্ষয় হয় না।

শিলার অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও ব্যবহার

শিলা মানুষের নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া শিলা আমদানি-রপ্তানি করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা সম্ভব হয়। শিলার চূর্ণবিচূর্ণ অংশের সাথে বিভিন্ন জৈব পদার্থ মিশে মাটি তৈরি হয়। এ মাটির উপরেই মানুষ বাস করে এবং ফসল ফলায়।

- (১) মাটির গুণাগুণ ও উর্বরতা, পানি ধরে রাখার ক্ষমতা ইত্যাদি নিচের শিলার প্রকারের ওপর নির্ভর করে।
- (২) কোনো অঞ্চলের পানি ঐ অঞ্চলের শিলার প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল।
- (৩) গ্রানাইট ও ব্যাসল্ট রাস্তা প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়।
- (৪) চুনাপাথর, বেলেপাথর ও গ্রানাইট দালানকোঠা তৈরিতে মালমশলা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- (৫) চুনাপাথর চুন ও সিমেন্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
- (৬) কয়লা ও খনিজ তেল জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- (৭) কাদাপাথর যথা চীনাটি বা চায়না ক্লে, ফায়ার ক্লে, মুর্থশিল্পে ব্যবহৃত হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ্রানাইট ও ব্যাসল্ট ব্যবহৃত হয়

ক. রাস্তা প্রস্তুত করতে	খ. সিমেন্ট তৈরি করতে
গ. বাড়ির প্রাচীর দিতে	ঘ. সকল কাজে
২. কোনটি রূপান্তরিত শিলা ?

ক. চুনাপাথর	খ. গ্রানাইট
গ. মার্বেল	ঘ. ব্যাসল্ট
৩. কোনটি দুই বা ততোধিক মৌলিক উপাদানে গঠিত খনিজ ?

ক. রুপা	খ. জিপসাম
গ. হীরা	ঘ. কোয়ার্টজ
৪. গ্রাফাইট কোন শ্রেণীর শিলা ?

ক. আগ্নেয়	খ. পাললিক
গ. রূপান্তরিত	ঘ. কাদা
৫. পাললিক শিলার আর এক নাম

ক. স্তরীভূত শিলা	খ. প্রাথমিক শিলা
গ. রূপান্তরিত শিলা	ঘ. অন্তঃজ শিলা
৬. অনেক জায়গায় বিভিন্ন কারণে আগ্নেয় ও পাললিক শিলা ভূগর্ভের বেশ নিচে অবস্থান করে। ভূগর্ভের প্রচণ্ড উত্তাপ, চাপ ও রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে পরিবর্তিত হয়ে এক প্রকার নতুন শিলার সৃষ্টি হয়। যেমন
 - i. বেলে পাথর রূপান্তরিত হয় কোয়ার্টজাইটে
 - ii. চুনাপাথর রূপান্তরিত হয় মার্বেলে
 - iii. কাদা রূপান্তরিত হয় গ্রাফাইটে

নিচের কোনটি সঠিক ?

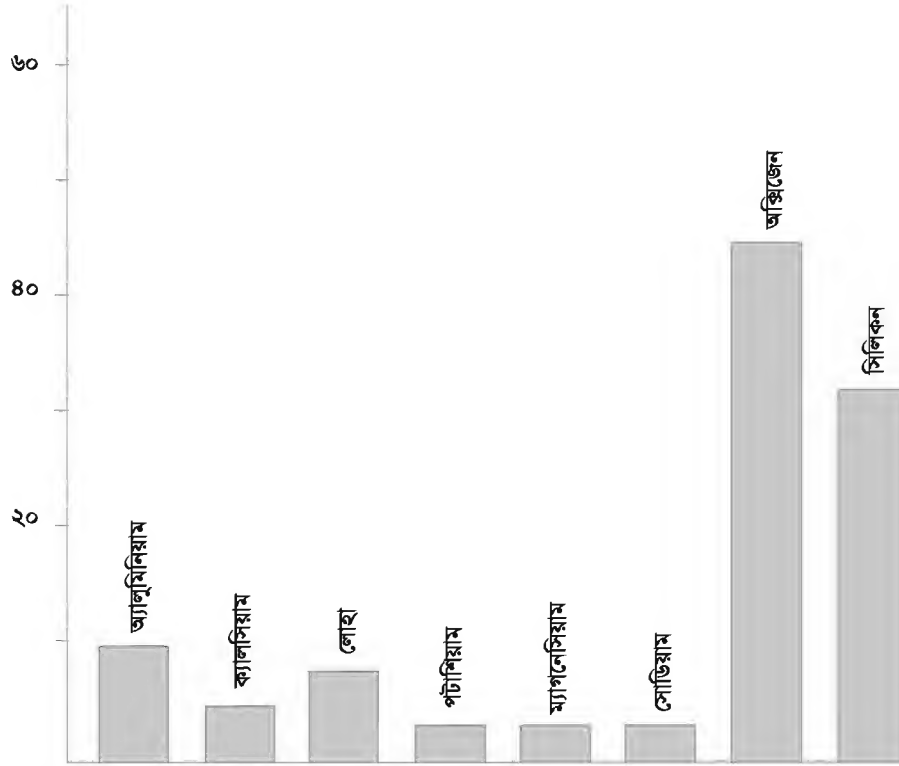
- | | |
|------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রহিম সাহেব ক, খ এবং গ নামে তিনটি শিলা দেখিয়ে বললেন ‘ক’ নমুনার শিলা রাস্তা নির্মাণে, ‘খ’ নমুনার শিলা সিমেন্ট তৈরিতে এবং ‘গ’ নমুনার শিলা লেখার স্লেট হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

ক. স্লেট হিসেবে ব্যবহৃত শিলার নাম কি?	খ. ‘ক’ নমুনার শিলার দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।
গ. ‘খ’ নমুনার শিলা কীভাবে ‘গ’ নমুনার শিলায় পরিণত হয় ব্যাখ্যা কর।	ঘ. ‘ক’ নমুনা শিলায় জীবাণু থাকে না কেন? যুক্তিসহ আলোচনা কর।

২.



গ্রাফে ভূত্বকে পাওয়া এমন মৌলিক পদার্থগুলো দেখানো হয়েছে।

- ভূত্বকে কোন মৌলটি সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়
- প্রাচুর্যের ক্রম অনুযায়ী মৌলিক পদার্থগুলোকে সাজাও।
- সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় এমন তিনটি মৌলের আপাত শতকরা পরিমাণ নির্ণয় কর।
- পৃথিবীর স্তর অনুযায়ী গ্রাফে উল্লেখিত মৌলগুলোর অবস্থান নির্ণয় কর।

সপ্তদশ অধ্যায়

সাগর ও মহাসাগর

আমরা ইতোপূর্বে সাগর, মহাসাগর ও উপসাগর সম্বন্ধে কিছু কিছু জেনেছি। এ অধ্যায়ে সাগর, মহাসাগর ও উপসাগর সম্পর্কে আরও বিশদভাবে জানব। ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৭১ ভাগ স্থান জুড়ে রয়েছে পাঁচটি মহাসাগর। এ মহাসাগরগুলো হল-

১) প্রশান্ত মহাসাগর, (২) আটলান্টিক মহাসাগর, (৩) ভারত মহাসাগর, (৪) উত্তর মহাসাগর ও (৫) দক্ষিণ মহাসাগর। ভূপৃষ্ঠের বিশাল, বিস্তৃত ও সুগভীর জলরাশিকে মহাসাগর বলে। যেমন প্রশান্ত মহাসাগর আয়তন ও গভীরতায় সর্ববৃহৎ। মহাসাগর অপেক্ষা ছোট বা স্থলভাগের নিকটবর্তী মহাসাগরের অংশকে সাগর বলে। যেমন, আরব সাগর, জাপান সাগর, লোহিত সাগর ইত্যাদি। যে সাগরের তিনদিক স্থল দ্বারা বেষ্টিত তাকে উপসাগর বলে। যেমন, জোপসাগর, মালয় উপসাগর। তবে কোনো কোনো সাগরের প্রায় চারদিক স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত থাকতে পারে। যেমন, ভূমধ্যসাগর। চল এবার আমরা মহাসাগরগুলো সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি।

মহাসাগরের বিবরণ

১) **প্রশান্ত মহাসাগর** : বৃহত্তম মহাসাগর। প্রশান্ত মহাসাগরের আয়তন প্রায় ১৬ কোটি ৬০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। এ মহাসাগর ভূপৃষ্ঠের আয়তনের তিন ভাগের এক ভাগ জুড়ে রয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব দিকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং পশ্চিমে এশিয়া ও দক্ষিণে এন্টার্কটিকা মহাদেশ। এর গড় গভীরতা প্রায় ৪,২৭০ মিটার। প্রশান্ত মহাসাগরে অনেকগুলো গভীর খাত আছে। ফিলিপাইনের মিন্দানাও এর নিকট ম্যারিয়ানা পৃথিবীর গভীরতম সমুদ্রখাত। এ খাতের গভীরতা প্রায় ১০,৮৭০ মিটার। এ মহাসাগরে ছোটবড় বহু দ্বীপপুঞ্জ আছে। এদের মধ্যে কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ, জাপান দ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ এবং নিউজিল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম প্রান্তে কতকগুলো বিচ্ছিন্ন সাগর আছে। যেমন, বেরিং সাগর, ওখটস্ক সাগর, জাপান সাগর, পীত সাগর, পূর্ব ও দক্ষিণ চীন সাগর।

২) **আটলান্টিক মহাসাগর** : এ মহাসাগরের আয়তন প্রায় ৮ কোটি ২৪ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। অর্থাৎ আয়তনে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রায় অর্ধেক। ভূপৃষ্ঠের আয়তনের ছয় ভাগের এক ভাগ জুড়ে রয়েছে এ মহাসাগর। এ মহাসাগরের পূর্ব দিকে ইউরোপ ও আফ্রিকা এবং পশ্চিমে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা। এর আকৃতি ইংরেজি অক্ষর 'S' এর মত। গভীরতা প্রশান্ত মহাসাগরের তুলনায় কম। এর গড় গভীরতা প্রায় ৩,৯৩২ মিটার। পোর্টোরিকো খাত আটলান্টিক মহাসাগরের গভীরতম খাত। এ মহাসাগরের তলদেশের মধ্যভাগে শৈলশিরা বা পর্বতমালা রয়েছে। উত্তর আমেরিকার ডলফিন, গ্যালেঞ্জার নামক বিভিন্ন ধরনের মালভূমি সদৃশ উচ্চভূমি রয়েছে। তা ছাড়া আটলান্টিক মহাসাগরের অন্তর্গত আইসল্যান্ড, ফকল্যান্ড, জর্জিয়া, সেন্ট হেলেনস, ব্রাজিল দ্বীপপুঞ্জ, প্রবাল দ্বীপপুঞ্জ বারমুডা এবং আগুয়েগিরি গঠিত দ্বীপ ম্যাডিরা উল্লেখযোগ্য। আটলান্টিক মহাসাগরের উল্লেখযোগ্য সাগর ও উপসাগর হল - উত্তর সাগর, বাল্টিক সাগর, ক্যারিবিয়ান সাগর এবং হাডসন উপসাগর, ব্যাফিন উপসাগর ও মেক্সিকো উপসাগর।

৩) **ভারত মহাসাগর** : এ মহাসাগরের উত্তরে এশিয়া, দক্ষিণে এন্টার্কটিকা, পূর্বে অস্ট্রেলিয়া ও পশ্চিমে আফ্রিকা মহাদেশ অবস্থিত। আয়তন প্রায় ৭ কোটি ৩৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। এর গড় গভীরতা প্রায় ৩,৯৬২ মিটার। ভারত মহাসাগরে সুভাখাত নামে জাভা দ্বীপের দক্ষিণে একটি সমুদ্রখাত রয়েছে। মাদাগাস্কার ও শ্রীলঙ্কা ভারত মহাসাগরের পশ্চিম দ্বীপ। তা ছাড়া আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে। লাক্ষা ও মালদ্বীপ ভারত মহাসাগরের প্রবাল গঠিত দ্বীপ। ভারত মহাসাগরের বিখ্যাত সাগর হল - আরব সাগর ও লোহিত সাগর এবং উপসাগর হল বঙ্গোপসাগর ও পারস্য উপসাগর।

(৪) উত্তর মহাসাগর : উত্তর মহাসাগর উত্তর গোলার্ধের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। এর চারদিক স্থলবেষ্টিত। আয়তন প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। এ মহাসাগর আয়তনে প্রশান্ত মহাসাগরের বার ভাগের এক ভাগ এবং গড় গভীরতা প্রায় ৮২৪ মিটার। উত্তর মহাসাগরে কয়েকটি অগভীর সাগর রয়েছে। এর মধ্যে বিউফোর্ট সাগর ও সাইবেরিয়া সাগর উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া কিছু দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে। এর মধ্যে নিউ সাইবেরিয়ার দ্বীপপুঞ্জ ও কানাডার দ্বীপপুঞ্জসমূহ প্রধান।

(৫) দক্ষিণ মহাসাগর : দক্ষিণ মহাসাগর এন্টার্কটিকা মহাদেশকে ঘিরে রেখেছে। অর্থাৎ দক্ষিণ মহাসাগর এন্টার্কটিকার উত্তরে অবস্থিত। মহাসাগরের আয়তন প্রায় ১ কোটি ৪৭ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। তাছাড়া দক্ষিণ মহাসাগর সারা বছর বরফে ঢাকা থাকে এবং গড় গভীরতা প্রায় ১৪৯ মিটার। এ মহাসাগরের তলদেশে অবস্থিত মালভূমি অস্ট্রেলিয়া ও এন্টার্কটিকা মহাদেশকে যুক্ত করেছে।

সমুদ্রস্রোত

মানুষ, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি কোনো স্থানে স্থির থাকে না। এরা একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলাচল করে থাকে। কিন্তু ঠেলাগাড়ি, নৌকা, সাইকেল, লঞ্চ, মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি, উড়োজাহাজ ইত্যাদি নিজেরা চলে না, অন্যেরা চালায়। তেমনিভাবে বায়ুপ্রবাহ, পৃথিবীর আবর্তন ইত্যাদি দ্বারা সমুদ্রের পানি একস্থান থেকে অন্যস্থানে প্রবাহিত হয়। সমুদ্রের বা সাগর ও মহাসাগরের পানির নিয়মিত প্রবাহকে সমুদ্রস্রোত বলে। যেমন, আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের স্রোত।

সমুদ্রস্রোতের কারণ

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে, সমুদ্রস্রোত আপনা আপনি সৃষ্টি হয় না। স্রোত উৎপন্ন হওয়ার জন্য কিছু কারণ রয়েছে। নিচে সমুদ্রস্রোতের প্রধান কারণ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।

(১) বায়ুপ্রবাহ : সমুদ্রস্রোত উৎপত্তির অন্যতম প্রধান কারণ বায়ুপ্রবাহ। সমুদ্রের উপর সর্বদা বায়ু প্রবাহিত হওয়ার ফলে সমুদ্রের পানি বায়ুপ্রবাহের দিক অনুসরণ করে প্রবাহিত হয়। ঋতুর পরিবর্তনে বায়ুপ্রবাহের দিক পরিবর্তিত হয়। ফলে সমুদ্রস্রোতেরও দিক পরিবর্তন ঘটে। যেমন, বাংলাদেশের মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ।

(২) পৃথিবীর আবর্তন : পৃথিবীর আবর্তনের ফলে সমুদ্রস্রোতের সৃষ্টি হয়। পৃথিবী তার নিজ অক্ষে ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে যে আবর্তন করে তাকে পৃথিবীর আহ্নিক গতি বলে। পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্য সমুদ্রের পানি পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে স্রোতের সৃষ্টি করে। পৃথিবীর আবর্তন সমুদ্রস্রোতের অন্যতম প্রধান কারণ।

(৩) উষ্ণতার তারতম্য : সমুদ্রের বিভিন্ন স্থানে সূর্যের তাপের তারতম্যের জন্য সমুদ্রস্রোতের সৃষ্টি হয়। যেখানে সূর্যের তাপ লম্বাভাবে পড়ে সেখানের পানি অধিক বাষ্প হয়ে উপরে উঠে এবং যেখানে সূর্যের তাপ বক্র বা তির্যকভাবে পড়ে সেখানে পানি কম বাষ্পে পরিণত হয়। এতে পানির উচ্চতা ও ঘনত্বের সমতা নষ্ট হয়। সমতা রক্ষার জন্য পানি বক্রভাবে সূর্যের তাপ পতিত অঞ্চল থেকে খাড়াভাবে পতিত অঞ্চলে প্রবাহিত হয়। ফলে সমুদ্রস্রোতের সৃষ্টি হয়।

(৪) লবণাক্ততা : লবণাক্ত পানির ঘনত্ব বেশি ও ভারী। কিন্তু স্বাদু পানির ঘনত্ব কম ও হালকা। সে কারণে উষ্ণ অঞ্চলের লবণাক্ত পানি শীতল অঞ্চলের কম লবণাক্ত পানির দিকে প্রবাহিত হয়। এ ছাড়া অধিক লবণাক্ত পানি ভারী বলে নিচের দিকে নেমে যায়। অপরদিকে কম লবণাক্ত পানি অপেক্ষাকৃত হালকা বলে উপরের দিকে উঠে আসে। এরূপভাবে সমুদ্রে উর্ধ্বস্রোত এবং নিম্নস্রোতের সৃষ্টি হয়।

সমুদ্রস্রোতের প্রভাব

সমুদ্রস্রোতের ফলে (ক) জাহাজ চলাচলের সুবিধা হয়। কারণ সমুদ্রস্রোতের গতির সাথে তাল মিলিয়ে চললে জাহাজ দ্রুত একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে পারে, (খ) সমুদ্রের উষ্ণ স্রোতের ফলে সমুদ্রে পানি সহজে বরফ হয় না, (গ) উষ্ণ স্রোতের প্রভাবে উপকূল এলাকায় বৃষ্টি হয়, (ঘ) শীতল ও উষ্ণ স্রোতের মিলনস্থানে মৎস্য চারণক্ষেত্র গড়ে ওঠে।

জোয়ার-ভাঁটা

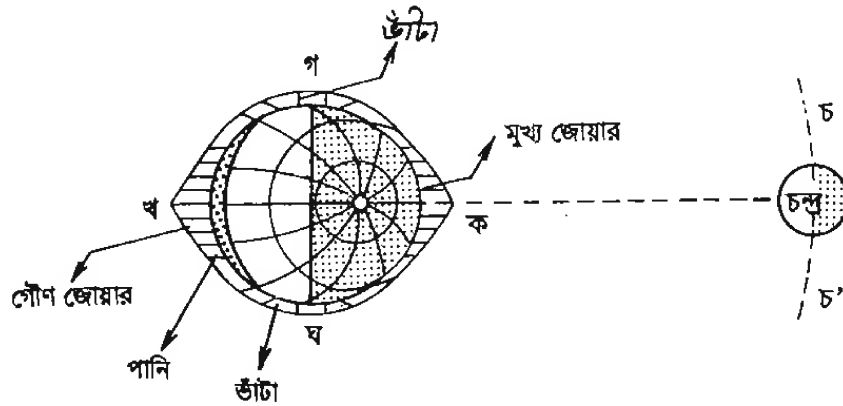
আমরা প্রায় সকলেই কমবেশি জোয়ার ভাঁটার নাম শুনেছি। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যাদের বাড়ির কাছাকাছি নদী আছে বা সমুদ্র থেকে বেশি দূরে নয়, তারা হয়ত লক্ষ করেছেন যে, কোন সময় নদীর পানি বেড়ে যায় আবার এক সময় কমে যায়। নদী বা সমুদ্রের পানি বেড়ে যাওয়া হল জোয়ার এবং কমে যাওয়া হল ভাঁটা। চন্দ্র ও সূর্য ভূপৃষ্ঠের পানি ও স্থলকে আকর্ষণ করছে। এ আকর্ষণের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠের পানি প্রত্যহ নিয়মিত স্থানবিশেষে ফুলে ওঠে ও অন্যত্র নেমে যায়। পানির এ ফুলে ওঠা বা স্ফীতিকে জোয়ার এবং নেমে যাওয়াকে ভাঁটা বলে।

জোয়ার-ভাঁটার কারণ

ভূপৃষ্ঠের সকল পদার্থই পরস্পরকে অবিরাম আকর্ষণ করছে। তবে যে পদার্থ যত বড় তার আকর্ষণ শক্তি তত বেশি। কিন্তু দূরত্ব বাড়লে আকর্ষণ শক্তি কমে যায়। অন্যান্য বস্তুর মতো চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করছে। সূর্য চন্দ্র অপেক্ষা অনেক অনেক বড়। কিন্তু পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব চন্দ্র অপেক্ষা অনেক বেশি। চন্দ্র আকারে ছোট হলেও পৃথিবীর নিকটতম মহাজাগতিক বস্তু। এটি পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। সেজন্য চন্দ্রের আকর্ষণ পৃথিবীর ওপর প্রবলতর। সুতরাং পৃথিবীর ওপর চন্দ্রের আকর্ষণ শক্তির দৈনন্দিন তারতম্যই জোয়ার ভাঁটার প্রধান কারণ।

মুখ্য ও গৌণ জোয়ার : চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে অবিরাম ঘুরছে। এ ঘূর্ণনের সময় পৃথিবীর যে অংশ চন্দ্রের সম্মুখে পড়ে সেখানে চন্দ্রের আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি হয়। স্থলভাগ অপেক্ষা জলভাগের উপর চন্দ্রের আকর্ষণ বেশি বলে চারদিক থেকে পানি ঐ আকর্ষণ স্থানের দিকে প্রবাহিত হয়। ফলে চন্দ্রের কাছাকাছি অংশের পানি ফুলে উঠে জোয়ারের সৃষ্টি হয়। এ জোয়ারকে মুখ্য জোয়ার বলে।

আবার ঠিক ঐ সময়ে পৃথিবীর যে অংশে চন্দ্রের আকর্ষণে মুখ্য জোয়ার হয় তার বিপরীত দিকের পানি অপেক্ষা পানির নিচের স্থলভাগ চন্দ্রের দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়। এ সময় এ পানির উপর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব কমে যায় এবং বিকর্ষণ শক্তির প্রভাবে চারদিকের পানিরাশি সে স্থানে এসে জোয়ারের সৃষ্টি করে। এরূপভাবে সৃষ্ট জোয়ারকে গৌণ জোয়ার বলে।



চিত্র ১৭.১ : জোয়ার ভাঁটা

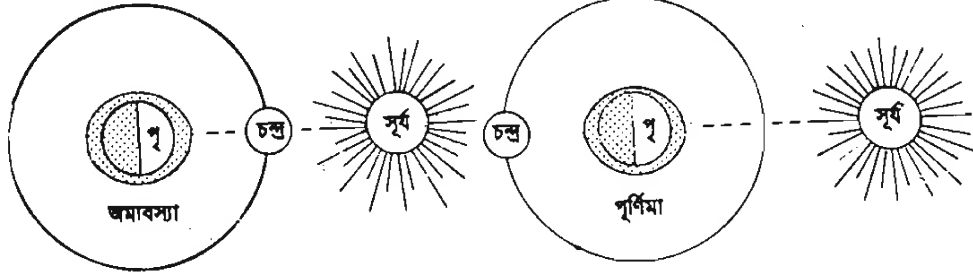
ভাঁটা

যখন পৃথিবীর কোনো একটি অংশে মুখ্য জোয়ার হয় তখন তার বিপরীত অংশে গৌণ জোয়ার হয়। সে সময় কিন্তু এ জোয়ারের মধ্যবর্তী দুই পাশের স্থান থেকে পানি কমে যায়। পানি কমে যাওয়ার ফলে এ দুই স্থানে তখন ভাঁটা হয়।

প্রতি দিন দুই বার জোয়ার ও দুই বার ভাঁটা

পৃথিবীর যে অংশ যখন চন্দ্রের কাছাকাছি আসে তখন সেই অংশে এবং তার ঠিক বিপরীত অংশে জোয়ার হয়। ঠিক তার সমকোণে দুই প্রান্তে ভাঁটা হয় (চিত্র ১৭.১)। প্রতি দিন পৃথিবীর প্রত্যেক স্থানে দুই বার জোয়ার ও দুই বার ভাঁটা হয়।

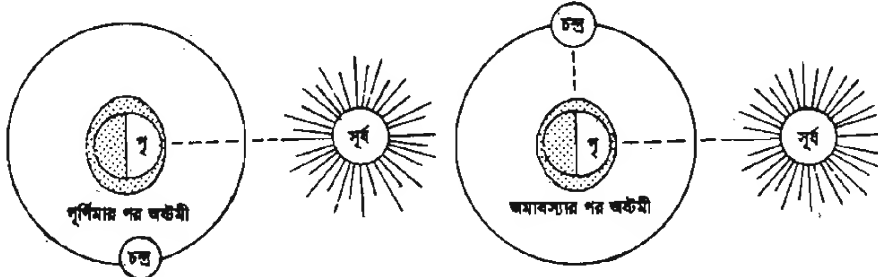
ভরা কটাল বা তেজ কটাল : অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর একদিকে সমসূত্রে অবস্থান করে। সূর্যের আকর্ষণ চন্দ্রের তুলনায় কম হলেও উভয়ের মিলিত আকর্ষণ খুবই প্রবল হয়। এ মিলিত আকর্ষণের ফলে যে জোয়ার হয় তাতে পানি খুব বেশি ফুলে ওঠে। এরূপ জোয়ারকে ভরা কটাল বা তেজ কটাল বলে।



চিত্র ১৭.২ : ভরা কটাল বা তেজ কটাল

পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য পরস্পর পৃথিবীর বিপরীত দিকে সমসূত্রে অবস্থান করে। এ সময়ে চন্দ্রের আকর্ষণে যে স্থানে জোয়ার হয় সূর্যের আকর্ষণেও ঠিক সে স্থানে জোয়ার হয়। ফলে পানি খুব বেশি ফুলে ওঠে। এ কারণে পূর্ণিমা তিথিতে ভরা কটাল বা তেজ কটাল হয়।

মরা কটাল বা মরা জোয়ার : পূর্ণিমা বা অমাবস্যার আট দিন পর অর্থাৎ অষ্টমী তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য পরস্পর সমকোণে থেকে পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। এ অবস্থায় চন্দ্রের আকর্ষণে যে জোয়ার হয় সূর্যের আকর্ষণে তা কমে যায়। চন্দ্রের আকর্ষণ শক্তি বেশি বলে চন্দ্রের সম্মুখে ও তার বিপরীত দিকে জোয়ার হয় কিন্তু সূর্যের আকর্ষণ শক্তি কম বলে সূর্যের সম্মুখে ও তার বিপরীত দিকে ভাঁটা হয়। এজন্য এ সময়ে জোয়ারের উচ্চতা বা স্ফীতি সর্বনিম্ন হয়। সে কারণে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার পর অষ্টমী তিথির জোয়ারকে মরা কটাল বা মরা জোয়ার বলে।



চিত্র ১৭.৩ : মরা কটাল বা মরা জোয়ার

জোয়ার ভাঁটার সময় ব্যবধান

কোনো স্থানে কোনো দিনে যে সময়ে জোয়ার আসে পর দিন ঠিক সে সময়ে জোয়ার আসে না। জোয়ার আসতে ৫২ মিনিট বিলম্ব হয়। যেহেতু চন্দ্র $29\frac{1}{2}$ দিনে এক বার পৃথিবীকে ঘুরে আসে। ফলে চন্দ্র একদিনে তার কক্ষের 29 ভাগের 1 ভাগ অগ্রসর হয়। সুতরাং পৃথিবীর এক বার আবর্তন সময়ে অর্থাৎ 24 ঘণ্টায় চন্দ্র তার নিজ কক্ষের প্রায় 13° পথ এগিয়ে আসে। চন্দ্রের 1° পথ এগিয়ে আসতে 8 মিনিট সময় লাগে। অর্থাৎ 13° পথ এগিয়ে আসতে 52 মিনিট সময় লাগে। ফলে আজ যে স্থানে মুখ্য জোয়ার আগামীকাল সে স্থানে মুখ্য জোয়ার ঠিক 24 ঘণ্টা পরে না হয়ে তা 24 ঘণ্টা 52 মিনিট পরে হয়।

জোয়ার-ভাঁটার প্রভাব : নদী বা সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটা আমাদের কল্যাণ বয়ে আনে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

- (ক) জোয়ার ও ভাঁটায় বড় বড় বাণিজ্য জাহাজ বন্দরে সহজে গমনাগমন করতে পারে।
- (খ) ভাঁটায় নদীর আবর্জনা সমুদ্রে বয়ে নিয়ে যায়, ফলে পানি নির্মল থাকে।
- (গ) জোয়ার ভাঁটায় জন্য নদীতে তলানি জমতে পারে না।
- (ঘ) জোয়ার ভাঁটায় নদীর পানি দ্রুত লবণাক্ত হয়, ফলে পানি সহজে বরফ হয় না।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পৃথিবীর গভীরতম সমুদ্রখাত কোনটি?

ক. ম্যারিয়ানা	খ. পোটোরিকো খাত
গ. সুন্ডাখাত	ঘ. সেন্ট হেলেনস
২. চ্যালেঞ্জার কী?

ক. দ্বীপ	খ. শৈলশিরা
গ. সাগর	ঘ. উপসাগর
৩. মাদাগাস্কার কোন মহাসাগরে অবস্থিত?

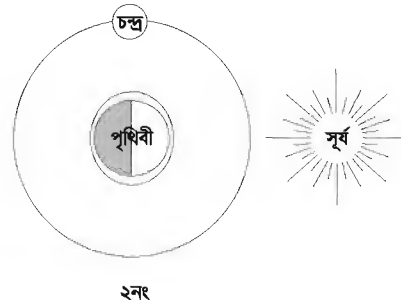
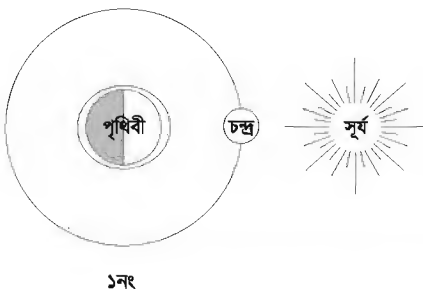
ক. উত্তর মহাসাগরে	খ. আটলান্টিক মহাসাগরে
গ. ভারত মহাসাগরে	ঘ. প্রশান্ত মহাসাগরে
৪. সূর্যের তাপ পানির ওপর লম্বভাবে পড়লে কী হয়?

ক. পানি কম বাষ্পে পরিণত হয়	খ. পানি বেশি বাষ্পে পরিণত হয়
গ. পানির তাপমাত্রা ঠিক থাকে	ঘ. জলজ উদ্ভিদ বেশি জন্মে
৫. অমাবস্যা তিথিতে

ক. চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর একদিকে থাকে	খ. চন্দ্র ও সূর্য পরস্পর পৃথিবীর বিপরীত দিকে থাকে
গ. চন্দ্র ও সূর্য পরস্পর সমকোণে থাকে	ঘ. পৃথিবী চন্দ্রের সম্মুখে থাকে
৬. আকিব কক্সবাজার থেকে সেন্টমার্টিন যাওয়ার সময় লক্ষ করে যে সমুদ্রের পানি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্র স্রোতের সৃষ্টি হচ্ছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে
 - i. সমুদ্রের ওপর সর্বদা বায়ু প্রবাহ
 - ii. পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন
 - iii. সমুদ্র পৃষ্ঠে সূর্য তাপের তারতম্য

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |



উপরের চিত্র থেকে ৭ ও ৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৭. ১নং চিত্রে সমুদ্রের জোয়ারকে কী বলে ?

ক. ভরাকটাল

খ. মরা কটাল

গ. মুখ্য জোয়ার

ঘ. গৌণ জোয়ার

৮. ২নং চিত্রের ক্ষেত্রে পৃথিবীর ওপর

ক. চন্দ্রের আকর্ষণ বেশি

খ. সূর্যের আকর্ষণ বেশি

গ. চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ সমান

ঘ. সূর্যের কোনো আকর্ষণ নেই

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সাকিব তার বাবার সঙ্গে কক্সবাজার গিয়ে সমুদ্র সৈকত দেখতে যায়। সেখানে সে দেখতে পায় সমুদ্রের পানি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক সময় পানি বৃদ্ধি বন্ধ হওয়ার পর আবার ধীরে ধীরে কমছে। সাকিব তার বাবার সাথে বায়না ধরল ২৪ ঘণ্টা সে সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে পানির এতরাস বৃদ্ধি দেখতে চায়।

ক. ধীরে ধীরে সমুদ্রের পানি বৃদ্ধিকে কী বলে ?

খ. সমুদ্রের পানি বৃদ্ধি বা কমার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. সাকিবের ইচ্ছে পূরণ হলে সে কতবার পানির এতরাস বৃদ্ধি দেখতে পেল।

ঘ. সমুদ্রের পানি বেশি স্ফীত হওয়া ও কম স্ফীত হওয়ার কারণ চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

২. অপু ২৩/৩/২০০৮ তারিখ স্থানীয় Coast guard কে জিজ্ঞেস করে জানল পরের দিন সকাল ৬:৩২ টায় জোয়ার আসবে। অপু পরের দিন সমুদ্র তীরে যায় এবং জোয়ার দেখতে পায়। ২৫/৩/২০০৮ তারিখও অপু যথাসময়ে সমুদ্র তীরে যায় কিন্তু জোয়ার দেখল না।

ক. জোয়ার কী ?

খ. ২৫/৩/২০০৮ তারিখ জোয়ার দেখা গেল না কেন ?

গ. ২৫/৩/২০০৮ তারিখ জোয়ারের সময় নির্ণয় কর।

ঘ. জোয়ারের সময়ের সাথে চন্দ্র ও পৃথিবীর গাণিতিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

অষ্টাদশ অধ্যায়

আবহাওয়া ও জলবায়ু

তুমি কোনো দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতে পেলো মুম্বলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর দেখলে নির্মল আকাশ। বেশ রোদ উঠেছে এবং রোদের তাপও প্রখর। আবার পরক্ষণেই দেখছ যে, খুব জোরে বাতাস বইছে এবং বাতাসও বেশ ঠাণ্ডা। পড়ন্ত বেলায় দেখতে পেলো উত্তর আকাশে ঘন মেঘ করছে। যে কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি হতে পারে। আমরা দিনের বিভিন্ন সময়ের যে বিভিন্ন অবস্থার কথা শুনলাম তার সমষ্টিকে বা কয়েক দিনের বিভিন্ন সময়ের অবস্থার সমষ্টিকে আবহাওয়া বলতে পারি। অর্থাৎ কোনো স্থানের কোনো দিনের বা কয়েক দিনের বায়ুমণ্ডলের তাপ, চাপ, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা, বারিপাত ইত্যাদির সমষ্টিগত অবস্থাকে আবহাওয়া বলে।

আমাদের দেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে আবহাওয়া অফিস রয়েছে। এ সব অফিসের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানের আবহাওয়ার খবরাখবর পেয়ে থাকি। কোনো এলাকায় বা দেশে বছরের সব দিন আবহাওয়া একরকম থাকে না। কোনো দিন প্রচণ্ড গরম, কোনো দিন খুবই ঠাণ্ডা পড়ে। আবার কোনো দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেবল বৃষ্টি আর বৃষ্টি। তাছাড়া আবার অনেক দিন পর্যন্ত বৃষ্টি হয় না। কোনো স্থানের আবহাওয়ার ৩০ থেকে ৪০ বছরের সামগ্রিক অবস্থাকে ঐ এলাকার জলবায়ু বলা হয়।

উপরের বর্ণনা থেকে আমরা জানলাম আবহাওয়া হল কোনো স্থানের একদিন বা কয়েক দিনের বায়ুমণ্ডলের তাপ, চাপ, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা, বারিপাত ইত্যাদির সমষ্টি। আর জলবায়ু হল কোনো অঞ্চল বা দেশের কয়েক বছরের আবহাওয়ার গড় সামগ্রিক অবস্থা।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য

আবহাওয়া	জলবায়ু
(১) কোনো স্থানের বায়ুমণ্ডলের কয়েক দিনের গড় অবস্থা হল আবহাওয়া।	(১) কোনো অঞ্চলের কয়েক বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থা হল জলবায়ু।
(২) বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহ, বায়ুর আর্দ্রতা, বারিপাত ইত্যাদি আবহাওয়ার উপাদান।	(২) আবহাওয়ার উপাদানগুলোই জলবায়ুর উপাদান।
(৩) আবহাওয়া বায়ুমণ্ডলের স্বল্পকালীন অবস্থা।	(৩) জলবায়ু কোনো অঞ্চলের বা দেশের দীর্ঘ সময়ের বায়ুমণ্ডলের অবস্থা।
(৪) আবহাওয়া দ্রুত পরিবর্তন হয়।	(৪) জলবায়ু দ্রুত পরিবর্তন হয় না।
(৫) কয়েক দিনের আবহাওয়া পর্যালোচনা করে আবহাওয়ার গড় নির্ণয় করা যায়।	(৫) দীর্ঘ সময়ের অর্থাৎ ৩০ থেকে ৪০ বছরের গড় আবহাওয়া পর্যালোচনা করে জলবায়ু সম্বন্ধে জানা যায়।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান

আমরা ইতোপূর্বে জেনেছি এ পৃথিবীর প্রত্যেকটি বস্তু এক বা একাধিক উপাদানে গঠিত। তেমনি আবহাওয়া ও জলবায়ু কতকগুলো উপাদানে গঠিত। আবহাওয়া যে উপাদানে গঠিত জলবায়ুও ঠিক একই উপাদানে গঠিত। কোনো স্থানের

আবহাওয়া ও জলবায়ু নিম্নলিখিত উপাদানগুলো দ্বারা গঠিত।

- (১) বায়ুর তাপমাত্রা
- (২) বায়ুর চাপ
- (৩) বায়ুপ্রবাহ
- (৪) বায়ুর আর্দ্রতা

এ উপাদানগুলোকে আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান বলা হয়। কারণ এ উপাদানগুলোর ভিন্নতার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আবহাওয়া ও জলবায়ুর তারতম্য লক্ষ করা যায়। নিচে এ উপাদানগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।

(১) বায়ুর তাপমাত্রা : তাপের প্রধান উৎস হল সূর্য। বায়ুর উষ্ণ ও শীতল আবহাওয়াকে বায়ুর তাপ বলে। তাপমাত্রার কমবেশির ওপর কোনো স্থানের আবহাওয়া ও জলবায়ু নির্ভর করে। যেমন, কোনো স্থানের তাপমাত্রা বেশি হলে সে স্থানের আবহাওয়া ও জলবায়ু উষ্ণ হয়।

(২) বায়ুর চাপ : বায়ু সর্বদা চারদিকে চাপ দিচ্ছে। অন্যদিকে যে কোনো পদার্থ বা বস্তুর মত বায়ুরও ওজন আছে। এ ওজন থেকে বায়ুচাপের সৃষ্টি হয়। এ চাপকেই বায়ুর চাপ বলে। বায়ুর চাপের ওপর বায়ু গতি নির্ভর করে। যেমন, উচ্চচাপের বায়ু নিম্নচাপের বায়ুর দিকে প্রবাহিত হয়। শীতল সমুদ্র থেকে আগত সমুদ্রবায়ু উপকূলীয় অঞ্চলের তাপমাত্রাকে কমিয়ে রাখে।

(৩) বায়ুপ্রবাহ : তাপ ও চাপের পার্থক্যের জন্য বায়ু নিশ্চল থাকতে পারে না। সর্বদা একস্থান থেকে অন্যস্থানে প্রবাহিত হয়। একে বায়ুপ্রবাহ বলে।

(৪) বায়ুর আর্দ্রতা : বায়ুতে জলীয়বাষ্পের উপস্থিতিতে বায়ুর আর্দ্রতা বলে। বায়ুর আর্দ্রতার জন্য তাপমাত্রা প্রখর হতে পারে না। কিন্তু বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকে। বৃষ্টির জন্য তাপমাত্রা বাড়তে পারে না, কিন্তু মরু বা বৃষ্টিহীন অঞ্চলে তাপমাত্রা বাড়ে।

জলবায়ুর নিয়ন্ত্রক

এক বা একাধিক বস্তু কোনো কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করলে তাকে বা তাদের নিয়ন্ত্রক বলে। যেমন, ভাল স্বাস্থ্যের জন্য পুষ্টিগত খাবার প্রয়োজন। সুতরাং পুষ্টিগত খাবার ভাল স্বাস্থ্যের নিয়ন্ত্রক। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের জলবায়ু বিভিন্ন রকম। কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু কতকগুলো প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয়। প্রাকৃতিক এ সব নিয়ন্ত্রক হল : (১) অক্ষাংশ, (২) উচ্চতা, (৩) সমুদ্র থেকে দূরত্ব, (৪) বায়ুপ্রবাহ, (৫) বৃষ্টিপাত, (৬) সমুদ্রস্রোত, (৭) পর্বতের অবস্থান, (৮) বনভূমির অবস্থান, (৯) ভূমির প্রকৃতি ইত্যাদি। জলবায়ুর নিয়ন্ত্রকসমূহ কীভাবে জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে তা তোমরা উঁচু শ্রেণীতে উঠলে জানতে পারবে।

জলবায়ুর শ্রেণীবিভাগ

শীতের তীব্রতা ও গ্রীষ্মের তাপের প্রখরতার ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীর জলবায়ুকে প্রধানত দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা : (১) চরমভাবাপন্ন জলবায়ু ও (২) সমভাবাপন্ন জলবায়ু।

(১) চরমভাবাপন্ন জলবায়ু : অত্যধিক তাপমাত্রা ও তীব্র শীত চরমভাবাপন্ন জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ চরমভাবাপন্ন অবস্থা সাধারণত মহাদেশের অভ্যন্তরে দেখা যায়। সে কারণে এ জলবায়ুকে মহাদেশীয় জলবায়ু বলে।

(২) সমভাবাপন্ন জলবায়ু : এ ধরনের জলবায়ুতে শীত ও গ্রীষ্মের কোন প্রকোপ বা তীব্রতা নেই। সমুদ্রের তীরবর্তী স্থানে এ সমভাবাপন্ন জলবায়ু পরিলক্ষিত হয় বলে একে সামুদ্রিক জলবায়ু বলে।

বায়ুর তাপমাত্রা পরিবর্তনের কারণ

পৃথিবীপৃষ্ঠের বায়ুর তাপমাত্রা সব স্থানে সমান নয়। কোনো স্থানে বায়ুর তাপমাত্রা বেশি যেমন, পাকিস্তানের জেকোবাবাদ আবার কোনো স্থানে তাপমাত্রা কম যেমন, ভারতের দার্জিলিং। বায়ুর তাপমাত্রার পার্থক্য প্রধানত ভূপৃষ্ঠে তাপের তারতম্যের ওপর নির্ভর করে। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে বায়ুর তাপের পার্থক্য কতকগুলো কারণের ওপর নির্ভর করে। সে কারণগুলো হল : (১) সূর্যরশ্মির তির্যক পতন, (২) অক্ষাংশ, (৩) দিবাভাগের দৈর্ঘ্য, (৪) উচ্চতা, (৫) জলীয়বাষ্পের পরিমাণ, (৬) বায়ুপ্রবাহ, (৭) সমুদ্রস্রোত, (৮) বায়ুমণ্ডলের গভীরতা ইত্যাদি।

বায়ুর চাপ পরিবর্তনের কারণ

সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুর স্বাভাবিক চাপ এক বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় ১৫ পাউন্ড বা এক বর্গ সেন্টিমিটারে প্রায় ১ কেজি। বায়ুর চাপ সবসময় সমান থাকে না। একই স্থানে বছরের বিভিন্ন সময় বায়ুর চাপ বিভিন্ন হয়। আরও লক্ষ করা গেছে যে একই দিনে সকাল, দুপুর ও বিকালে বায়ুর চাপের পরিবর্তন হয়। বায়ুর চাপের এ পরিবর্তন প্রধানত নিম্নের তিনটি কারণে ঘটে থাকে।

(১) উষ্ণতার তারতম্য : উত্তাপে বায়ু আয়তনে বাড়ে। ফলে বায়ুর ঘনত্ব কমে। আবার উত্তপ্ত বায়ু হালকা বলে চাপ কম দেয়। অপরদিকে শীতল বায়ুতে জলীয়বাষ্প কম থাকে বলে চাপ বেশি। অতএব বায়ুর উষ্ণতা যখন বেশি হয় তখন বায়ুর চাপ কম হয়।

(২) ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা : সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যত উপরে ওঠা যায় ততই বায়ু স্তরের ওজোন ও ঘনত্ব কমতে থাকে। সে কারণে উপরের বায়ুর চাপও কমতে থাকে। তাই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যত উপরে ওঠা যায় ততই বায়ুর চাপ কম।

(৩) জলীয়বাষ্পের পার্থক্য : জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু আর্দ্র ও উষ্ণ এবং শুষ্ক বায়ু অপেক্ষা হালকা। সে কারণে জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ুর চাপ কম। কিন্তু শুষ্ক বায়ু ভারী বলে চাপ বেশি। আবার উষ্ণ বায়ুর জলীয়বাষ্প ধরে রাখার ক্ষমতা বেশি। এজন্যই দেখা যায় যে বর্ষাকালে বায়ুর চাপ কম।

বায়ুর চাপের পরিবর্তনের সঙ্গে আবহাওয়ার পরিবর্তনের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বায়ুর চাপ বেশি থাকলে আবহাওয়া নির্মল ও স্বাভাবিক থাকে। কিন্তু চাপ কমে গেলে অন্যকথায় নিম্নচাপ হলে ঝড় ও বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বায়ুর গড় উষ্ণতা ও বায়ুর চাপ নির্ণয় সম্পর্কে ধারণা

আমরা এ পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে তাপ ও তাপমান যন্ত্র এবং তৃতীয় অধ্যায়ে চাপমান যন্ত্র ও এদের ব্যবহার সম্বন্ধে শিখেছি। গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে আমরা বায়ুর দৈনিক, মাসিক ও বার্ষিক গড় উষ্ণতা নির্ণয় করতে পারি। ব্যারোমিটারের সাহায্যে বায়ুর চাপ নির্ণয় করা যায়। এ যন্ত্রে পারদের ওঠানামা দেখে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

বায়ুপ্রবাহের কারণ

বায়ু সর্বদাই চলাচল করে। ভূপৃষ্ঠে বায়ুচাপের সমতা রক্ষার জন্যই বায়ুর গতি সঞ্চার হয়। তাছাড়া যে সব কারণে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয় সংক্ষেপে তা হল :

(১) চাপের তারতম্যই বায়ুপ্রবাহের প্রধান কারণ।

(২) অধিক উত্তপ্ত ও জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু হালকা হয়ে উপরে উঠে গেলে ঐ স্থান আংশিকভাবে বায়ুশূন্য হয়। বায়ুমণ্ডলের সমতা রক্ষার জন্য তখন উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে শীতল বায়ু নিম্নচাপ অঞ্চলে প্রবাহিত হয়।

(৩) উচ্চচাপ অঞ্চলের ভারী বায়ু নিচ দিয়ে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে এবং নিম্নচাপ অঞ্চলের হালকা বায়ু উপর দিয়ে উচ্চচাপ অঞ্চলে প্রবাহিত হয়। ফলে বায়ুপ্রবাহের আবর্তন চক্রের সৃষ্টি হয়।

(৪) পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তিত হচ্ছে বলে বায়ুপ্রবাহ উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায়। এ রীতি ফেরেলের সূত্র নামে অভিহিত।

বিভিন্ন প্রকার মেঘ

আমরা আকাশে সাদা সাদা তুলার মত যে বস্তু বাতাসে ভাসতে দেখতে পাই সাধারণভাবে তাকে মেঘ বলে থাকি। আসলে মেঘ হল বায়ুতে ভাসমান ধূলিকণাকে আশ্রয় করে অসংখ্য হালকা জলকণার সমষ্টি।

আকাশের বিভিন্ন উচ্চতায় মেঘ দেখা যায়। মেঘের এ উচ্চতার অবস্থান অনুসারে মেঘকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা (১) উঁচু মেঘ, (২) মধ্যম উঁচু মেঘ ও (৩) নিচু মেঘ।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু অঞ্চল

পৃথিবীর সকল স্থানের জলবায়ু একরকম নয়। কোথাও বৃষ্টি বেশি হয়, আবার কোথাও বৃষ্টি হয় না। কোথাও দিবাভাগে অধিক গরম পড়ে, আবার রাতে শীত পড়ে। কোথাও গাছপালায় ভর্তি, কোনো স্থানে আবার বৃক্ষলতা কিছুই নেই। কোনো জায়গায় কৃষিকাজ করা যায়, আবার কোনো জায়গায় কৃষিকাজ করা যায় না। এর কারণ হচ্ছে জলবায়ুর নিয়ন্ত্রকগুলো সকল স্থানে সমান নয়। পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণের জলবায়ু পূর্ব পশ্চিম অপেক্ষা বেশি পরিবর্তন হয়ে থাকে। তা ছাড়া জলভাগের চেয়ে স্থলভাগে জলবায়ুর পরিবর্তন বেশি পরিলক্ষিত হয়। অপরদিকে উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগের পরিমাণ বেশি বলে জলবায়ুর পরিবর্তনও উত্তর গোলার্ধে বেশি হয়। জলবায়ুর নিয়ন্ত্রকের পার্থক্যের ভিত্তিতে ভূপৃষ্ঠকে নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক বা জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। নিরক্ষীয়, মৌসুমী, নাতিশীতোষ্ণ, ভূমধ্যসাগরীয় ও তুন্দ্রা জলবায়ু অঞ্চল উল্লেখযোগ্য।

উদ্ভিদ ও কৃষিকাজের ওপর জলবায়ুর প্রভাব

জলবায়ুর (বৃষ্টিপাত ও উষ্ণতা) ওপর উদ্ভিদের বৃদ্ধি নির্ভর করে। অর্থাৎ বৃষ্টিপাত উদ্ভিদের প্রকৃতি নির্ধারণ করে। যেমন—পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতে অরণ্য, স্বল্প বৃষ্টিপাতে তৃণভূমি এবং বৃষ্টিহীনতায় কাঁটাগুল্ম, ঝোপঝাড় সৃষ্টি হয়। আবার স্বল্প উষ্ণতায় ধীরবৃদ্ধি সম্পন্ন ক্ষুদ্রাকৃতির উদ্ভিদ এবং অধিক উষ্ণতায় দ্রুত বর্ধিষ্ণু উদ্ভিদ জন্মে থাকে।

বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলে জলবায়ুর প্রভাবে নানান রকমের উদ্ভিদ জন্মে। খুবই বৃষ্টিবহুল (১৭০ থেকে ২৫৫ সেন্টিমিটার) অঞ্চলে চিরহরিৎ বৃক্ষের গভীর বন দেখা যায়। নিরক্ষরেখার কাছাকাছি এ অঞ্চল অবস্থিত। এ সব বনে সেগুন, মেহগনি, রবার ইত্যাদি উদ্ভিদ জন্মে। অন্যদিকে মৌসুমী বৃষ্টিপাত প্রবল এলাকায় ১২৫ থেকে ২০০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয় এবং এখানে মেহগনি, শাল, বেত, বট, আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি জন্মে। বাংলাদেশ মৌসুমী বায়ুর অন্তর্গত একটি দেশ। ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় শীতকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এখানে সিডার, পাইন, ওক, কর্ক, জলপাই ইত্যাদি উদ্ভিদ জন্মে।

কৃষির ওপর জলবায়ুর অনেক প্রভাব রয়েছে। জলবায়ু কোথায় কী ধরনের ফসল হবে তা নিয়ন্ত্রণ করে। নিরক্ষরেখার কাছাকাছি অঞ্চলে অধিক বৃষ্টিপাতের কারণে কৃষিকাজ ভালো হয় না। রবার, কফি, আখ, ধান ইত্যাদি এ এলাকার প্রধান কৃষিজ দ্রব্য। পূর্বে বলা হয়েছে যে, ভূমধ্যসাগরের আশেপাশে শীতকালে বৃষ্টি হয়। এই বৃষ্টিপাত এ অঞ্চলে প্রচুর লেবুজাতীয় ফলের চাষে সাহায্য করেছে। তা ছাড়া গম, ভুট্টা, তুলা ইত্যাদি কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন হয়। মৌসুমী বৃষ্টিপাত এলাকা কৃষিকাজের জন্য খুবই উপযোগী। মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত, পরিমিত তাপ এ এলাকায় ধান, গম, যব, আখ, তেলবীজ, তামাক, পাট ইত্যাদি ফসল চাষে সাহায্য করেছে। মরুভূমি এলাকায় বৃষ্টি খুবই কম হয় এবং তাপমাত্রার ব্যাপক ওঠানামা হয়। এজন্য মরুভূমি এলাকায় বড় ধরনের গাছ জন্মে না। কৃষিকাজও হয় না।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, জলবায়ুর প্রভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন হয়। তা ছাড়া আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রভাবে মানুষের জীবনযাত্রা, পোশাক পরিচ্ছদ, বর্ণ, খাদ্য, অভ্যাস, সংস্কৃতি ভিন্ন হয়ে থাকে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জলবায়ুর নিয়ন্ত্রক কয়টি ?
 ক. ৯টি
 গ. ৭টি
 খ. ৮টি
 ঘ. ৬টি
২. এক বর্গ সেন্টিমিটারে বায়ুর স্বাভাবিক চাপ প্রায়
 ক. ১.৫০ কেজি
 গ. ০.৮০০ কেজি
 খ. ১.০০ কেজি
 ঘ. ০.৭৫০ কেজি
৩. গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে
 ক. বায়ুর দৈনিক উষ্ণতা নির্ণয় করা যায়
 খ. বায়ুর দৈনিক ও মাসিক গড় উষ্ণতা নির্ণয় করা যায়
 গ. বায়ুর দৈনিক, মাসিক ও বার্ষিক গড় উষ্ণতা নির্ণয় করা যায়
 ঘ. বায়ুর উষ্ণতা নির্ণয় করা যায় না

নিচের অনুচ্ছেদের আলোকে ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মালয়েশিয়া সাগরের তিন দিক সমুদ্রবেষ্টিত একটি অঞ্চল। সারা বছর দেশটির গড়তাপ মাত্রা 25° 30° । দেশটিতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৫০ থেকে ২০০ সেন্টিমিটার।

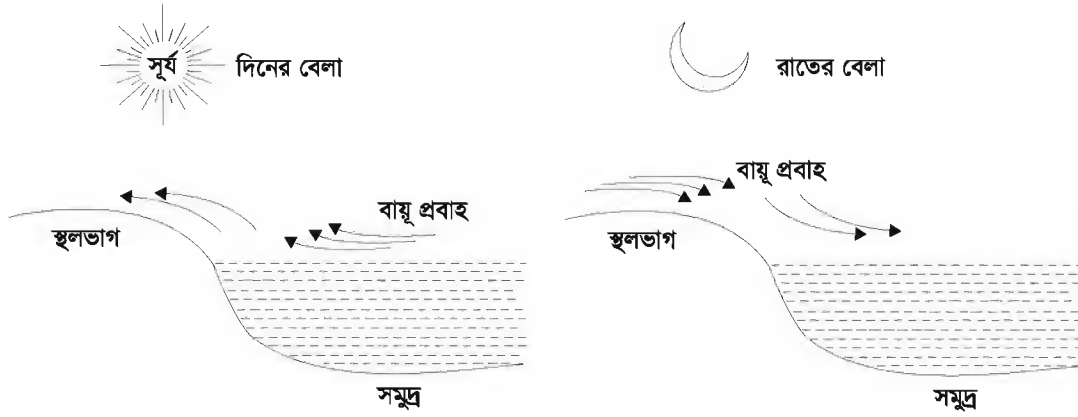
৪. দেশটিতে বেশি জন্মে
 ক. কাটাগুলা
 গ. বৃক্ষ জাতীয় গাছ
 খ. ঝোপঝাড়
 ঘ. লতা জাতীয় গাছ
৫. মালয়েশিয়ায় জলবায়ুতে
 i. গ্রমের তীব্রতা বেশি
 ii. শীতের তীব্রতা বেশি
 iii. সবসময় একই রকম তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|--------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.



চৈত্র বৈশাখ মাস

গড় তাপমাত্রা: ৩৫°C

চিত্র

- ক. বায়ু প্রবাহ কীসের উপাদান?
- খ. চিত্রে দুটি ভিন্ন অবস্থায় বায়ু প্রবাহের দিক বিপরীত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- গ. চৈত্র বৈশাখ মাসে আবহাওয়া কেমন হয় বর্ণনা কর।
- ঘ. আমাদের দৈনন্দিন কাজে বায়ু প্রবাহের প্রভাব আলোচনা কর।

২.

ক্রমিক নং	দেশের নাম	উৎপন্ন উদ্ভিদের ধরন
১.	‘ক’	কাটাগুল্ম ও ঝোপঝাড়, খেজুর ইত্যাদি
২.	‘খ’	কমলা লেবু, লেবু, আখ, ধান, কফি ইত্যাদি

- ক. জলবায়ু কী?
- খ. ‘ক’ দেশের জলবায়ু কেমন হবে ব্যাখ্যা কর।
- গ. ‘খ’ দেশে কমলা লেবু, লেবু জাতীয় ফল বেশি হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. তথ্যের আলোকে ‘ক’ ও ‘খ’ দেশের জলবায়ু তুলনা কর।

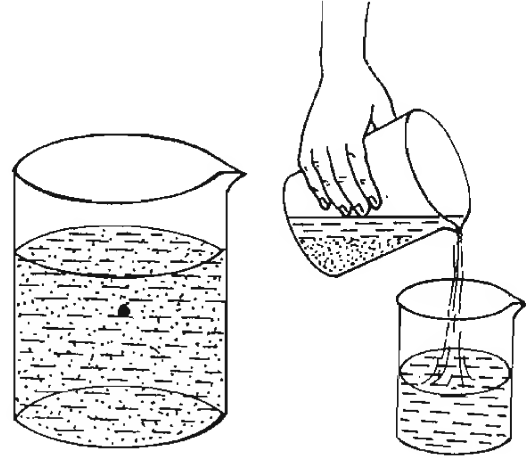
উনবিংশ অধ্যায়

ল্যাবরেটরির সাধারণ প্রণালি

বিজ্ঞান হল হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে শেখার বিষয়। হাতে কলমে কাজ করে বিজ্ঞান শিখলে তোমরা একদিকে যেমন বিজ্ঞান পাঠে আনন্দ পাবে, বিজ্ঞান পাঠের প্রতি কৌতূহলী হয়ে উঠবে, অন্যদিকে বিজ্ঞানের তথ্যসমূহ সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারবে। হাতে কলমে কাজ করে বিজ্ঞান শিখলে বিজ্ঞানের জ্ঞান তোমাদের নিকট অর্থবহ ও দীর্ঘস্থায়ী হবে। পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে বিজ্ঞান শেখার সুযোগ পাবে। হাতে কলমে কাজ করে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে বিজ্ঞান শেখার জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানাগার, যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি। বিজ্ঞানাগারের পরিবর্তে তোমাদের শ্রেণীকক্ষেও বিজ্ঞানের সহজ পরীক্ষাগুলো তোমরা করতে পার। পরীক্ষা করার জন্য বিজ্ঞানাগার বা ল্যাবরেটরিতে আমরা যে সাধারণ প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকি তাকে ল্যাবরেটরির সাধারণ প্রণালি বলে। এ অধ্যায়ে তোমরা দ্রবণ থেকে দ্রব ও দ্রাবক পৃথকীকরণের জন্য ল্যাবরেটরির কয়েকটি সাধারণ প্রণালি, যেমন: খিতান, পরিস্রাবণ, বাষ্পীভবন, ঘনীভবন, স্ফটিকীকরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে জানতে পারবে।

খিতান

পরীক্ষা ১৯.১ : একটি কাচের বিকারে পানি নিয়ে তার মধ্যে দুই এক চামচ ধুলোবালি নিয়ে নাড়াচাড়া কর এবং মিশ্রণটি ভালভাবে লক্ষ কর। কী দেখছ? পানি ঘোলা হয়ে গেছে। কেন পানি ঘোলা দেখাচ্ছে বলতে পার? ধুলোবালি পানিতে অদ্রবণীয়। তাই পানি ঘোলা দেখাচ্ছে। পানি ও ধুলোবালির এ মিশ্রণকে বেশ কিছুক্ষণ রেখে দাও এবং তারপর মিশ্রণটি লক্ষ কর। কী দেখছ? বিকারের তলায় সব ময়লা জমা হয়েছে এবং বিকারের উপরের অংশে পানি স্বচ্ছ ও পরিষ্কার দেখাচ্ছে। এবারে বিকারটি আস্তে আস্তে কাত করে উপর থেকে স্বচ্ছ পানি ঢেলে নিলে পরিষ্কার পানি আলাদা হয়ে যাবে এবং বিকারের তলায় কাদামাটি থেকে যাবে। এভাবে কোনো তরল পদার্থের সাথে মিশে থাকা ভারী ও অদ্রবণীয় কঠিন পদার্থকে খিতিয়ে আলাদা করার পদ্ধতিকে খিতান বলা হয়। পানিতে অদ্রবণীয় ভারী পদার্থ খিতিয়ে পড়ার পর উপর থেকে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার পানি ঢেলে নিয়ে পৃথক করার পদ্ধতিকে আস্রাবণ বলে।



চিত্র ১৯.১ : খিতান পদ্ধতিতে উপাদান পৃথকীকরণ

যে ভারী অদ্রবণীয় পদার্থ পাত্রের তলায় পড়ে থাকে তাকে তলানি বলে। আমাদের দেশে বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে খিতান পদ্ধতি নানাভাবে কাজে লাগানো হয়।

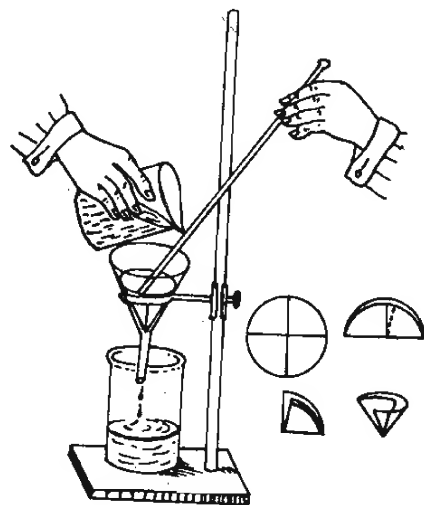
বর্ষাকালে নদীর পানি ঘোলা হয়। কারণ এ সময়ে পানিতে অদ্রবণীয় কাদামাটি মিশ্রিত থাকে। নদীর ধারে যারা বসবাস করেন তারা সংসারের নানা কাজে নদীর পানি ব্যবহার করে থাকেন। গ্রামের বধূরা কলসি ভরে নদীর ঘোলা পানি এনে রেখে দেন। তারপর উপর থেকে পরিষ্কার পানি ঢেলে নিয়ে কাজ করে থাকেন। তাঁরা খিতান পদ্ধতির নাম না জানলেও দৈনন্দিন জীবনে এ পদ্ধতি ব্যবহার করছেন।

পরিস্রাবণ

তোমরা জেনেছ কোন তরল পদার্থের সাথে মিশে থাকা ভারী ও অদ্রবণীয় কঠিন পদার্থকে খিতিয়ে পড়ার পর ওপর থেকে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার তরল পদার্থকে ঢেলে নিয়ে আলাদা করার পদ্ধতিকে আস্রাবণ বলে। আস্রাবণ পদ্ধতিতে অদ্রবণীয় পদার্থ পৃথক করার জন্য অনেক সময় অপেক্ষা করতে হয় এবং মিশ্রণ থেকে অদ্রবণীয় পদার্থকে সম্পূর্ণ পৃথক করা যায় না। কারণ অদ্রবণীয় পদার্থগুলো যদি খুব সূক্ষ্ম ও হালকা হয় তাহলে বহু সময় পরেও সূক্ষ্ম কঠিন পদার্থগুলো তলানি হিসেবে পড়ে না, ভাসমান থেকে যায়। এ অবস্থায় আস্রাবণ পদ্ধতিতে মিশ্রণ থেকে উপাদানগুলো সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা যায় না। এ সব ক্ষেত্রে পরিস্রাবণ পদ্ধতিই সবচেয়ে ভাল। পরিস্রাবণ পদ্ধতিতে পানিতে অদ্রবণীয় পদার্থ পৃথক করার জন্য অপেক্ষা করতে হয় না এবং সূক্ষ্ম কঠিন পদার্থগুলোও পৃথক করা যায়।

পরিস্রাবণ পদ্ধতিতে ফিল্টার কাগজ বা ছাঁকনির সাহায্যে পানিতে অদ্রবণীয় পদার্থ ছেকে পৃথক করা হয়। অতএব, কোন তরল পদার্থ থেকে ভারী অদ্রবণীয় পদার্থ বা ভাসমান কঠিন পদার্থকে ছেকে পৃথক করার প্রণালিকে পরিস্রাবণ বা ছাঁকন বলে।

পরীক্ষা ১৯.২ : একটি বিকারে কিছু বালি মেশানো পানি নাও। একটি ফিল্টার কাগজ নিয়ে চার ভাঁজ কর। এবার চিত্রের ন্যায় একদিকে তিনটি ভাঁজ ও অপর দিকে একটি ভাঁজ রেখে ওটাকে একটা ফানেলের মধ্যে বসাও এবং সামান্য পানি দিয়ে ফানেলের গায়ে কাগজটাকে ভালভাবে আটকে দাও। এখন ফানেলটি একটি স্ট্যান্ডের রিংয়ের উপর বসাও। ফানেলের তলায় একটা খালি বিকার এমনভাবে বসাও যাতে ফানেলের নলের সবু দিকটা বিকারের গায়ে লেগে থাকে।



চিত্র ১৯.২ : পরিস্রাবণ পদ্ধতি

বালি মেশানো পানির বিকারের মুখে একটা সবুকাচের দড়ি ধর। কাচদড়ের গা বেয়ে বিকার হতে ধীরে ধীরে বালি মিশ্রিত ঘোলা পানি ফানেলে বসানো ফিল্টার কাগজের মধ্যে ঢাল। লক্ষ করলে দেখবে ফিল্টার কাগজের মধ্য দিয়ে নিচের বিকারে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ পানি জমা হচ্ছে এবং ফিল্টার কাগজের উপর অবশেষ হিসেবে বালি পড়ে আছে। এভাবে ফিল্টার কাগজ বা ছাঁকনির সাহায্যে সূক্ষ্ম অদ্রাব্য মিশ্রিত পদার্থ পানি বা অন্য কোন তরল দ্রবণ থেকে ছেকে পৃথক করাকে পরিস্রাবণ বা ছাঁকন বলে। পরিস্রাবণ করার পর ফিল্টার কাগজের উপর যে কঠিন পদার্থ থেকে যায় তাকে অবশেষ বলে এবং ফিল্টার কাগজের ভেতর দিয়ে যে পরিষ্কার বা স্বচ্ছ তরল পদার্থ বেরিয়ে এসে নিচে বা পাত্রে জমা হয় তাকে পরিস্রুত বলে।

তোমরা কোন মিশ্রণ থেকে অদ্রবণীয় ভারী কঠিন পদার্থকে পৃথক করার দুইটি পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারলে। এ দুটো পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য কোথায় তোমরা ভেবেছ কি? এসো, আস্রাবণ এবং পরিস্রাবণ পদ্ধতির পার্থক্যগুলো আমরা জেনে নেই।

আস্রাবণ ও পরিস্রাবণ পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য

আস্রাবণ	পরিস্রাবণ
১) আস্রাবণ পদ্ধতিতে অদ্রবণীয় ভারী কঠিন পদার্থ খিতিয়ে পৃথক করা হয়।	১) পরিস্রাবণ পদ্ধতিতে অদ্রবণীয় ভারী কঠিন পদার্থ ফিল্টার কাগজ দিয়ে ছেকে আলাদা করা হয়।
২) এ পদ্ধতিতে সূক্ষ্ম ভাসমান পদার্থ আলাদা করা বেশ কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ। অনেক সময় এ পদ্ধতিতে অদ্রবণীয় সূক্ষ্ম পদার্থ পৃথক করা যায় না।	২) এ পদ্ধতিতে সূক্ষ্ম ভাসমান কণাগুলো খুব সহজেই পৃথক করা যায়।
৩) আস্রাবণ পদ্ধতিতে ভাসমান কঠিন পদার্থকে আলাদা করা যায় না।	৩) এ পদ্ধতিতে ভাসমান কঠিন পদার্থও আলাদা করা যায়।

বাষ্পীভবন

তোমরা লক্ষ করেছ গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপে নদ, নদী, খাল, বিল, পুকুর ইত্যাদি শুকিয়ে যায়। ভিজা কাপড় রোদে রেখে দিলে পানি বাষ্পাকারে উড়ে যায় ও কাপড় শুকিয়ে যায়। একটি পাত্রে কিছু পানি নিয়ে খোলা জায়গায় রেখে দিলে আস্তে আস্তে পানি কমে যায় এবং এক সময়ে একেবারেই পানি শূন্য হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হল : গ্রীষ্মকালে নদ, নদীর পানি শুকিয়ে যায় কেন? ভিজা কাপড় রোদে দিলে শুকায় কেন? একটি পাত্রে পানি নিয়ে খোলা জায়গায় রেখে দিলে আস্তে আস্তে পানিশূন্য হয় কেনো?

এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে চেষ্টা কর। উপরের সবগুলো ক্ষেত্রেই পানি সূর্যের তাপে বাষ্প হয়ে উড়ে গেছে। তাই পানি কমে গেছে অথবা পানিশূন্য হয়েছে। কোনো তরল পদার্থকে তাপ দিয়ে অথবা উন্মুক্তভাবে প্রাকৃতিক উপায়ে সূর্যের তাপে উত্তপ্ত করে বাষ্পে পরিণত করাকে বাষ্পীভবন বলে। সস্তম অধ্যায়ে তোমরা সমুদ্রের পানি থেকে কীভাবে লবণ তৈরি করা হয় সে সম্পর্কে জেনেছ। প্রাকৃতিক উপায়ে সূর্যের তাপে বাষ্পীভবন পদ্ধতিতে সমুদ্রের পানি থেকে লবণ তৈরি করা হয়।

বাষ্পীভবন পদ্ধতির সাহায্যে দ্রবণ থেকে দ্রবীভূত দ্রবকে আলাদা করা যায়।

পরীক্ষা ১৯.৩ : বাষ্পীভবনের সাহায্যে দ্রবণ থেকে দ্রব পৃথকীকরণ

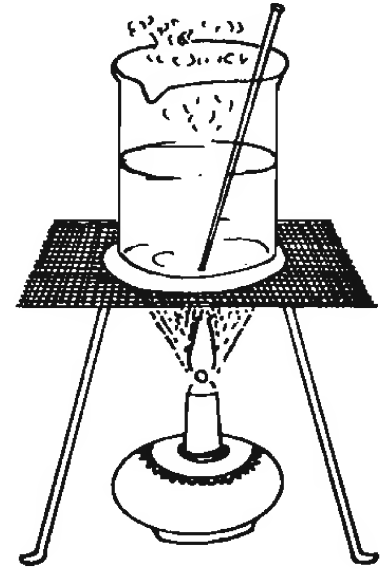
একটি বিকারে কিছুটা পানি নাও। এর মধ্যে কয়েক চামচ লবণ দিয়ে ভাল করে নেড়ে লবণ পানির দ্রবণ তৈরি কর। লবণ পানির দ্রবণ থেকে এসো লবণ পৃথক করি।

একটি তেপায়া স্ট্যান্ডের উপর একটি তারজালি বসাও এবং তারজালির উপর লবণ পানির দ্রবণসহ বিকারটি বসাও। এবার একটি স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে লবণ পানির দ্রবণটি ভালভাবে জ্বাল দাও এবং দ্রবণটি একটি নাড়ুন কাঠি দিয়ে ভালভাবে নাড়তে থাক। এবার লক্ষ কর। কী দেখছ? পানি বাষ্প হয়ে উঠে যাচ্ছে, আর বিকারের তলায় লবণ জমা হয়েছে।

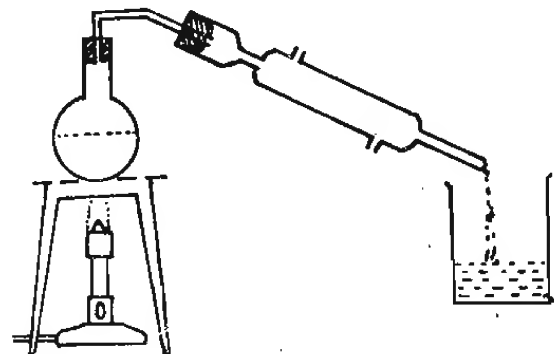
এভাবে বাষ্পীভবন পদ্ধতিতে কোন দ্রবণের তরল দ্রাবককে তাপ দিয়ে বাষ্পে পরিণত করে দ্রবীভূত দ্রবকে আবার ফিরে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে বাষ্পীভবন পদ্ধতি ব্যবহার করে আঁখ বা খেজুরের রস থেকে গুড় বা পাটালি ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

ঘনীভবন

জলীয় বাষ্প অথবা অন্য কোন বায়বীয় পদার্থকে যথেষ্ট পরিমাণে ঠাণ্ডা করে তরল অবস্থায় পরিণত করার পদ্ধতিকে ঘনীভবন বলে। জলীয় বাষ্পকে ঠাণ্ডা করলে ঘনীভবনের ফলে পানিতে পরিণত হয়, আবার পানিকে ঠাণ্ডা করলে বরফে পরিণত হয়। গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপে খাল, বিল, নদী, নালা ও সমুদ্রের পানি জলীয় বাষ্প হয়ে বাতাসে ভেসে বেড়ায়, জলীয় বাষ্প শীতল হয়ে ঘনীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয় এবং মেঘ থেকে বৃষ্টিরূপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। কোন মিশ্রণ থেকে অদ্রবণীয় ভারী কঠিন পদার্থ পরিস্রাবণ বা ছাঁকন প্রণালিতে হেঁকে পৃথক করা যায়।



চিত্র ১৯.৩ : বাষ্পীভবন পদ্ধতি



চিত্র ১৯.৪ : পাতন প্রণালি

কোন দ্রবণ থেকে দ্রবণীয় কঠিন দ্রব বাষ্পীভবন পদ্ধতিতে ফেরত পাওয়া গেলেও তরল দ্রাবক ফিরে পাওয়া যায় না, কারণ দ্রাবক বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। কিন্তু বাষ্পীভবন ও ঘনীভবন পদ্ধতি দুটোই একত্রে ব্যবহার করে আমরা কোনো দ্রবণ থেকে দ্রবণীয় দ্রব ও তরল দ্রাবক দুটোই ফেরত পেতে পারি। এভাবে বাষ্পীভবন ও ঘনীভবন পদ্ধতি একত্রে ব্যবহার করাকে পাতন প্রণালি বলে। অতএব, যে প্রণালিতে কোনো তরলকে প্রথমে বাষ্পে পরিণত করে সেই বাষ্পকে শীতল করে পুনরায় তরল অবস্থায় পরিণত করা হয় তাকে পাতন বলে। অতএব,

$$\text{পাতন} = \text{বাষ্পীভবন} + \text{ঘনীভবন}।$$

শ্রেণী শিক্ষকের সহায়তায় তোমরা পাতন প্রণালিতে দ্রব ও দ্রাবক পৃথকীকরণের পরীক্ষাটি করবে।

স্ফটিকীকরণ

বেশি তাপমাত্রায় কোন কঠিন পদার্থের ঘন ও জলীয় দ্রবণ তৈরি করে সেই ঘন দ্রবণকে ঠাণ্ডা করলে কঠিন পদার্থ দানার আকারে দ্রবণের তলায় থিতুয়ে পড়ে। এরূপ দানাদার পদার্থকে বলা হয় স্ফটিক বা কেলাস। কেলাস বা স্ফটিক তৈরি করার এরূপ প্রণালিকে স্ফটিকীকরণ বা কেলাসন বলা হয়। বিভিন্ন জ্যামিতিক আকারের মসৃণ লবণ, মিছরি, তুতে, হিরাকশ, ফিটকিরি ইত্যাদির কেলাস বা স্ফটিক দেখতে সুন্দর। সমুদ্রের পানি থেকে লবণ তৈরি, চিনি থেকে মিছরি তৈরি ইত্যাদি স্ফটিকীকরণ পদ্ধতিতে করা হয়। তোমরা ৭ম অধ্যায়ে চিনি ও পানির দ্রবণ থেকে স্ফটিকীকরণ পদ্ধতিতে মিছরি তৈরি সম্বন্ধে জেনেছ। বাড়িতে এভাবে তোমরা মিছরি তৈরি করতে পার।

কেলাসন বা স্ফটিকীকরণ পদ্ধতিতে দ্রবণ থেকে দ্রব পৃথকীকরণ

পরীক্ষা ১৯.৪ : চিনি, তুতে ফিটকিরি বা লবণের পৃথক পৃথক সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি কর। একটি বিকারে নিয়ে এ দ্রবণ জ্বাল দাও। দ্রবণ শুকিয়ে প্রায় অর্ধেক হলে গরম করা থামাও। ঘন দ্রবণসহ বিকারটি ঠাণ্ডায় রেখে দাও। বিকারটি ঠাণ্ডা হলে কঠিন দ্রবের দানাগুলো পৃথক কর।

বাষ্পীভবন পদ্ধতিতে দ্রবণ থেকে সবটুকু কঠিন পদার্থ পৃথক করা যায়। কিন্তু স্ফটিকীকরণ পদ্ধতিতে কিছু কঠিন পদার্থ দ্রবণের মধ্যে থেকে যায়। কঠিন পদার্থের একাংশ কেলাসের আকারে দ্রবণের তলায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

লবণ ও বালির মিশ্রণ থেকে উপাদানগুলো পৃথকীকরণ

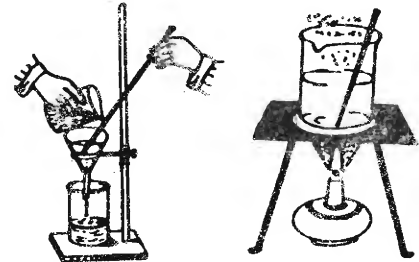
পরীক্ষা ১৯.৫ : একটি কাগজের উপর লবণ ও বালির মিশ্রণ তৈরি কর। মিশ্রণটি একটি বিকারে নাও, মিশ্রণটিতে পরিমাণমত পানি মেশাও এবং একটি কাচ দণ্ড দিয়ে ভাল করে নাড়তে থাক। এর আগে দেখেছ লবণ পানিতে দ্রবীভূত হয়, কিন্তু বালি পানিতে দ্রবীভূত হয় না। লবণ ও বালির মিশ্রণে পানি মিশিয়ে নাড়ন কাঠি দিয়ে নাড়লে লবণ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে যাবে, অদ্রবণীয় বালি কিছুক্ষণ পর্যন্ত ভাসমান থাকবে, পরে বিকারের তলায় জমা হবে। এখন এ মিশ্রণকে ফিল্টার কাগজের সাহায্যে ছেঁকে নিলে লবণের দ্রবণ ফিল্টার কাগজের ভেতর দিয়ে নিচের বিকারে জমা হবে। ফানেলে ফিল্টার কাগজের উপর পড়ে থাকবে অদ্রবণীয় কঠিন বালি।

এভাবে মিশ্রণ থেকে বালি পৃথক হয়ে যাবে। এখন পরিসৃত লবণ ও পানির দ্রবণ স্পিরিট ল্যাম্প বা বুনসেন বার্নারের সাহায্যে গরম করলে পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে, বিকারের তলায় পড়ে থাকবে লবণের দানা। এভাবে লবণ ও বালির মিশ্রণ থেকে উপাদানগুলোকে পৃথক করা যায়। এ পরীক্ষায়

(ক) পানিতে দ্রবণীয় লবণকে প্রথমে দ্রবীভূত করা হয়েছে।

(খ) অদ্রবণীয় কঠিন বালি ছাঁকন বা পরিস্রাবণ পদ্ধতিতে পৃথক করা হয়েছে।

(গ) পরিসৃত লবণ পানি দ্রবণ থেকে বাষ্পীভবন পদ্ধতিতে কঠিন লবণ আবার ফিরে পাওয়া গেছে।



চিত্র ১৯.৫ : লবণ ও বালির মিশ্রণ থেকে উপাদানগুলো পৃথকীকরণ

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বর্ষাকালে নদীর পানি ঘোলা দেখায় কেনো।
 ক. পানিতে অদ্রবণীয় ভাসমান পদার্থ মিশে থাকে খ. পানিতে অদ্রবণীয় ধুলোবালি মিশে থাকে
 ছ. পানিতে দ্রবণীয় পদার্থ মিশে থাকে ঘ. নদীর পানি সব সময়েই ঘোলা থাকে
২. কোন তরলে অদ্রবণীয় কঠিন পদার্থ তাড়াতাড়ি এবং সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা যায় কোন পদ্ধতিতে ?
 ক. ঘনীভবন খ. বাষ্পীভবন
 গ. পরিস্রাবণ ঘ. স্ফটিকীকরণ
৩. পরিস্রাবণ পদ্ধতিতে যে অদ্রবণীয় কঠিন পদার্থ ফিল্টার কাগজের উপর বেঁধে থাকে তাকে কী বলে ?
 ক. পরিস্রুত খ. তলানি
 গ. কেলাস ঘ. অবশেষ
৪. লবণ ও পানির মিশ্রণ থেকে লবণ ও পানি দুটোই ফিরে পাওয়া যায় কোন পদ্ধতিতে ?
 ক. পরিস্রাবণ খ. বাষ্পীভবন
 গ. ঘনীভবন ঘ. পাতন
৫. লবণ ও বালির মিশ্রণ থেকে উপাদান দুটো ফিরে পেতে কোন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় ?
 ক. দ্রবণ ও পরিস্রাবণ খ. পরিস্রাবণ ও পাতন
 গ. পরিস্রাবণ ও বাষ্পীভবন ঘ. পরিস্রাবণ ও কেলাসন
৬. নিচের তিনটি ঘটনার মাঝে কোন গুলো স্বতঃ বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় ঘটবে।
 i. রোদে কাপড় শুকানো
 ii. সমুদ্রের পানি থেকে লবণ প্রস্তুত
 iii. চিনির দ্রবণ থেকে মিছরি তৈরি

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. ii | খ. i ও ii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের তথ্যের সাহায্যে ৭, ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

একটি পাত্রে তুতে, ন্যাপথালিন, কোবাল্ট ও বালির মিশ্রণ দেওয়া হল। ল্যাবরেটরির বিভিন্ন সাধারণ প্রণালি যেমন : পাতন, উর্ধ্বপাতন, চুম্বকীকরণ, পরিস্রাবণ, বাষ্পীকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে উপাদানগুলো পৃথক করা যায়।

৭. কোন পদ্ধতিতে ন্যাপথালিন পৃথক করা যায় ?
 ক. পাতন খ. উর্ধ্বপাতন
 গ. পরিস্রাবণ ঘ. চুম্বকীকরণ
৮. কোনটিকে প্রথম এবং কী প্রক্রিয়ায় পৃথক করতে হবে ?
 ক. কোবাল্ট, উর্ধ্বপাতন খ. তুতে, পরিস্রাবণ
 গ. ন্যাপথালিন, উর্ধ্বপাতন ঘ. কোবাল্ট, চুম্বকীকরণ

৯. তুতে ও বালির মিশ্রণ আলাদা করতে হলে কী করতে হবে ?

ক. পরিস্রাবণ

খ. পরিস্রাবণ ও বাষ্পীভবন

গ. বাষ্পীভবন

ঘ. উর্ধ্বপাতন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বাজার থেকে লবণ ও চিনি কিনে আনা হল। দেখা গেল দুটোতেই ময়লা ও বালি মেশানো আছে। ল্যাবরেটরির কিছু সাধারণ প্রণালি যেমন আস্রাবণ, পরিস্রাবণ, বাষ্পীকরণ, স্ফটিকীকরণ ইত্যাদি ব্যবহার করে পরিষ্কার ও সুষম আকারের লবণ ও চিনি পাওয়া যায়।

ক. লবণ ও চিনিকে আলাদা আলাদা ভাবে পরিষ্কার করার জন্য প্রথমে কী করতে হবে?

খ. আস্রাবণ করলে কী ঘটবে ?

গ. লবণ ও চিনির পরিষ্কার দ্রবণ প্রাপ্তির প্রণালি বর্ণনা কর।

ঘ. সুষম কেলাস পেতে চাইলে বাষ্পীকরণ ও স্ফটিকীকরণ কোন প্রক্রিয়াটি উত্তম হবে উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

২.



ক. ১নং বিকার থেকে কোন প্রক্রিয়ায় পানি ও লবণ দুটোই ফেরত পাওয়া যাবে ?

খ. ২নং বিকার থেকে নিশাদলের কেলাস পাওয়া যাবে কীভাবে?

গ. ৩নং বিকারের উপাদানসমূহ পৃথক করার উপায় লিখ।

ঘ. প্রদত্ত নমুনা তিনটির মধ্যে কোনটিকে দ্রবণ বলা যায়। যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

বিংশ অধ্যায়

পরিত্যক্ত কাঁচামাল থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতকরণ

তোমরা শ্রেণীতে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, সমাজপাঠ, ধর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়গুলো পড়ে থাক। অন্যান্য বিষয়ের সাথে বিজ্ঞান বিষয়টি পাঠের মূল পার্থক্য কোথায় তোমরা তা লক্ষ্য করেছ কি? বিজ্ঞান হল হাতে কলমে কাজ করে শেখার বিষয়। হাতে কলমে কাজ করে বিজ্ঞান শিখলে যে লাভ হবে তা হল

- (১) বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবে।
- (২) ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।
- (৩) চারপাশের পরিবেশ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হবে।
- (৪) যুক্তিযুক্তভাবে চিন্তাভাবনা করতে শিখবে।
- (৫) বিজ্ঞানের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে দৈনন্দিন জীবনের অনেক সমস্যা সমাধান করতে পারবে।
- (৬) বিজ্ঞানের জ্ঞান ও দক্ষতাকে ব্যবহার করে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করতে পারবে।

বিজ্ঞান একটি ব্যবহারিক বিষয়। হাতে কলমে কাজ করে বিজ্ঞান শিখলে শেখাটা যেমন তোমাদের কাছে আনন্দদায়ক হবে, তেমনি এটা তোমরা সহজে ভুলবে না, অনেক দিন মনে রাখতে পারবে। আবার তোমাদের বাড়িঘরে ও সাংসারিক কাজে লাগে এমন অনেক কিছু জিনিসপত্র তৈরিও করতে পারবে। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের পর আমরা কত জিনিস ফেলে দেই, এসব ফেলে দেওয়া জিনিসকে কাজে লাগিয়ে অনেক সময় নানা ধরনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি করা যায়। এ অধ্যায়ে তোমাদের চারপাশে পড়ে থাকা পরিত্যক্ত জিনিস থেকে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি করতে শিখবে।

পরিত্যক্ত কাঁচামাল কী?

দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করতে করতে পুরোনো এবং অকেজো হয়ে গেলে সব বস্তুই আমরা ফেলে দেই। ব্যবহারের পর ফেলে দেওয়া এ সমস্ত জিনিসকে পরিত্যক্ত জিনিস বলে। আমরা অনেক দ্রব্যসামগ্রীর মোড়ক হিসেবে কাগজ, পলিথিন, কাপড় অথবা পাতলা ধাতব পাত ব্যবহার করি। এসব মোড়কের ভেতরে দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহারের পর মোড়ক ফেলে দেই। কোন কোন দ্রব্য ব্যবহার শেষে ফেলে দেওয়া ছাড়া কিছুই করার থাকে না। এসব পরিত্যক্ত পদার্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ধাতব পাত্র, কাচের ভাঙা টুকরা, প্লাস্টিক দ্রব্যাদি, তরি তরকারি, ফলমূল, শাক সবজি, মাছ মাংসের উদ্বৃত্ত অংশ যেমন খোসা, আঁশ, হাড় ইত্যাদি আরও কত কি? বই, খাতা, কাগজ, বলপেন, কাপড় ইত্যাদিও আমরা ব্যবহারের পর ফেলে দেই। এসব পরিত্যক্ত জিনিসপত্র যেখানে সেখানে ফেলে আমাদের পরিবেশ নোংরা, দূষিত ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়। এতে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। এ সব পরিত্যক্ত জিনিসের মধ্যে কোনো কোনোটি থেকে নানা ধরনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি করা যায়। এতে একদিকে যেমন আর্থিক সুবিধা পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমন পরিবেশও ভাল থাকে। আর যেগুলো ব্যবহার করা যায় না সেগুলোকে মাটিতে গর্ত করে পুঁতে রাখলে পরিবেশ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন থাকে।

নিচের ছকে কয়েকটি পরিত্যক্ত পদার্থের উৎস ও পুনর্ব্যবহার দেখানো হল :

উৎস	পরিত্যক্ত পদার্থ	পুনর্ব্যবহার
ধাতব পদার্থ	নষ্ট হয়ে যাওয়া গাড়ির যন্ত্রাংশ, কলকজা, ধাতব পাত্র ইত্যাদি	কারখানায় পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী করা যায়।
কাচ, প্লাস্টিক	ভাঙা কাচ, ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত কাচ, প্লাস্টিক।	কারখানায় পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ এবং নতুন দ্রব্য প্রস্তুতকরণ।
কাগজ, কাপড়	ব্যবহৃত কাগজ, কাপড় ইত্যাদি।	মড় তৈরির জন্য প্রক্রিয়াজাতকরণ।
জৈব পদার্থ	তরিতরকারি, পঁয়াজ, রসুন, ফলমূল ও শাকসবজির খোসা, মাছ মাংসের বর্জিত অংশ, গবাদি পশুর মলমূত্র।	মাটিতে পচে সার তৈরি করা।

বিজ্ঞানের জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে এ সমস্ত পরিত্যক্ত দ্রব্যের কোন কোনটি থেকে খুব সহজে ও সস্তায় তোমরা ব্যবহার উপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরি করতে পার। যে সমস্ত জিনিস থেকে কোন দ্রব্যাদি তৈরি করা হয় তাকে কাঁচামাল বা Raw Material বলে। পাট থেকে বস্তা, চট, কার্পেট, সূতা, রশি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করা হয়। এখানে পাট হল এ সব দ্রব্য তৈরির কাঁচামাল। আঁখ থেকে গুড়, চিনি, চিটাগুড়, স্পিরিট তৈরি হয়, তুলা থেকে সূতা, কাপড় চোপড় তৈরি হয়। আবার প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে রাসায়নিক সার, গোবর থেকে বায়োগ্যাস, বাঁশ, কাঠ, আখের ছোবড়া থেকে মড় ও কাগজ তৈরি হয়। এ সব ক্ষেত্রে কোন কোনটি কাঁচামাল এবং কোন কোনটি উৎপন্ন দ্রব্য তার একটি তালিকা তৈরি করে নিচের ছকে সাজিয়ে লেখ।

কাঁচামাল	উৎপন্ন দ্রব্য
১) বাঁশ, কাঠ, আখের ছোবড়া ২) ৩) ৪) ৫) ৬)	মড় ও কাগজ

তাহলে কাঁচামাল কাকে বলে তা জানতে পারলে। এবার চলো, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের পর ফেলে দেওয়া পরিত্যক্ত কাঁচামাল ব্যবহার করে কয়েকটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈরি করি।

পরিত্যক্ত কাঁচামাল থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরি

পরিত্যক্ত কাঁচামাল নির্বাচনের নীতিমালা

পরিত্যক্ত কাঁচামালের উৎস আমাদের আশপাশের পরিবেশের মধ্যে থাকতে হবে। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করার সময় বা ব্যবহারের পর আমরা কত জিনিস ফেলে দেই। এ অব্যবহৃত জিনিসের মধ্যে থেকে কাঁচামাল নির্বাচন করতে হবে। কাঁচামাল নির্বাচনের সময় নিচের কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।

(ক) কাঁচামাল যেন দৈনন্দিন জীবনের নিকট পরিবেশের মধ্যে সহজেই পাওয়া যায়।

(খ) কাঁচামাল যেন বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

(গ) এমন কাঁচামাল নির্বাচন করতে হবে যেন তা থেকে খুব কম খরচে দ্রব্যাদি তৈরি করা যায়।

(ঘ) বিনামূল্যের কাঁচামাল থেকে কম খরচে দ্রব্য তৈরি করা হলেও উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগতমান যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।

(ঙ) সংসারের নানা কাজে উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রী যেন ব্যবহার করা যায়।

এ সব নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে কাঁচামাল নির্বাচন করতে হবে।

পরিত্যক্ত কাঁচামাল থেকে উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রী শিক্ষামূলক কাজে ব্যবহার করা যায়, সাংসারিক নানা কাজে ব্যবহার করা যায়, আবার কেউ কেউ এটাকে জীবিকা উপার্জনের পথ হিসেবে পেশারূপে গ্রহণ করে। নিচে পরিত্যক্ত কাঁচামালকে কীভাবে কাজে লাগানো যায় তা আলোচনা করা হল।

কাগজ

লেখাপড়ার জন্য যে বস্তুটির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি তা হল কাগজ। তোমরা প্রতিদিন কতই না সুন্দর সুন্দর বই, পত্র-পত্রিকা, খবরের কাগজ পড়। জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতা ও সাহিত্যের কথা লেখা হয় কাগজে। তাই কাগজ হল সভ্যতার শিক্ষা, মানব সভ্যতার প্রধান উপকরণ। এ কাগজ আমরা ব্যবহারের পর ফেলে দেই। এ সব পরিত্যক্ত কাগজ নানাভাবে কাজে লাগানো যায়।

(ক) বই, পত্র পত্রিকা ও খবরের কাগজে নানা ধরনের মূল্যবান ছবি, উপদেশমূলক বাণী ও লেখা প্রকাশিত হয়। এ সব ছবি, বাণী ও লেখা শিক্ষার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তাই পরিত্যাগের পূর্বে দরকারি ছবি, বাণী ও লেখা কেটে তোমাদের অ্যালবামে সংরক্ষণ করতে পার।

(খ) বই খাতা তৈরির জন্য কাগজ কেটে নির্দিষ্ট আকারে আনতে হয়। কেটে ফেলা এসব কাগজ দোকানের ফর্দ, জিনিসের লেভেল ইত্যাদি কাজে লাগানো যায়। আবার এসব পরিত্যক্ত কাগজ দিয়ে ঠাঙ্গা, মোড়ক ইত্যাদিও তৈরি করা যায়।

(গ) পরিত্যক্ত কাগজ পানিতে সিঁদ্ব করে মড় তৈরি করা যায়। বাঁশের তৈরি জালির উপর ঢেলে মড়কে চাপ দিয়ে যে কোন আকার বা আয়তনের পিসবোর্ড তৈরি করা যায়। মড়ের উপর মোমের প্রলেপ দিয়ে তার উপর পছন্দমত রং মিশিয়ে রঙিন পিসবোর্ড তৈরি করা যায়। মিস্তির দোকানের প্যাকেট, রঙিন কার্টুন বক্স এ ধরনের পরিত্যক্ত কাগজ কুড়িয়ে অনেকে জীবিকা নির্বাহ করে। আর পরিত্যক্ত এ কাগজ দিয়ে প্যাকিং দ্রব্য তৈরি করে মূল্যবান জিনিসপত্র প্যাক করে দেশ-বিদেশে পাঠানো হয়।

পুরোনো ব্যাটারি

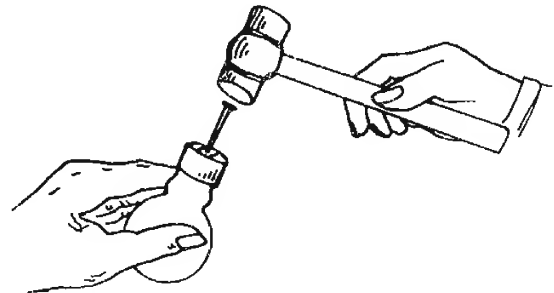
তোমরা টর্চ ব্যাটারি দেখছ। টর্চের ব্যাটারি পুরোনো হয়ে গেলে আমরা ফেলে দেই। টর্চের পুরোনো ব্যাটারি ফেলে দেওয়ার আগে অতি সাবধানে ব্যাটারি থেকে কার্বন দণ্ডটি বের করে নাও। বের করার সময় লক্ষ রাখবে দণ্ডের মাথায় যে তামার বাটি থাকে তা যেন খুলে না যায়। শ্রেণীতে পানি বিশ্লেষণ যন্ত্র, তড়িৎ কোষ এ সব সম্পর্কে পড়তে গেলে সহজলভ্য উপকরণ হিসেবে কার্বনদণ্ড ব্যবহার করতে পার।

পরিত্যক্ত গ্লাস ও প্লাস্টিক

বাড়িতে নানা কাজে অনেক সময় হঠাৎ করে কাচের গ্লাস, প্লেট ইত্যাদি ভেঙে যায়। এ ভাঙা কাচ বা গ্লাস আমরা নানা কাজে ব্যবহার করতে পারি। পানির গ্লাস ভেঙে গেলে তা গ্লাস কাটার দিয়ে কেটে সমান করে আমরা কলমদানি হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। ভাঙা গ্লাসের টুকরা বাড়ির ইটের প্রাচীরে অথবা ঘরের দেওয়ালে মোজাইকের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

বলপেন

বলপেন ব্যবহারের পর যখন কালি ফুরিয়ে যায় তখন আমরা প্লাস্টিকের বলপেনটি ফেলে দেই। এ ধরনের ১০/১২টি পরিত্যক্ত বলপেন এবং একটি নষ্ট বা ফিউজ বাল্ব সংগ্রহ কর। বৈদ্যুতিক বাল্বটির যে দিকে পিচ লাগানো থাকে সতর্কতার সাথে সে দিক থেকে একটি পেরেক ও ছোট হাতুড়ি দিয়ে এমনভাবে পিচ তুলে ফেল

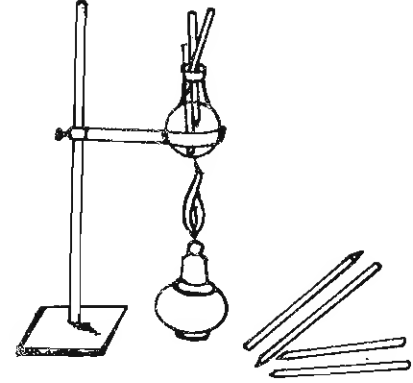


চিত্র ২০.১ : পরিত্যক্ত বাল্ব থেকে পিচ পৃথককরণ

যেন বাল্‌বের সঙ্গে পিতলের রিংটি অক্ষত থাকে। এবার আরও সতর্কতার সাথে পেরেকটি বাল্‌বের ভিতরে ঢুকিয়ে মোচড় দাও, দেখবে বাল্‌বের ভেতরের অংশ ভেঙে যাবে কিন্তু কুন্ডলী অক্ষত থাকবে। বাল্‌বটি উপড় করে ভিতরের ভাজা কাচের টুকরো এবং তারের ছেঁড়া অংশ বের করে ফেলে দাও।

খালি বাল্‌বের ভিতরে পরিত্যক্ত বলপেনের টুকরোগুলো ঢুকিয়ে দাও এবং চিত্র ২০.২ এর ন্যায় স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে তাপ দাও। লক্ষ কর, দেখবে কিছুক্ষণের মধ্যেই বলপেনের টুকরোগুলো গলতে শুরু করেছে। এ অবস্থায় প্রয়োজনে বলপেনের আরও কিছু টুকরো ঢুকাও। দেখবে সবগুলো টুকরো গলে যাবে এবং বাল্‌বটির অর্ধেকেরও বেশি গলিত বলপেন টুকরো দ্বারা পূর্ণ হয়েছে। তাপ দেওয়া বন্ধ কর এবং বাল্‌বটি ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা কর। সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা

হলে হাতুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে আঘাত কর। বাল্‌বটি ফেটে যাবে এবং একটি সুন্দর অর্ধ গোলাকার প্লাস্টিকের পেপার ওয়েট তৈরি হবে। এভাবে ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক বা বলপেন দিয়ে ব্যবহারযোগ্য পেপার ওয়েট তৈরি করা যায়।



চিত্র ২০.২ : পেপার ওয়েট প্রস্তুতকরণ

পরিত্যক্ত জৈব পদার্থ

পরিত্যক্ত জৈব পদার্থ, যেমন : তরিতরকারি, পেঁয়াজ, রসুন, ফলমূল, শাক সবজি ইত্যাদির খোসা, ডাব, নারিকেল, আঁখের ছোবড়া, মাছের আঁশ, নাড়িভুঁড়ি, কাঁটা, মাংসের হাড়, ডিমের খোসা, গবাদি পশু ও হাঁস মুরগির বিষ্ঠা ও উচ্ছিষ্ট অংশ ইত্যাদি নানাভাবে আমরা কাজে লাগাতে পারি। তরিতরকারি, ফলমূল, শাকসবজির খোসা মাটিতে গুঁতে রাখলে তা পচে গিয়ে মূল্যবান জৈব সার তৈরি হয়। পেঁয়াজের খোসা, ডালিমের খোসা, কাঁঠাল গাছের কাঠ কাটা গুঁড়ো ইত্যাদি পানিতে ফুটিয়ে রং তৈরি করা যায়। ডাব, নারিকেলের খোসা রৌদ্রে শুকিয়ে তা দিয়ে দড়ি, কাছি, ম্যাট, পাপোস, সোফা, জাজিম ইত্যাদি তৈরি করা যায়। নারিকেলের শুকনো মালা দিয়ে নানা ধরনের শিল্প তৈরি করা যায়। আঁখের খোসা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তবে আঁখের খোসা থেকে মড তৈরি করে তা থেকে উন্নতমানের কাগজ তৈরি করা যায়। পাকশীতে অবস্থিত নর্থ বেঙ্গাল পেপার মিলে আঁখের ছোবড়া থেকে কাগজ তৈরি করা হয়।

পরিত্যক্ত ডিমের খোসায় প্রচুর ক্যালসিয়াম আছে। ডিমের খোসা পাউডারের মত চূর্ণ করে মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। মাছের আঁশে প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস এবং মাছের নাড়িভুঁড়িতে নাইট্রোজেন আছে। সবুজ শাকসবজির ক্ষেতে মূল্যবান সার হিসেবে এসব ব্যবহার করা যায়।

গবাদি পশু, বিশেষ করে গরুর গোবর থেকে বায়োগ্যাস তৈরি করা যায়। হাঁস মুরগির বিষ্ঠা মাছের মূল্যবান খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এ বিষ্ঠা মূল্যবান জৈব সার হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। বর্তমানে কৃষকরা ফসলের ফলন বৃদ্ধির জন্য জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে থাকেন। বেশি রাসায়নিক সার ব্যবহার করা ভাল না। কারণ এটি পানি দূষণের একটি প্রধান উপাদান। বেশি বেশি রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগ পানি ও বায়ু দূষণের অন্যতম কারণ। এতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। কিন্তু জৈব সার ব্যবহার করলে কোনো প্রকার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয় না, অথচ ফসলের ফলন ভাল হয়।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অসংখ্য জিনিস আমরা ফেলে দেই। একটু চিন্তা ভাবনা করলে এ সব পরিত্যক্ত জিনিস আমরা নানা কাজে ব্যবহার করতে পারি। এ সব জিনিস ব্যবহার করলে আমাদের অর্থের সাশ্রয় ঘটে। আবার আমাদের পরিবেশও ভাল থাকে। আমাদের পরিবেশ ভাল থাকার অর্থ হল আমাদের এ সুন্দর পৃথিবীকে আরও সুন্দর রাখা। তোমাদের নিজ বাসগৃহ ও বিদ্যালয়ে দৈনন্দিন জীবনে যে কোনো জিনিস ব্যবহার করে ফেলে দেওয়ার আগে একবার ভাববে সে জিনিসকে আরও কোনোভাবে কাজে লাগানো যায় কিনা। তা হলে আমাদের সম্পদ কম থাকলেও কোনো অভাব থাকবে না।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- বাংলাদেশের কোন পেপার মিলে আখের ছোবড়া থেকে কাগজ তৈরি করা হয় ?
 ক. খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলে
 খ. নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলে
 গ. চন্দ্রঘোনা পেপার মিলে
 ঘ. পতেঙ্গা পেপার মিলে
- পরিত্যক্ত কোন কাঁচামালটিতে নাইট্রোজেন পাওয়া যায় ?
 ক. ডিমের খোসায়
 খ. মাছের আঁশে
 গ. মাছের নাড়িভুঁড়িতে
 ঘ. মাংসের হাড়
- পরিত্যক্ত কাঁচামাল থেকে দ্রব্যসামগ্রী তৈরির সময় কাঁচামাল নির্বাচনের জন্য কোন নীতিটি অনুসরণ করতে হয় ?
 ক. কাঁচামাল সুন্দর ও দামী হতে হবে
 খ. কাঁচামাল থেকে উৎপন্ন দ্রব্য যথেষ্ট মানসম্মত হতে হবে
 গ. বিনামূল্যের কাঁচামাল থেকে কম খরচে দ্রব্য তৈরি করতে হবে
 ঘ. কাঁচামাল বাজার থেকে ক্রয় করতে হবে
- বাঁশ, কাঠ ও আখের ছোবড়া সাধারণত ব্যবহার করা হয়।
 i. সুতা ও কাপড় তৈরিতে
 ii. মড ও কাগজ তৈরিতে
 iii. নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-----------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.



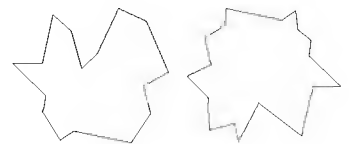
পুরোনো ব্যাটারি



পুরোনো বাস্ব



পুরোনো কলম



ভাঙা কাচ

- ক. চিত্রে প্রদত্ত জিনিসগুলো একত্রে কী নামে পরিচিত ?
- খ. এসব জিনিস পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কেন ?
- গ. পুরোনো বলপেন ও বাল্ব দিয়ে কীভাবে ব্যবহার উপযোগী একটি দ্রব্য উৎপন্ন করা যায় ।
- ঘ. চিত্রের জিনিসগুলোর পুনঃ ব্যবহার পরিবেশকে সুন্দর রাখতে সহায়ক ব্যাখ্যা কর ।
২. রাফেজা বেগম তার পরিবারের বিভিন্ন ভাঙ্গা কাচ, তরিতরকারি ও শাকসব্জির খোসা, প্লাস্টিকের পানির বোতল ও ভাঙা গ্লাস ইত্যাদি বাড়ির আঙ্গিনায় ফেলে রাখে । এতে দুর্গন্ধ ছড়ায় ফলে প্রতিবেশীদের হাটা চলায় অসুবিধে হয় ।
- ক. পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি কী ?
- খ. উপরিউল্লিখিত পদার্থগুলো থেকে পরিত্যক্ত জৈব পদার্থসমূহ চিহ্নিত কর ।
- গ. রাফেজা বেগম কীভাবে তার ফেলে দেওয়া দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহার করে কলমদানি তৈরি করতে পারে ।
- ঘ. দুর্গন্ধ রোধে রাফেজা বেগমের করণীয় আলোচনা কর ।

একবিংশ অধ্যায়

কলা বা টিস্যু

কোষ ও টিস্যুর সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও কাজ

কোষ

এক একটি প্রাণী দেখতে এক এক রকম। কিন্তু আকারের বিভিন্নতা সত্ত্বেও কতকগুলো মূল কাজ সব প্রাণীকোষে একই রকম। যেমন : পরিপাক, শ্বসন, চলন, রেচন, উদ্দীপনায় সাড়া দেয়া, বৃদ্ধি, প্রজনন এবং মৃত্যু। এছাড়া প্রত্যেক প্রাণীরই একটা কাঠামো থাকে যা পিতামাতা থেকে তাদের সন্তানদের মধ্যে বর্তায়। এ সব কাজের জন্য বিভিন্ন অঙ্গ ও গঠনী (Structure) থাকে। যেমন : আমাদের পরিপাকতন্ত্র, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, রক্তনালী, অস্থি ও মাংসপেশি বৃদ্ধ, মস্তিষ্ক ও ম্নায়ু, জননতন্ত্র ইত্যাদি। এ সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও গঠনীগুলো তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের কোষ থেকে। সে জন্য কোষকে প্রাণীদের দেহ গঠনের একক বলে।

একটি কোঠাবাড়ি তৈরি করতে ইট, বালি, সিমেন্ট ইত্যাদি লাগে। ইটের পর ইট গেঁথে দালান তৈরি হয়। জীবদেহ গঠনেও অনেক কোষ সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করে। তবে সব কোষ একই আকারের হয় না। বিভিন্ন কাজের জন্য প্রয়োজনমত এদের আকার ও প্রকৃতি বিভিন্ন হয়। যেমন : পেশি কোষ স্থিতিস্থাপক ও নমনীয় হয়। কিন্তু যে সব কোষ হাড় গঠন করে তারা দৃঢ় ও অনমনীয় হয়।

জীবকোষ সম্বন্ধে আর একটি ধারণা সৃষ্টি হওয়া উচিত। বিভিন্ন প্রাণীর কোষ একরকম হলেও প্রত্যেক প্রজাতির যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তার নকশা ঐ প্রজাতির কোষগুলোতে থাকে। প্রত্যেক প্রাণীর (প্রজাতির) এ বৈশিষ্ট্য তার নিজস্ব। কোষের নিউক্লিয়াসে যে ক্রোমোজোম থাকে তাতে সারিবদ্ধভাবে বিভিন্ন জিন (gene) থাকে। এসব জিনই প্রজাতির বৈশিষ্ট্য বহন করে।

একটি সাধারণ কোষে একখণ্ড প্রোটোপ্লাজম একটি ঝিল্লি দিয়ে বেষ্টিত থাকে। এর মধ্যে সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস এবং অন্যান্য কোষ অঙ্গাণু যেমন-মাইটোকন্ড্রিয়া, গলজি বস্তু, রাইবোসোম, আন্তঃপ্রাজমীয় জালিকা ইত্যাদি সাইটোপ্লাজমে বিদ্যমান। নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে ক্রোমোসোম থাকে। এদের গায়ে সারিবদ্ধভাবে জিন বিন্যস্ত থাকে। জিনগুলো প্রজাতির বৈশিষ্ট্যের গূঢ় তথ্য বা নকশা সংরক্ষণ করে। এদের জন্যই ছেলেমেয়েরা পিতামাতার গুণাবলি পেয়ে থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে এখন তোমরা জীবদেহে কোষের গুরুত্ব বুঝতে পারবে। এ বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে কোষের আধুনিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ হতে পারে :

- (১) জীবের গঠনগত ও কার্যকরী একককে কোষ বলে।
- (২) ঝিল্লি বেষ্টিত, নিউক্লিয়াস নিয়ন্ত্রিত একখণ্ড সাইটোপ্লাজমকে কোষ বলে।
- (৩) জীবনের প্রকাশ ঘটাবার মত সকল গুণসম্পন্ন একখণ্ড প্রোটোপ্লাজমকে কোষ বলে।

টিস্যু বা কলা

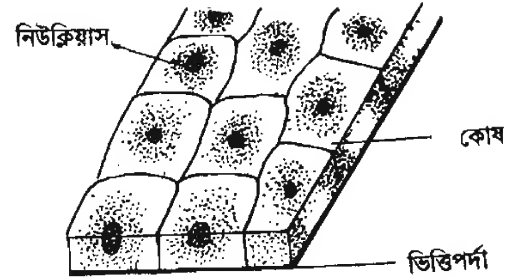
বহুকোষী প্রাণীতে অনেকগুলো কোষ যখন কোনো একটি নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য একত্রে মিলিত হয় তখন ঐ কোষ সমষ্টিকে টিস্যু (tissue) বা কলা বলে। এ সব কোষের উদ্দেশ্য এক হলেও এদের আকার ও আয়তন বিভিন্ন হতে পারে। এটা নির্ভর করে কলা ও কোষের কাজের ধরনের ওপর। সংক্ষেপে কলার সংজ্ঞা এভাবে দেয়া যায় : একই উৎস থেকে উৎপন্ন একই অথবা বিভিন্ন আকার ও আয়তনের কিছু কোষ মিলিতভাবে কোন নির্দিষ্ট কাজ করলে ঐ কোষগুচ্ছকে কলা বা টিস্যু বলে।

প্রাণিদেহে বিভিন্ন প্রকার কলা বা টিস্যু দিয়ে গঠিত। যথা

ক) আবরণী কলা খ) পেশি কলা গ) যোজক কলা ঘ) স্নায়ু কলা ঙ) জনন কলা।

এপিথিলিয়াল টিস্যু বা আবরণী কলা

যে কলা দেহের খোলা অংশ ঢেকে রাখে এবং দেহের ভেতরের বিভিন্ন গহ্বর বা নালীর ভেতরের আবরণ তৈরি করে তাকে আবরণী কলা বলে। আমাদের ত্বকের বাইরের আবরণ, মুখ গহ্বরের ভেতরের আবরণ ইত্যাদি আবরণী কলা দিয়ে গঠিত। দেহের বিভিন্ন গ্রন্থিগুলোও আবরণী কলা দিয়ে তৈরি।



চিত্র ২১.১ : আবরণী কলা

আবরণী কলার বৈশিষ্ট্য

- ১) আবরণী কলার কোষগুলো এক বা একাধিক স্তরে সাজানো থাকে।
- ২) কোষগুলো একটি পাতলা ভিত্তি পর্দার উপর ঘনভাবে সাজানো থাকে।
- ৩) এ ধরনের কলায় কোনো আন্তঃকোষীয় ধাতু পদার্থ (matrix) থাকে না।

কাজ

- ১) এ কলার প্রধান কাজ হচ্ছে রক্ষণ ও আচ্ছাদন। অর্থাৎ দেহের ভেতরের বা বাইরের অঙ্গগুলোকে আঘাত থেকে রক্ষা করা।
- ২) এ কলার কোন কোন কোষ ক্ষরণে অংশ নেয়। যেমন পাকস্থলি ও অন্ত্রের আবরণী কলা থেকে পাচক রস ক্ষরিত হয়।
- ৩) স্নাদ গ্রহণ, যেমন জিহ্বার আবরণী কলা।
- ৪) রেচন, যেমন বৃক্কনালীর আবরণী কলা।

খ) পেশি কলা বা মাসকুলার টিস্যু

প্রাণিদেহের যে কলাগুলো সংকোচন ও প্রসারণশীল তাদের পেশিকলা বলে। দেহের মাংস পেশিকলা দিয়ে গঠিত। অবস্থান, গঠন ও কাজ ভেদে এরা তিন প্রকার যথা

১) ঐচ্ছিক পেশি

যে পেশির সংকোচন ও প্রসারণ প্রাণীর নিজ ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল তাকে ঐচ্ছিক পেশি বলে। এ ধরনের পেশি দেহের অস্থির সাথে সংযুক্ত থাকে। যেমন বাইসেপস পেশি, ট্রাইসেপস পেশি, ইত্যাদি। ঐচ্ছিক পেশির সংকোচন ও প্রসারণের জন্য চোয়াল ওঠানামা করে।

ঐচ্ছিক পেশির বৈশিষ্ট্য

- ১) ঐচ্ছিক পেশি স্থিতিস্থাপক এবং এদের প্রসারণ ক্ষমতা আছে।
- ২) ঐচ্ছিক পেশির কোষগুলোতে আড়াআড়ি সাদাকালো ডোরাকাটা রেখা থাকে।
- ৩) এ ধরনের পেশির কোষে একাধিক নিউক্লিয়াস থাকে।
- ৪) এ পেশি উদ্দীপিত হলে সংকুচিত হয়।
- ৫) এ পেশির কোষগুলো সারকোলেমা নামক পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে।



চিত্র ২১.২ : ঐচ্ছিক পেশি

ঐচ্ছিক পেশীর কাজ

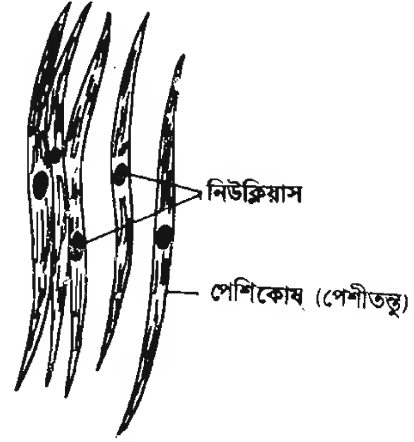
- ১) দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নড়াচড়া করতে সাহায্য করে।
- ২) প্রাণীর চলাচলে সাহায্য করে।

অনৈচ্ছিক পেশি

যে সব পেশির সংকোচন প্রসারণ প্রাণীর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল নয় তাদের অনৈচ্ছিক পেশি বলে। যেমন পাকস্থলি, অন্ত্র, মূত্রাশয়, বৃক্ক ইত্যাদির পেশি।

অনৈচ্ছিক পেশির বৈশিষ্ট্য

- ১। অনৈচ্ছিক পেশি ডোরাবিহীন।
- ২। প্রতি কোষে একটি নিউক্লিয়াস থাকে।
- ৩। সারকোলেমা নেই
- ৪। আকৃতিতে লম্বা ও মাকুর মতো।
- ৫। এ ধরনের পেশিগুলো ছন্দবদ্ধভাবে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়।



চিত্র ২১.৩ : অনৈচ্ছিক পেশি

অনৈচ্ছিক পেশির কাজ

- ১) সংকোচন ক্ষমতা মৃদু ও ছন্দবদ্ধ।
- ২) অন্ত্রের পেশির সংকোচনের ফলে পরিপাক নালীর ভেতর দিয়ে খাদ্য পরিচালিত হয়।

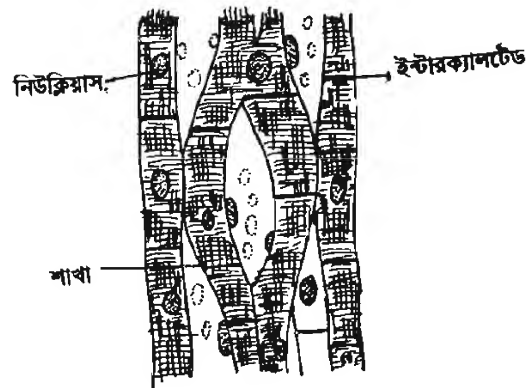
হৃদপেশী

হৃদপেশী এক বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি।

এ ধরনের পেশি দিয়ে হৃৎপিণ্ড গঠিত।

হৃদপেশির বৈশিষ্ট্য

- ১) হৃদপেশি হালকাভাবে ডোরাকাটা।
- ২) পেশিগুলো শাখাবিহীন।
- ৩) সারকোলেমা পাতলা।
- ৪) হৃদপেশির তন্তুগুলো বেলনাকার ও ক্ষুদ্র।
- ৫) পার্শ্ব শাখার সাহায্যে পরস্পর সংযুক্ত।



চিত্র ২১.৪ : কার্ডিয়াক বা হৃদপেশি

হৃদপেশির কাজ

- ১) হৃদপেশির সংকোচন ও প্রসারণের ফলে হৃৎপিণ্ডের মধ্যদিয়ে এবং সমস্ত দেহে রক্ত প্রবাহিত হয়।
- ২) নির্দিষ্ট তালে ও ছন্দে হৃৎপিণ্ড অবিরাম সংকুচিত ও প্রসারিত হয়।

যোজক কলা বা কানেকটিভ টিস্যু

যোজক কলা প্রাণিদেহের বিভিন্ন কলা এবং অঙ্গের মধ্যে সংযোগ সাধন করে। যেমন রক্ত, হাড়, তরুণাস্থি, মেদকলা ইত্যাদি যোজক কলার উদাহরণ।

যোজক কলার বৈশিষ্ট্য

- ১। এ কলার কোষগুলো মেসোডার্ম নামক ভ্রূণীয় স্তর থেকে উৎপন্ন।
- ২। এর কোষগুলো অনিয়মিতভাবে স্থাপিত, নির্দিষ্ট স্তরে সাজানো থাকে না।
- ৩। কোষগুলো প্রচুর অকোষীয় ধাত্র পদার্থ (matrix) ক্ষরণ করে যা এ কলার কোষগুলোর মধ্যবর্তী স্থান দখল করে।
- ৪। কোষের পরিমাণ অপেক্ষাকৃতভাবে কম, ধাত্র পদার্থ বেশি।
- ৫। এ কলার কোষগুলো বিভিন্ন কাজের জন্য নানাভাবে রূপান্তরিত।

যোজক কলার কাজ

- ১। হাড়ের ধাত্র পদার্থ ক্যালসিয়াম। হাড় দেহের কাঠামো গঠন করে, দেহের ভার বহন করে ও দৃঢ়তা দান করে।
- ২। টেন্ডন পেশিকে হাড়ের সঙ্গে যুক্ত করে।
- ৩। তন্তুময় যোজক কলা ফুসফুস ও রক্তনালীর প্রাচীর সংকোচন ও প্রসারণে সাহায্য করে।
- ৪। টিলা তন্তুময় যোজক কলা বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যকার ফাঁক বন্ধ করে প্যাকিং এর কাজ করে।
- ৫। মেদ কলা স্নেহপদার্থ সম্বিত রাখে।
- ৬। তরুণাঙ্ঘি দৃঢ় কিন্তু একই সাথে স্থিতিস্থাপক, যেমন নাকের ডগা, কানের লতি।
- ৭। রক্ত বিভিন্ন দ্রব্যাদি (অক্সিজেন, খাদ্য, রেচন পদার্থ) দেহের এক স্থান থেকে অন্যস্থানে পরিবহণ করে। এ ছাড়া রক্ত রোগজীবাণু প্রতিরোধ করে। রক্তের ধাত্র পদার্থ তরল।

স্নায়ু কলা বা নার্ভ টিস্যু

প্রাণীদেহের যে কলা উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি করতে পারে তাকে স্নায়ুকলা বলে। স্নায়ুকলার একক হচ্ছে স্নায়ুকোষ বা নিউরন। মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ বা নিউরন দিয়ে তৈরি। প্রতিটি নিউরন (neurone) তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। যথা

(ক) কোষ দেহ (cell body),

(খ) ডেনড্রন (dendron) এবং

(গ) অ্যাক্সন (axon)।

(ক) কোষ দেহ (Cell body) : স্নায়ুকোষের প্রধান অংশ হল কোষদেহ। এর আকার বিভিন্ন হয়, যেমন ডিম্বাকার, নক্ষত্রাকার, গোলাকার ইত্যাদি। কোষদেহে নিউক্লিয়াস অবস্থান করে।

(খ) ডেনড্রন (dendron) : কোষদেহের সবদিক থেকে অনেকগুলো ছোট ছোট শাখা। প্রশাখা বের হয়। এ শাখা গুলোকে ডেনড্রন এবং প্রশাখাগুলোকে ডেনড্রাইট (dendrite) বলে।

(গ) অ্যাক্সন (Axon) : কোষদেহ থেকে একটি লম্বা অশাখানিত তন্তু বের হয়। এর দৈর্ঘ্য ১ মিমি থেকে কয়েক মিটার পর্যন্ত হতে পারে। এই লম্বা একক তন্তুকে অ্যাক্সন বলে। অ্যাক্সন অর্থ হচ্ছে অক্ষ দণ্ড। অ্যাক্সনের বাহিরের দিকে একটি আবরণী থাকে। একে নিউরিলেমা (neurilemma) বলে।

একটি স্নায়ুকোষের অ্যাক্সন পরবর্তী কোষের ডেনড্রনের একটি শাখার সঙ্গে মিলিত হয়। এভাবে অনেকগুলো স্নায়ুকোষ একত্রে যুক্ত হয়ে একটি স্নায়ু বা nerve গঠন করে। অ্যাক্সন ও ডেনড্রনের মিলন স্থলকে সিন্যাপ্স (synapse) বলে। সিন্যাপ্সে অ্যাক্সন বাহিত সংবেদন পরবর্তী কোষের ডেনড্রনে প্রবাহিত হয়।

স্নায়ুকলার কাজ

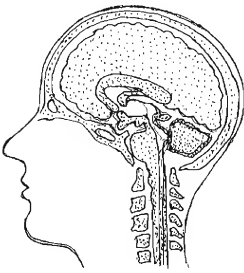
- (১) দেহের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ও সংবেদনগ্রাহী অঙ্গ থেকে গৃহীত উদ্দীপনা দেহের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করে।
- (২) দেহের কার্যকর অংশ এ উদ্দীপনায় সাড়া দেয়। যেমন মশা কামড়ালে এ অনুভূতি মস্তিষ্কে পাঠায়। মস্তিষ্ক হাতকে এ কথা জানায় তখন হাত মশা মারার চেষ্টা করে।

- (৩) উদ্দীপনা বা ঘটনাকে স্মৃতিতে ধারণ করে।
 (৪) দেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

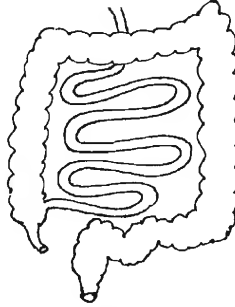
অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

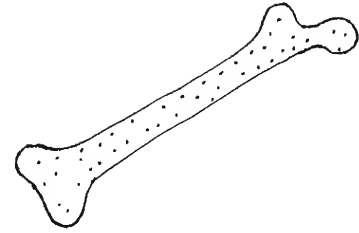
- বাইসেপস কোন ধরনের পেশি ?
 ক. আবরণী
 গ. অনৈচ্ছিক
 খ. ঐচ্ছিক
 ঘ. হৃদপেশি
- কোন পেশি কোষে একাধিক নিউক্লিয়াস বিদ্যমান?
 ক. ঐচ্ছিক
 গ. স্নায়ুকলা
 খ. অনৈচ্ছিক
 ঘ. হৃদপেশি
- কোন অঙ্গের পেশি পার্শ্ব শাখা দিয়ে সংযুক্ত ?
 ক. ফুসফুস
 গ. হৃৎপিণ্ড
 খ. যকৃৎ
 ঘ. পাকস্থলি
- নিউরিলেমা কোনটির আবরণ ?
 ক. কোষদেহ
 গ. ডেনড্রন
 খ. অ্যাক্সন
 ঘ. ডেনড্রাইট
- নিচের ছবিগুলোর মধ্যে কোনটিতে পেশি কলা (Tissue) রয়েছে ?



চিত্র A



চিত্র B



চিত্র C

- ক. চিত্র A
 গ. চিত্র C
 খ. চিত্র B
 ঘ. চিত্র A ও চিত্র B তে।
৬. যোজক কলার বৈশিষ্ট্য
- মেসোডার্ম নামক ভ্রূণীয় স্তর থেকে উৎপন্ন
 - এর কোষগুলো নিয়মিতভাবে স্থাপিত, নির্দিষ্ট স্তরে সাজানো থাকে না।
 - ধাতু পদার্থ বেশি।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i
 গ. i, ও iii
 খ. ii
 ঘ. i, ii ও iii

দ্বাবিংশ অধ্যায়

মানব দেহ : পরিপাকতন্ত্র ও রেচনতন্ত্র

মানব দেহের বিভিন্ন তন্ত্র

প্রত্যেকটি জীবের একটি নির্দিষ্ট সংগঠিত দেহ রয়েছে। জীবটি উদ্ভিদ হোক বা প্রাণী হোক। জীব দেহের গঠন শুরু হয় জীব কোষ থেকে। প্রাণী দেহ তৈরি হয় প্রাণী কোষ থেকে এবং উদ্ভিদ দেহ তৈরি হয় উদ্ভিদ কোষ থেকে। একই উৎস থেকে উৎপন্ন একই প্রকৃতির এবং একই কাজের উপযোগী এমন অসংখ্য কোষ একত্রে মিলে তৈরি করে কলা। আবার একই কাজে নিয়োজিত থাকে এমন ধরনের কিছু কলা সম্মিলিতভাবে তৈরি করে এক একটি অঙ্গ। তেমনিভাবে আবার কতগুলো অঙ্গ মিলে গঠিত হয় তন্ত্র। অর্থাৎ একই ধরনের কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন অঙ্গের সমষ্টিই হচ্ছে একটি তন্ত্র।

আমাদের দেহের বিভিন্ন জৈবিক কাজ সম্পাদনের জন্য রয়েছে বিভিন্ন তন্ত্র। যথা (১) কঙ্কাল তন্ত্র, (২) পরিপাক তন্ত্র, (৩) শ্বসন তন্ত্র, (৪) রক্ত সংবহন তন্ত্র, (৫) রেচন তন্ত্র, (৬) স্নায়ু তন্ত্র, (৭) প্রজনন তন্ত্র, (৮) সমন্বয় ও পরিবহণ তন্ত্র।

পরিপাক তন্ত্র

তোমরা সবাই ট্রেন চলতে দেখেছ। ট্রেনের সামনের দিকে থাকে ইঞ্জিন। এ ইঞ্জিন ট্রেনকে টেনে নেয়। ট্রেন টেনে নিতে ইঞ্জিনের যে শক্তির দরকার হয় এ শক্তি ইঞ্জিন পায় কয়লা বা ডিজেল থেকে। শুধু ট্রেন কেন ইঞ্জিনচালিত যত রকম যান আছে অর্থাৎ উড়োজাহাজ, মোটর গাড়ি ইত্যাদি প্রত্যেকটির চলার জন্য দরকার পেট্রোল বা ডিজেল। পেট্রোল, ডিজেল বা কয়লার মধ্যে শক্তি জমা থাকে। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ সৌরশক্তিকে রাসায়নিকশক্তি রূপে জমা করে। পেট্রোলে বা কয়লাতে সংবন্ধনকৃত স্থিতিশক্তি হচ্ছে পরোক্ষভাবে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সংগৃহীত সৌরশক্তি। এ শক্তিই ইঞ্জিন কাজে লাগায়।

আমাদের দেহ অসংখ্য কোষ দ্বারা তৈরি। ইঞ্জিন চলতে যেমন শক্তি দরকার হয় তেমনই আমাদের দেহের কোষগুলোকে সজীব ও কার্যকরী রাখার জন্য দরকার খাদ্য। খাদ্যেও সৌরশক্তি স্থিতিশক্তিরূপে জমা থাকে। দেহের বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের জন্য যে শক্তি দরকার তা খাদ্যে জমাকৃত স্থিতিশক্তি থেকে আসে। তাই দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন, শক্তি উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো ইত্যাদি কাজের জন্য আমাদের খাদ্য গ্রহণ করা দরকার। জটিল খাদ্যবস্তু দেহকোষগুলো সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। তাই খাদ্যবস্তুকে ভেঙে সহজ, সরল ও কোষের গ্রহণোপযোগী করতে হয়।

যে প্রক্রিয়ায় মানব দেহে খাদ্য সরল ও কোষের শোষণ উপযোগী অবস্থায় পরিণত হয় তাকে পরিপাক বলে। খাদ্য পরিপাকের দায়িত্বে যে তন্ত্র রয়েছে তাকে পরিপাক তন্ত্র বলে। পরিপাক নালী ও পরিপাক গ্রন্থি নিয়ে পরিপাক তন্ত্র গঠিত।

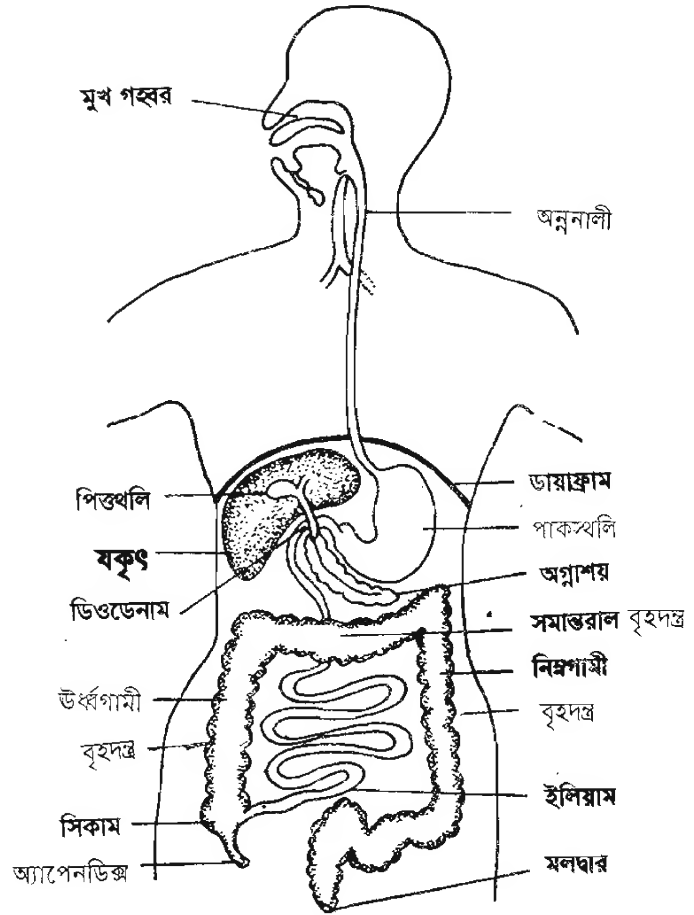
পরিপাক নালী

আমাদের পরিপাক নালী মুখগহ্বর থেকে শুরু করে মলদ্বার পর্যন্ত বিস্তৃত। এ নালী নিম্নলিখিত অংশ নিয়ে গঠিত। যথা (১) মুখছিদ্র, (২) মুখগহ্বর, (৩) গলবিল, (৪) অন্ননালী, (৫) পাকস্থলি, (৬) ক্ষুদ্রান্ত্র, (৭) বৃহদন্ত্র, (৮) মলদ্বার।

(১) মুখছিদ্র : মুখছিদ্র থেকেই পরিপাক নালী শুরু। মুখছিদ্রের উপরে রয়েছে উপরের ঠোঁট এবং নিচে রয়েছে নিচের ঠোঁট। এ ছিদ্র পথেই খাদ্য পরিপাকনালীতে প্রবেশ করে। ঠোঁটদ্বয় খোলা ও বন্ধ থেকে খাদ্য গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করে।

(২) **মুখগহ্বর** : মুখছিদ্রের পরেই মুখগহ্বরের অবস্থান। সামনে দাঁতসহ দুইটি চোয়াল দ্বারা মুখ গহ্বর বেষ্টিত। এর উপরিভাগে রয়েছে তালু এবং নিচের দিকে রয়েছে মাংসল জিহ্বা। এ ছাড়া দুই পার্শ্বে রয়েছে তিন জোড়া লালগ্রন্থি।

দাঁত খাদ্যবস্তু কেটে ছোট করে পেষণে সাহায্য করে। এসময় জিহ্বা খাদ্যবস্তুর স্বাদ গ্রহণ করে এবং খাদ্যবস্তুকে বার বার দাঁতের নিচে পাঠিয়ে চিবাতে সাহায্য করে। মানুষের দাঁতের সংখ্যা ৩২টি, প্রতি চোয়ালে ১৬টি করে। এ সব দাঁত ৪ প্রকার। যথা কর্তন দাঁত বা ইনসিসর, ছেদন দাঁত বা কেনাইন, অগ্রপেষণ বা প্রিমোলার এবং পেষণ দাঁত বা মোলার। এদের কাজ বিভিন্ন। কর্তন দাঁত খাবার ছোট ছোট করে কাটে। ছেদন দাঁত দিয়ে মাংস ইত্যাদি ছেঁড়ে ও কাটে। অগ্রপেষণ এবং পেষণ দাঁত উভয়ই খাবার পিষে নরম করে। আসলে অগ্রপেষণ বা প্রিমোলার দিয়েই এ কাজ চলে যায়। পিছনে পেষণ বা মোলার দাঁত না হলেও চলে। এরা অন্যান্য দাঁতের অনেক পরে গজায়। এরা ‘আক্কেল দাঁত’ নামেও পরিচিত।



চিত্র ২২.১ : মানুষের পরিপাকতন্ত্র

(৩) **গলবিল** : মুখ গহ্বরের পরেই এর অবস্থান। এর মাধ্যমেই খাদ্যবস্তু মুখ গহ্বর থেকে গ্রাসনালীতে যায়। গলবিলে কোন এনজাইম নিঃসৃত হয় না তাই এখানে কোন খাদ্যবস্তু পরিপাক হয় না।

(৪) **অনুনালী** : গলবিল এবং পাকস্থলির মাঝামাঝি জায়গায় এর অবস্থান। খাদ্যবস্তু এর ভেতর দিয়ে গলবিল থেকে পাকস্থলিতে যায়।

(৫) **পাকস্থলি** : গ্রাসনালী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যবর্তী স্থানে এর অবস্থান। গলবিল ও গ্রাসনালীর ক্রমসংকোচনের ফলে পিচ্ছিল খাদ্যবস্তু এখানে এসে জমা হয়। পাকস্থলির আকৃতি থলের মতো। এর প্রাচীর বেশ পুরু। পাকস্থলির প্রথম ও শেষ অংশে পেশি বলয় রয়েছে।

(৬) **ক্ষুদ্রান্ত্র** : ক্ষুদ্রান্ত্র হলো পাকস্থলির পরবর্তী অংশ এটা পরিপাক নালীর সবচেয়ে দীর্ঘ অংশ। ক্ষুদ্রান্ত্র তিনটি ভাগে বিভক্ত। যথা (ক) ডিওডেনাম, (খ) জেজুনা ও (গ) ইলিয়াম।

(ক) **ডিওডেনাম** : এটাই ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ। অর্থাৎ পাকস্থলির পরের অংশ, দেখতে U আকৃতির। পিত্তথলি থেকে পিত্তরস এবং অগ্নাশয় থেকে অগ্নাশয় রস নালী মারফত এখানে এসে খাদ্যের সাথে মিশে।

(খ) **জেজুনা** : ইহা ডিওডেনাম এবং ইলিয়ামের মধ্যবর্তী অংশ।

(গ) **ইলিয়াম** : ইহা ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষ অংশ। শোষকযন্ত্রগুলো দেখতে আঙুলের মতো। এদের ভিলাই বলে। হজমের পর খাদ্যের সারাংশ এরা শোষণ করে।

(৭) বৃহদন্ত্র : ইহাই পরিপাক নালীর শেষ অংশ। বৃহদন্ত্র ক্ষুদ্রান্ত্রের ইলিয়ামের পর থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত। লম্বায় এটা ক্ষুদ্রান্ত্র অপেক্ষা ছোট কিন্তু এর ভেতরের ব্যাস ক্ষুদ্রান্ত্রের ভেতরের ব্যাস অপেক্ষা বড়। বৃহদন্ত্র তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা : (ক) সিকাম, (খ) কোলন এবং (গ) মলাশয়।

(ক) সিকাম : বৃহদন্ত্রের প্রথম অংশ। এর সাথে একটি নলাকার থলে থাকে। থলেটির নাম এপেন্ডিক্স।

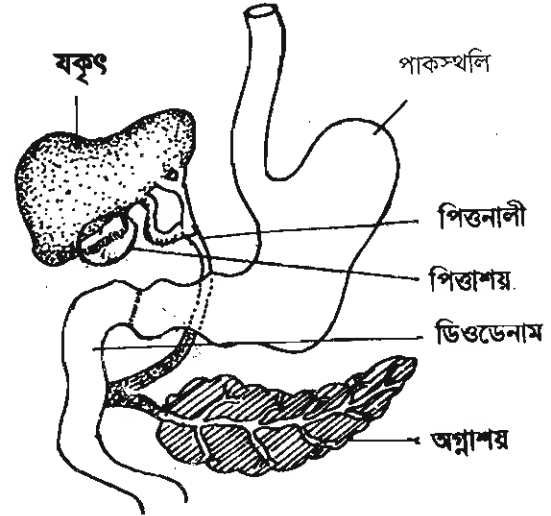
(খ) কোলন : এটা সিকাম থেকে মলাশয় পর্যন্ত লম্বা। এটা তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা : উর্ধ্বগামী বৃহদন্ত্র, সমান্তরাল বৃহদন্ত্র ও নিম্নগামী বৃহদন্ত্র।

(গ) মলাশয় : এটাই বৃহদন্ত্রের শেষ প্রান্ত। দেখতে কতকটা থলের মতো। খাদ্যের অপাচ্য অংশ এখানে মলরূপে জমা হয়।

(৮) মলদ্বার : পায়ু পরিপাক নালীর সর্বশেষ প্রান্ত। এ প্রান্ত পথেই পরিপাক নালী বাইরের সাথে উন্মুক্ত। এ পথেই মল দেহ থেকে বাইরে বের হয়।

পরিপাক গ্রন্থির নাম ও পরিপাক গ্রন্থির কাজ

পরিপাক নালীর বাহিরে যে সব গ্রন্থির নিঃসৃত রস খাদ্য পরিপাকে অংশগ্রহণ করে তাদের পরিপাক গ্রন্থি বলে। লালা গ্রন্থি, যকৃৎ এবং অগ্নাশয় পরিপাক গ্রন্থির অন্তর্ভুক্ত। লালা গ্রন্থি থেকে লালা ক্ষরণ হয়। এতে পানি, সোডিয়াম বাইকার্বনেট ও অ্যামাইলেজ নামক এনজাইম থাকে। পানি খাদ্যকে নরম করে। বাইকার্বনেট খাদ্যের অম্লত্ব প্রশমন করে। টায়ালিন শর্করা খাদ্যকে পরিপাক করে। যকৃৎ থেকে পিত্তরস তৈরি হয়ে পিত্ত থলিতে জমা থাকে। পিত্তরস স্নেহ জাতীয় খাদ্য হজমে সাহায্য করে। ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন, লাইপেজ ও অ্যামাইলেজ এনজাইমগুলোর উৎস হচ্ছে অগ্নাশয়। ট্রিপসিন ও কাইমোট্রিপসিন আমিষ খাদ্য, লাইপেজ স্নেহ খাদ্য এবং অ্যামাইলেজ শর্করা জাতীয় খাদ্য হজমে সাহায্য করে।



চিত্র ২২.২ : পরিপাক গ্রন্থি

পরিপাক প্রক্রিয়া

পরিপাক কী?

আমরা খাদ্য যে অবস্থায় খাই, সেগুলো দেহ গ্রহণ করতে পারে না। পরিপাক নালীর বিভিন্ন অংশে এনজাইমের প্রভাবে এরা ভেঙে সরলতর এবং পরিশোষণযোগ্য যৌগে পরিণত হয়। আমিষ জাতীয় খাদ্য ভেঙে প্রোমিনো এসিড, শ্বেতসার ভেঙে সরল শর্করা (মনোস্যাকারাইড) এবং স্নেহ জাতীয় পদার্থ ভেঙে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত হলেই এরা শোষণযোগ্য হয়। এ পরিবর্তনকেই পরিপাক বা হজম বলে। পরিপাকের সংজ্ঞা এভাবে দেয়া যেতে পারে: কঠিন ও জটিল খাদ্য এনজাইমের প্রভাবে সরল ও শোষণযোগ্য অবস্থায় পরিণত করার প্রক্রিয়াকে পরিপাক বলে।

মুখ গহ্বরের পরিপাক

মুখ গহ্বরে খাদ্য চিবানোর পর খাদ্যবস্তু ছোট ছোট টুকরায় পরিণত হয়। এ সময় লালা গ্রন্থি থেকে লালা নিঃসৃত হয়ে খাদ্যের সাথে মিশে। এতে খাদ্য পিচ্ছিল হয় এবং খাদ্য গিলতে সুবিধা হয়।

লালা রসে টায়ালিন নামক এক ধরনের এনজাইম থাকে। এ এনজাইম শ্বেতসারকে আংশিকভাবে ভেঙে শর্করায় (মল্টোজে) পরিণত করে। (এনজাইম হচ্ছে জীব কোষে সৃষ্ট এক ধরনের আমিষ জাতীয় পদার্থ যা কোন জৈব রাসায়নিক ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে কিন্তু নিজে অপরিবর্তিত থাকে)। এর পর খাদ্যবস্তু মুখ গহ্বরের পরবর্তী অংশ অনুনালী হয়ে পাকস্থলিতে গিয়ে জমা হয়।

পাকস্থলিতে পরিপাক

খাদ্য পাকস্থলিতে পৌঁছলে পাকস্থলির ভেতরের গা থেকে পাচক রস নিঃসৃত হয়। পাচক রসে পেপসিন নামে এক ধরনের এনজাইম থাকে। এ এনজাইম খাদ্যের আমিষ অংশকে পেপটোনে পরিণত করে। এ ছাড়া পাকস্থলির গা থেকে নিঃসৃত হয় হাইড্রোক্লোরিক এসিড। এটা খাদ্যে বিদ্যমান রোগজীবাণু ধ্বংস করে। অম্লীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে পেপসিনের কাজে সহায়তা করে। পাকস্থলির প্রাচীর থেকে প্রচুর মিউকাস বা শ্লেষ্মা ক্ষরণ হয়। এরা প্রাচীরের ভিতরের গায়ে লেপ্টে থাকে। এতে পাকস্থলি গহ্বরের এসিড বা এনজাইম প্রাচীরের কোষগুলোর ক্ষতি করতে পারে না। পাকস্থলির পেশির হালকা বিচলনে খাদ্যবস্তু পাচক রসের সাথে ভালোভাবে মিশে এবং পরিপাক শুরু হয়। এরপর খাদ্য মন্ডের আকার ধারণ করে এবং পাকস্থলির পরবর্তী অংশ ডিওডেনামে প্রবেশ করে।

ডিওডেনামে পরিপাক

ডিওডেনামে খাদ্যবস্তু পিত্তরস এবং অগ্নাশয় রসের সাথে মিশে। একটি সাধারণ পিত্তনালী দিয়ে পিত্তরস এবং অগ্নাশয় রস ডিওডেনামে পৌঁছে।

পিত্তরসের রঙ কতকটা সবুজাভ হলুদ বর্ণের এবং স্বাদ তিতা। পিত্ত রসের কাজ হল খাদ্যের স্নেহ অংশকে সূক্ষ্মতর অংশে পরিণত করা। পিত্তরসে বাইকার্বনেট থাকে যা পাকস্থলি থেকে আগত অম্লীয় রসকে প্রশমিত করতে সাহায্য করে।

অগ্নাশয় রসে ৪টি এনজাইম থাকে। এদের নাম হচ্ছে ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন, অ্যামাইলেজ এবং লাইপেজ। কাইমোট্রিপসিন এবং ট্রিপসিনের কাজ হচ্ছে আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাক করা অর্থাৎ পাকস্থলিতে তৈরি পেপটোনকে পলিপেপটাইড এবং কিছু অংশকে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করা। অ্যামাইলেজ শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যকে সরল শর্করা অর্থাৎ গ্লুকোজে পরিণত করে। লাইপেজ স্নেহ জাতীয় খাদ্যকে ভেঙে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে।

অন্ত্রের যে সকল এনজাইম থাকে নিম্নে তাদের নাম ও কাজ উল্লেখ করা হল :

এনজাইম	কাজ
ইরেপসিন (আসলে আমিষ পরিপাককারী কয়েকটি এনজাইমের সমষ্টির একত্রিত নাম)	আমিষকে ভেঙে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে
লাইপেজ	স্নেহ জাতীয় খাদ্যকে ভেঙে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে।
সল্টেজ সুক্রোজ ল্যাকটেজ]	বিভিন্ন সরল শর্করাকে গ্লুকোজে পরিণত করে।

ডিওডেনামে সব খাদ্যের পরিপাক সম্পূর্ণ হয়ে যায়। ক্ষুদ্রান্ত্রের পরবর্তী অংশগুলোতে পরিপাককৃত খাদ্য শোষিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্র প্রাচীরে আঙুলের মতো অনেক প্রবৃদ্ধি থাকে। এদের ভিলাই বলে (এক বচনে ভিলাস)। এদের ভেতর অনেক রক্তের কৈশিক নালিকা থাকে। এরা খাদ্যাংশ শোষণ করে শিরা মারফত যকৃৎ পৌঁছায়। যকৃৎ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য যাচাই বাছাই করে দেহের বিভিন্ন স্থানে বিলিভন্টন করে। এগুলো দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি সাধন, তাপ উৎপাদন, বংশবৃদ্ধি ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়। তাৎক্ষণিকভাবে খাদ্যের যে অংশের প্রয়োজন নেই, যকৃৎ সেগুলো সঞ্চিত রাখার ব্যবস্থা করে।

বৃহদন্ত্রে পরিপাক

বৃহদন্ত্র মূলত খাদ্যের জলীয় অংশ থেকে পানি শোষণ করে। এ কাজটি অত্যন্ত জরুরি। কেননা কোষের ৯০% ভাগই পানি। শরীর থেকে পানি যেন বেশি পরিমাণ বের হয়ে যেতে না পারে সে জন্যই পরিপাক নালী থেকে যতটা সম্ভব পানি বৃহদন্ত্রে পরিশোধিত হয়।

বৃহদন্ত্রের শেষ অংশ অর্থাৎ মলাশয়ে খাদ্যের অপাচ্য অংশ মল হিসাবে সঞ্চিত হয় এবং পরে পায়ু দিয়ে তা শরীরের বাইরে বর্জিত হয়।

রেচনতন্ত্র

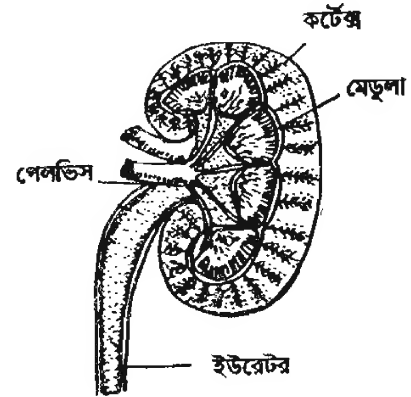
বিপাকের ফলে দেহে নানা ধরনের বর্জ্য পদার্থ সৃষ্টি হয়। এ বর্জ্য পদার্থগুলো দেহের জন্য ক্ষতিকর। তাই এ পদার্থগুলো দেহ থেকে বের করে দেয়া দরকার। জীব দেহের প্রতিটি কোষে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভাঙ্গাগড়া চলছে তাদের একত্রে বিপাক বলে।

প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের বিপাকের ফলে দেহে নাইট্রোজেন ঘটিত রেচন পদার্থ যথা ইউরিয়া, ইউরিক এসিড ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। আবার স্নেহ ও শর্করা জাতীয় খাদ্য বিপাকের ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। তবে সত্যিকার অর্থে আমিশ জাতীয় খাদ্যের বিপাকের ফলে সৃষ্ট নাইট্রোজেন ঘটিত দূষিত পদার্থ শরীর থেকে বের করে দেয়ার প্রক্রিয়াকেই রেচন বোঝায়।

যে যে অঙ্গ রেচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে অর্থাৎ যে সব অঙ্গ মিলিতভাবে রেচন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে তাদের একত্রে রেচনতন্ত্র বলে।

বৃক্ক

বৃক্ক মানব দেহের প্রধান রেচন অঙ্গ। দেখতে শিমের মতো। এরা সংখ্যায় দুইটি। দেহের পেছন ভাগে মেরুদণ্ডের দুইধারে অবস্থিত। প্রতিটি বৃক্কের বাইরের দিকের অংশকে কটেজ এবং ভিতরের দিকের অংশকে মেডুলা বলে। মেডুলার নিচে ফাঁকা স্থানকে বৃক্কের পেলভিস বলে। এখান থেকে একটি সরু ও লম্বা নালী পিছনের দিকে যায়। একে ইউরেটার বলে। বৃক্ক থেকে মূত্র এর মারফত মূত্রথলিতে পৌঁছে।



চিত্র ২২.৩ : বৃক্ক

বর্জ্যবাহী রক্তের ধমনী বৃক্কে পৌঁছে অসংখ্য শাখায় বিভক্ত হয়। এ সব শাখার প্রান্ত একটি কুড়লীতে শেষ হয়। রক্তনালীর এ কুড়লীকে গ্লোমেয়ুলাস বলে। গ্লোমেয়ুলাসকে ঘিরে একটি ক্যাপসুল থাকে। ক্যাপসুলের পেছনে একটি নালীযুক্ত থাকে। গ্লোমেয়ুলাস ক্যাপসুল ও নালীকে একত্রে নেফ্রন বলে। এরাই বৃক্কের কার্যকরী একক। এরূপ প্রতি বৃক্কে নেফ্রনের সংখ্যা ১০ লক্ষ। নেফ্রনের পিছন দিকে একটি প্যাচানো নালী থাকে। এরা রক্ত নালীকার কৈশিক জালে পরিবৃত থাকে। এ সব নালীর মিলিত দৈর্ঘ্য ২০০ মাইলের মতো। নেফ্রনে রক্তের দূষিত বর্জ্য পদার্থ ছাঁকন প্রক্রিয়ায় পরিসূত হয়ে নেফ্রনের নালীকায় প্রবেশ করে। প্রথমবার ছাঁকনের সময় অনেক প্রয়োজনীয় পদার্থ রক্ত থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু বৃক্ক নালিকা দিয়ে অগ্রসর হবার সময় এগুলো আবার নালী থেকে বেরিয়ে রক্তে প্রবেশ করে। এ দ্বিতীয় ছাঁকনের পর নালী মধ্যস্থ বর্জ্যপদার্থ পানিতে দ্রবীভূত থাকে এবং মূত্র তৈরি করে। মানুষের দেহে সৃষ্ট নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থের মধ্যে ইউরিয়া এবং ইউরিক এসিড প্রধান।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আমিষ পরিপাকে কোন এনজাইমের ভূমিকা রয়েছে ?
 ক. টায়ালিন
 গ. পেপসিন
 খ. মিউসিন
 ঘ. লাইপেজ।
২. কোন এনজাইমের প্রভাবে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য গ্লুকোজে পরিণত হয় ?
 ক. পেপসিন
 গ. লাইপেজ
 খ. ট্রিপসিন
 ঘ. অ্যামাইলেজ
৩. ভিলাই এর অবস্থান কোথায় ?
 ক. অনুনালী
 গ. ক্ষুদ্রান্ত্র
 খ. পাকস্থলি
 ঘ. বৃক্ক
৪. মানব দেহের প্রধান রেচন অঙ্গ কোনটি ?
 ক. যকৃৎ
 গ. ত্বক
 খ. ফুসফুস
 ঘ. বৃক্ক
৫. মানবদেহে বৃক্কের সংখ্যা কয়টি ?
 ক. একটি
 গ. তিনটি
 খ. দুইটি
 ঘ. চারটি
৬. যকৃৎ হচ্ছে মানবদেহের
 i. বৃহৎ পরিপাক গন্ডি
 ii. পিত্তরস সঞ্চয়কারী
 iii. পিত্তরস উৎপাদনকারী

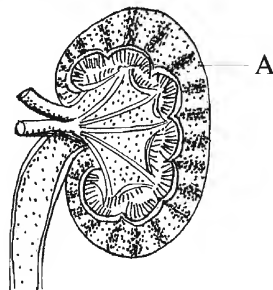
নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i ও ii
 গ. iii
 খ. ii ও iii
 ঘ. i, ii ও iii
৭. এনজাইম
 i. এক ধরনের আমিষ জাতীয় পদার্থ
 ii. ইচ্ছা করলে বাইরে থেকে গ্রহণ করতে পারি।
 iii. নালীর মাধ্যমে নিঃসৃত হয়।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i
 গ. iii
 খ. ii
 ঘ. i, ii ও iii,

নিচের চিত্রের আলোকে ৮ ও ৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও



৮. চিত্রের A চিহ্নিত অংশটির নাম

ক. কর্টেক্স

খ. মেডুলা

গ. পেলভিস

ঘ. ইউরেটার

৯. চিত্রের অঙ্গটি থেকে বের করে

i. শুধুমাত্র নাইট্রোজেন ঘটিত দূষিত পদার্থ

ii. রক্তের দূষিত পদার্থ মূত্রের মাধ্যমে

iii. রক্তের দূষিত পদার্থ ছাকন প্রক্রিয়া

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

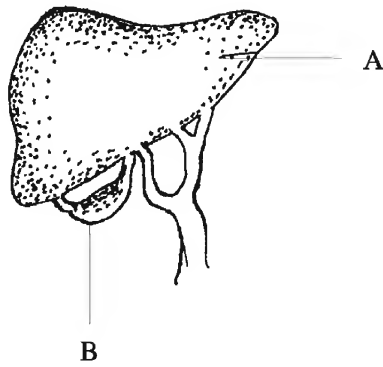
খ. i ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

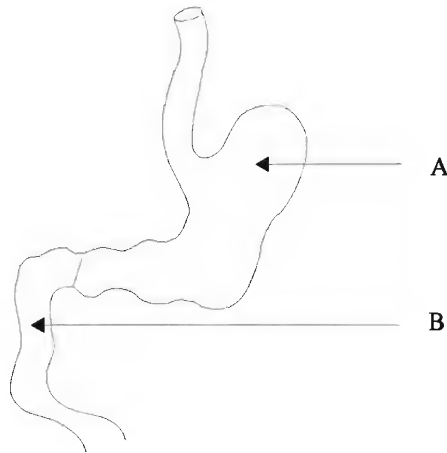


ক. A চিহ্নিত অঙ্গটির নাম কী ?

খ. A ও B চিহ্নিত অঙ্গ দুইটির মধ্যে সম্পর্ক কী ?

গ. B চিহ্নিত অঙ্গটি ঠিকমত কাজ করতে না পারলে কী সমস্যা হবে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. A চিহ্নিত অঙ্গটি পরিপাক গ্রন্থি আবার খাদ্য সঞ্চয়কারীও আলোচনা কর।



ক. A থেকে নিঃসৃত এনজাইমটিকে কী বলা হয় ?

খ. এনজাইম কীভাবে কাজ করে ?

গ. B কোন এনজাইম নিঃসৃত করে না কিন্তু খাদ্য পরিপাকে মূল ভূমিকা রাখে কীভাবে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. A কে রাসায়নিক কারখানার সাথে তুলনা করা যায়। আলোচনা কর।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পরিবেশ দূষণ

বাংলাদেশ একটি অত্যন্ত ঘনবসতি পূর্ণ দেশ। এদেশের জনসংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধিতে বহু সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। ১৯৪১ সালের দিকে এদেশের জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটির বেশি। ১৯৮১ সালের দিকে তা হয় প্রায় নয় কোটি। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ১১.১৫ কোটি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.১৭ এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল ৭৫৫। ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৩ কোটি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪৮ এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব ৮৭৬*। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্য বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, যানবাহন ইত্যাদি বাড়ছে, ফলে জীবনযাত্রার মান কমছে।

কোনো দেশ বা অঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিবেশকে কীভাবে দূষিত করে এবং কী সমস্যার সৃষ্টি করে তা আলোচনা করা হল :

পরিবেশ দূষণ

দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি ক্ষতিকর দিক হল পরিবেশ দূষণ। পরিবেশ বিভিন্ন কারণে জীবন ধারণের জন্য ক্ষতিকর ও বসবাসের অনুপযোগী হয়। এরূপ পরিবেশকে দূষিত পরিবেশ বলা হয়। আর যে প্রক্রিয়ায় পরিবেশ নষ্ট হয়ে থাকে তাকে পরিবেশ দূষণ বলা হয়। পরিবেশের তিনটি প্রধান উপাদান হল : বায়ু, পানি ও মাটি। পরিবেশের এ উপাদানগুলো দূষিত হবার কারণ ও পরিণাম সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হল।

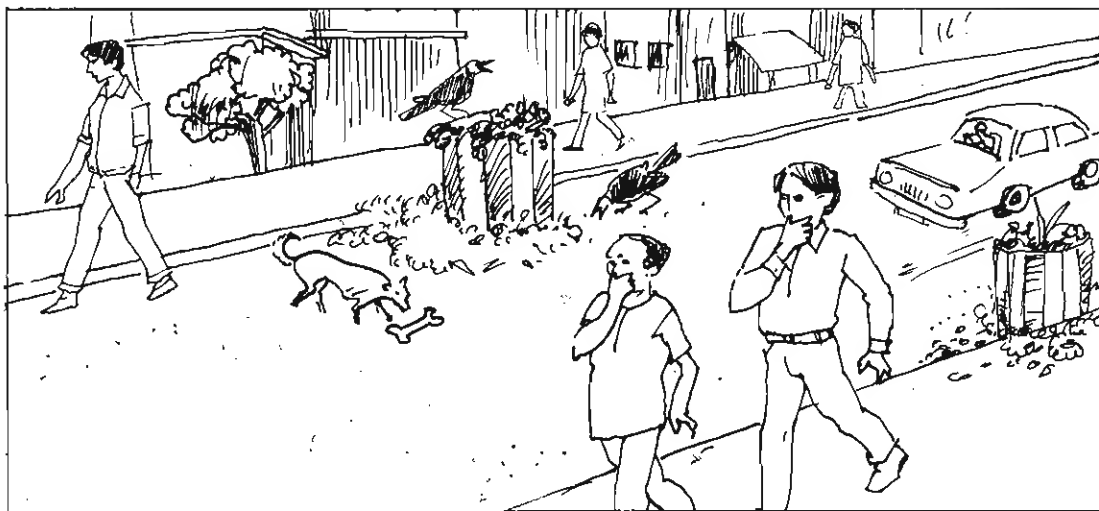
বায়ু দূষণ

আমরা সবাই জানি দূষিত বায়ু নানা প্রকার রোগ জীবাণু ছড়ায়। আর এ বায়ু নানাভাবে দূষিত হয়ে থাকে। ঘরবাড়ির উচ্ছিষ্ট, মলমূত্র, পচাডোবা ও আবর্জনার স্তুপ, রোগীর হাঁচি ও কাশির সাথে নির্গত রোগজীবাণু বায়ুকে দূষিত করে। তা ছাড়া, কারখানার বর্জ্য পদার্থ, কলকারখানা ও মোটর গাড়ি থেকে নির্গত আধপোড়া ধোঁয়া ইত্যাদির দ্বারা বায়ু দূষিত হয়। বায়ু দূষিত হওয়ার কারণগুলো লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে নানাভাবে জড়িত।

কোনো অঞ্চলের লোকসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেলে, এ বাড়তি জনসংখ্যার জন্য অতিরিক্ত খাদ্য, বাসস্থান, যানবাহন, কর্মসংস্থান ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। শহরের কিংবা গ্রামের যেখানেই হোক না কেনো অল্প জায়গায় অধিক সংখ্যক বাসগৃহ তৈরি করলে বসতি ঘন হয়ে উঠে। বর্তমানে বহু শহরে অনেক অপরিষ্কৃত বসতি গড়ে উঠেছে। এ সমস্ত ঘনবসতি এলাকায় আবর্জনা ও মলমূত্র নিষ্কাশনের তেমন ভাল ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। ফলে আবর্জনাও মলমূত্র জমে, পচে দুর্গন্ধ ছড়ায় ও নানা রকম বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি হয়। এ সমস্ত গ্যাস বায়ুকে দূষিত করে তোলে এবং নানা প্রকার রোগ জীবাণু সৃষ্টি করে।

বাড়তি জনসংখ্যার জীবিকা নির্বাহ ও দেশের উন্নয়নের জন্য নতুন নতুন শিল্পকারখানা গড়ে উঠে। কলকারখানা চালনা ও মানুষের আরাম-আয়েশের জন্য স্থাপন করতে হয় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। যাতায়াতের জন্য যন্ত্রচালিত যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হয়। কলকারখানা ও মোটরযানের ধোঁয়া থেকে নির্গত হয় কার্বন মনোক্সাইড ও সালফার ডাই অক্সাইড গ্যাস। এ বিষাক্ত গ্যাসেও বায়ু দূষিত হয়। এ গ্যাস স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

* আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট, আগস্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।



চিত্র ২৩.১ : শহরে ময়লা ও আবর্জনার স্তুপ বায়ু দূষিত করছে

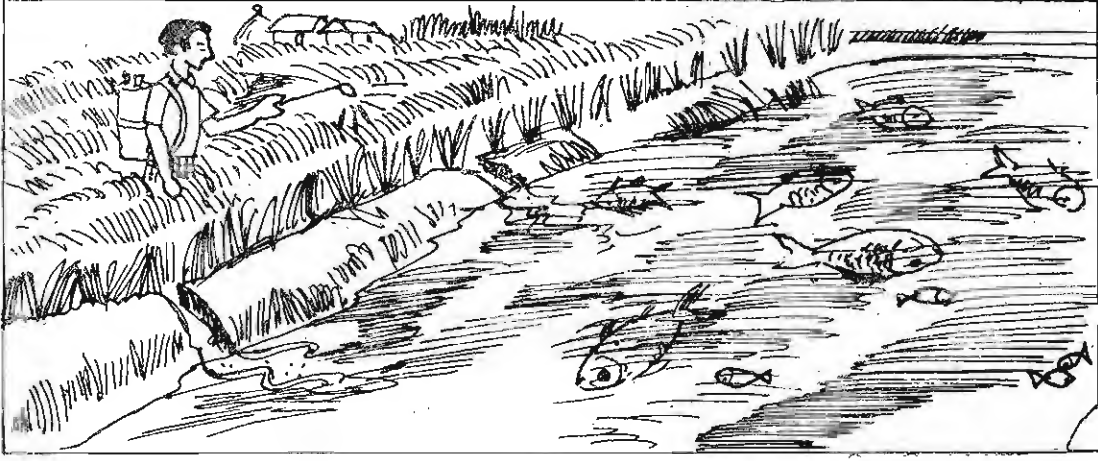
কোনো কোনো মোটর গাড়ি প্রচুর ধোঁয়া ছড়ায়। এ কালো ধোঁয়াতে থাকে আধপোড়া কার্বন ও অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাস। গাড়ির যন্ত্রপাতি ঠিকমত রক্ষণাবেক্ষণ না করলে কালো ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়। এ ছাড়াও ইটের ভাটা, রান্নার চুলা, মোটর গাড়ির অব্যবহৃত টায়ার ও ঝোপজঙ্গল পোড়ালেও ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়। এমনকি তামাক, বিড়ি সিগারেটের ধোঁয়াও বায়ুকে দূষিত করে।

তোমরা জানো, বাঁচার জন্য আমাদের অক্সিজেন প্রয়োজন। আর বিশুদ্ধ বায়ু থেকে বেশি করে অক্সিজেন পাওয়া সম্ভব। বায়ু বিশুদ্ধ ও দূষণমুক্ত রাখতে হলে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের সাথে সাথে জনসংখ্যা সীমিত রাখাও প্রয়োজন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে বায়ু দূষিত হওয়ার কারণসমূহও অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

পানি দূষণ

দৈনন্দিন জীবনে পানির ব্যবহার বহুবিধ। আমরা পানি পান করি, ধোয়া মোছার কাজে পানি ব্যবহার করি। শিল্প কারখানায় বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রস্তুত করতে প্রচুর পানি প্রয়োজন হয়। এ পানি আমরা কোথা থেকে পাই, এ পানি বৃষ্টি, ঝরনা, নদী, নালা, খাল, বিল, ডোবা, পুকুর প্রভৃতি উৎস থেকে পাই। গ্রাম অঞ্চলের লোকেরা সাধারণত এ সকল উৎস থেকে পানি সংগ্রহ করে। অনেক গ্রামে খাবার পানির জন্য কূপ, ইদারা ও নলকূপ আছে। কিন্তু লোকসংখ্যার অনুপাতে বিশুদ্ধ পানির উৎস পর্যাপ্ত নয়। শহরে পানির প্রধান উৎস ট্যাপ বা কল। শহর কর্তৃপক্ষ নদী বা ভূগর্ভ থেকে পানি সংগ্রহ করে। শোধনকৃত পানি পাইপের সাহায্যে সরবরাহ করে থাকে। শহর কিংবা গ্রামে জনসংখ্যা যত বাড়তে থাকে, পানির চাহিদাও তত বাড়তে থাকে। সুতরাং শহরে বা গ্রামে পানির অভাব দূর করতে হলে সে এলাকার জনসংখ্যা সীমিত রাখা প্রয়োজন।

বাড়তি লোকের জন্য বাড়তি খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য উৎপাদন বাড়তে হলে জমিতে পানি সেচ ও রাসায়নিক সার দিতে হয়। ক্ষেতের পোকামাকড় দমনের জন্য বিভিন্ন রকম কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করা হয়। এ ওষুধের কিছু অংশ বৃষ্টির পানিতে মিশে নদী, নালা, খাল, বিল ও ডোবা, পুকুরের পানি দূষিত করে। এর ফলে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী মরে যায়। আবার ডোবা, পুকুরের পানিতে সারের পরিমাণ বেশি হলে শৈবাল ও জলজ উদ্ভিদ বেশি করে জন্মে। এ সমস্ত উদ্ভিদ যখন মরে পচতে শুরু করে, তখন পানির অক্সিজেন নিঃশেষ হয়ে যায়। এর দরুন মাছ মরে যায় এবং পানি দুর্গন্ধময় ও দূষিত হয়। পুকুরের পানিতে বাঁশ, বেত ও পাট ভিজিয়ে রাখলে এবং গরু, মহিষ, ছাগল গোসল করলেও পানি দূষিত হয়।



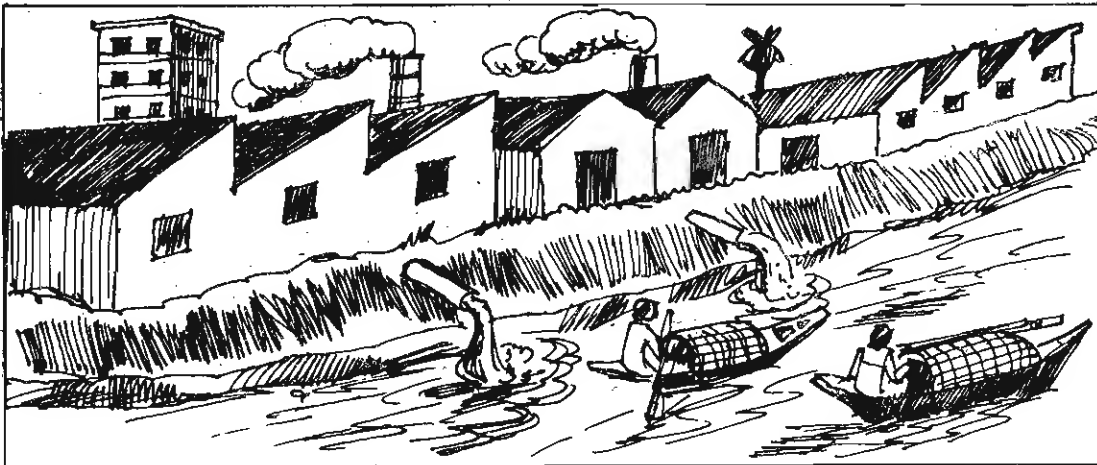
চিত্র ২৩.২ : কীটনাশক ওষুধ বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে জলাশয়ে পড়ার ফলে মাছ মারা যাচ্ছে।

খাদ্যের উচ্ছিষ্ট ময়লা আবর্জনা, জীবজন্তুর মৃতদেহ, গৃহস্থালির ব্যবহার্য নানা ধরনের পচনশীল জিনিস ইত্যাদি পচে বিভিন্ন প্রকার রোগজীবাণু সৃষ্টি হয়। এ সমস্ত ময়লা আবর্জনা ও রোগজীবাণু বৃষ্টির পানি, বাতাস, অন্যান্য জীবজন্তু প্রভৃতির মাধ্যমে বাহিত হয়। পরিশেষে কোনোভাবে নদী নালা, ডোবা পুকুর, খাল বিল, ইদারা এবং কলের পানিকেও দূষিত করতে পারে। এ দূষিত পানি পান করলে মানুষ কলেরা, উদরাময়, আমাশয়, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়।

লোকসংখ্যা বাড়লে উচ্ছিষ্টের পরিমাণও বাড়ে। নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্তের অভাবে এসব আবর্জনা জমে এবং পচে পানি দূষিত হয়। বিশেষ করে শহরে পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা বিদ্যমান হলে পানি দূষিত হয়। এ অবস্থায় শহরের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কঠিন হয়ে পড়ে।

জলাশয়, কূপ কিংবা নলকূপের আশে পাশে মলত্যাগ করলে পানি দূষিত হতে পারে। কূপের গা চুইয়ে বাইরের ময়লা পানি কূপের মধ্যে ঢুকে পানি দূষিত করতে পারে। জীবজন্তুর মলমূত্র ও আবর্জনা পড়েও কূপের পানি দূষিত হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাড়তি জনসংখ্যার কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের জন্য অধিক কলকারখানা স্থাপন করতে হয়। এ সব কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ পুকুর, নদী নালা ইত্যাদির পানি দূষিত করে।



চিত্র ২৩.৩ : কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ দ্বারা পানি দূষিত হচ্ছে।

দেশের বিভিন্ন শিল্প যেমন কাপড়কল, পাটকল, কাগজকল, রাসায়নিক কারখানা, সার কারখানা, চামড়া প্রক্রিয়াজাত কারখানা বা ট্যানারিগুলো সাধারণত নদীর ধারেই অবস্থিত। এ সকল কারখানার বর্জ্য পদার্থ নদীর পানি দূষিত করে। এ দূষিত পানি আমাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই পানিকে বিশুদ্ধ রাখা আমাদের একান্ত দরকার। পানি দূষিত হওয়ার জন্য মানুষই অনেকাংশে দায়ী।

জনসংখ্যা বাড়লে পানি দূষিত হবার সম্ভাবনা বাড়ে। সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করলে অনেক ক্ষেত্রে পানি বিশুদ্ধ ও নির্মল রাখা সম্ভব হবে।

মাটি দূষণ

যে যে কারণে পানি দূষিত হয় সাধারণত সে সব কারণে মাটিও দূষিত হতে পারে। মাটির স্বাভাবিক ধর্ম হচ্ছে আবর্জনা ও বর্জ্য পদার্থকে ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে পচিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা। কিন্তু যখন কোনো স্থানে আবর্জনা ও বর্জ্য পদার্থ অত্যধিক পরিমাণে বেড়ে যায় তা থেকে নির্গত জৈব পদার্থ ও এসিড মাটির অম্লত্ব বাড়ায়। আজকাল পলিথিনের ব্যাগ ও প্লাস্টিকের জিনিসপত্র বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। এগুলো এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরি যা মাটিতে পচে না। এ কারণেও মাটি দূষিত হয়ে উর্বরাশক্তি হারাতে পারে। জমিতে মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ মাটি দূষণের অন্যতম কারণ।

গাছপালা ও খাদ্যশস্যের ওপর আমরা বিশেষভাবে নির্ভরশীল। মাটি দূষিত হলে গাছপালা ভাল জন্মে না এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদন ব্যাহত হয়। তাই মাটিকে দূষণমুক্ত রাখা আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

পরিবেশের বায়ু, পানি ও মাটি আমাদের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য। এ মূল্যবান সম্পদগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও দূষণমুক্ত রাখা আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য। পরিবেশ দূষণ কমাতে হলে নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা দরকার।

(১) দূষণ সম্পর্কে অজ্ঞতা ও দায়িত্ববোধের অভাবই পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ। সুতরাং জনসংখ্যা সীমিতরাখার জন্য জনগণকে শিক্ষিত ও সচেতন করতে হবে।

(২) খোলা জায়গায় এবং যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ না করে পায়খানা ব্যবহার করতে হবে।

(৩) ঘর বাড়ির ময়লা আবর্জনা ও খাদ্যদ্রব্যের উচ্ছিষ্ট যেখানে সেখানে না ফেলে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে মাটির গর্তে ফেলে মাটি চাপা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) শিল্প কারখানার পরিকল্পনা এমনভাবে করতে হবে যাতে পরিবেশ দূষণ কম হয়। কারখানার ধোঁয়া বাতাসে ছড়াবার পূর্বেই রাসায়নিকভাবে দূষণমুক্ত করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিতে হবে। দূষণ সংক্রান্ত আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

(৫) পলিথিনের পরিবর্তে পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।

(৬) মোটর গাড়ি ও নৌযানের ইঞ্জিন ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে যেন বিষাক্ত গ্যাস ও তেল নির্গত হয়ে বায়ু ও পানি দূষিত না হয়।

(৭) কীটনাশক ওষুধ, রাসায়নিক সারের ব্যবহার যথোপযুক্ত এবং পরিমিত হতে হবে।

(৮) ধূমপান বন্ধ করতে হবে এবং ধূমপানের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করতে হবে।

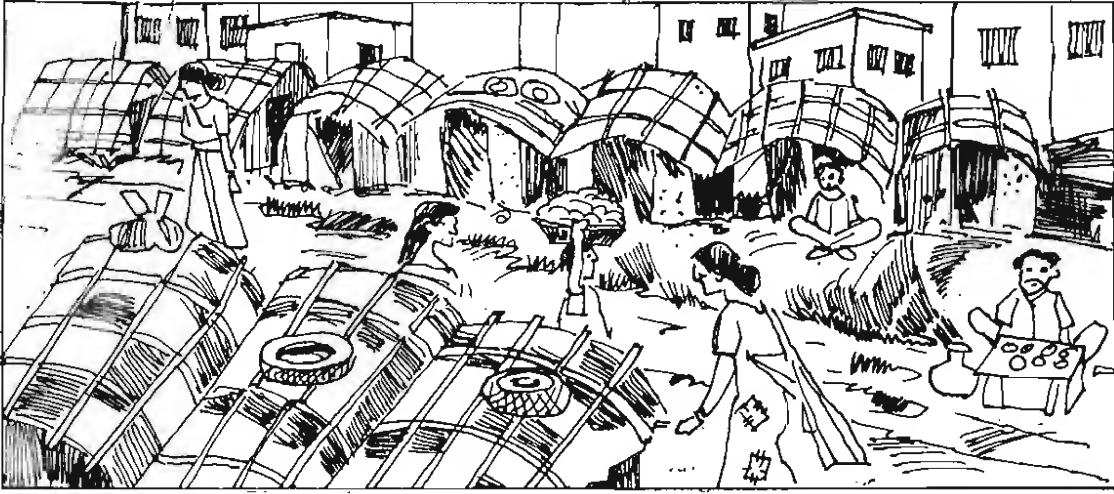
(৯) সর্বোপরি জনসংখ্যা সীমিত রাখার জন্য জনগণকে সচেতন করতে হবে।

ঘনবসতি ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ

আমাদের দেশে উন্নত দেশগুলোর মতো বড় বড় শহর নেই। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও নারায়ণগঞ্জ ছাড়া অন্য শহরগুলো এখনও তেমন বড় হয়নি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আজকাল পল্লী অঞ্চলে জীবিকা ও জীবনধারণের সুযোগ

সুবিধার বড়ই অভাব। কাজের খোঁজে গ্রাম থেকে বহু লোক এসব শহরগুলোতে ভিড় করছে। ফলে শহরে বাসস্থানের সমস্যাটি দিনদিন প্রকট হয়ে ওঠছে। বাসস্থানের জন্য লোকজন তখন অপরিকল্পিতভাবে যেখানে-সেখানে ঘরবাড়ি তৈরি করছে। ফলে শহরের আনাচে-কানাচে নোংরা বস্তু গড়ে ওঠছে। এ সব বস্তুতে লোকজন ঠাসাঠাসি করে বাস করে। প্রয়োজনীয় আলোবাতাস এ সব ঘরে প্রবেশ করতে পারে না। এ সব বস্তুতে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকে না বললেই চলে। তাই লোকজন যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করে। নিষ্কাশনের অব্যবস্থার জন্য আবর্জনা ও মলমূত্র স্থানে স্থানে জমে পচতে থাকে। বর্ষার পানি, বায়ু ও জীবজন্তুর মাধ্যমে এ সকল পচা গলা আবর্জনা নানাভাবে পানির সাথে মিশে পানি দূষিত করে তোলে। এ দূষিত পানি ব্যবহারের ফলে, বস্তুবাসীরা নানা রকমের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়।

শহরে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি একদিকে যেমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে অন্যদিকে তেমনি নানা প্রকার সামাজিক সমস্যারও জন্ম দেয়। বিশেষ করে কর্মসংস্থানের সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। বেকারত্বের অভিশাপ যুবকদের হতাশ ও অশান্ত করে তোলে।



চিত্র ২৩.৪ : শহরের একটি নোংরা বস্তু

সুস্থ সবল ও শিক্ষিত জনগণই একটি দেশের উন্নতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। সুস্থ খাদ্য ও বিশুদ্ধ খাবার পানির সরবরাহ, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা এবং চিত্তবিনোদনের সুযোগ সুবিধা মানুষকে সুস্থ ও কর্মক্ষম করে গড়ে তোলে। সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি হওয়ার জন্য আমাদের দেশে কার্যকরভাবে এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। দেশের লোকসংখ্যা যাতে অপরিকল্পিতভাবে বৃদ্ধি না পায় সে বিষয়ে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।

কোনো দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেল অথচ সে তুলনায় সম্পদ না বাড়লে নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়। জনসংখ্যার এ সব সমস্যা বুঝতে হলে এবং কার্যকর সমাধান করতে হলে আমাদেরকে জনসংখ্যা বিষয়ে ভালোভাবে জানতে হবে, জনমিতি কী? জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ কী ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা দরকার। নিচে জনমিতির কয়েকটি সাধারণ বিষয়ে ধারণা লাভের জন্য সেগুলো সহজ ভাষায় বর্ণনা করা হল।

জনমিতির ধারণা

কোনো দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি জন্মহার, মৃত্যুহার এবং দেশান্তর এ তিনটির ওপর নির্ভর করে। জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্যাবলি ও সমস্যা ভালোভাবে জানতে হলে জনমিতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা প্রয়োজন। জনমিতির কাজ হল, জনসংখ্যার গঠন, খনত্ব, জন্মহার, মৃত্যুহার ইত্যাদির পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

জন্মহার ও মৃত্যুহার : তোমরা লক্ষ করে থাকবে কোনো এলাকায় একদিকে যেমন শিশুর জন্ম হয় অপরদিকে তেমনই নানা বয়সের লোকের মৃত্যু ঘটে। একটি শিশুর জন্মের অর্থ হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপর দিকে যে কোনো লোকের মৃত্যুর অর্থ হল জনসংখ্যা হ্রাস।

কোনো একটি এলাকায় বছরে যে কয়টি জীবিত শিশু জন্মলাভ করে যদি সেই সংখ্যক লোকের মৃত্যু ঘটে তাহলে সে স্থানের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না। কিন্তু একটি এলাকায় যে কয়জন লোক মৃত্যুবরণ করে তার চেয়ে জন্মসংখ্যা যদি বেশি হয় তা হলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া না পাওয়া অবশ্য আরো দুইটি অবস্থার ওপর নির্ভর করে। তাহল বহির্গমন ও বহিরাগমন।

বহির্গমনের ফলে একটি দেশের জনসংখ্যা হ্রাস পায়, আবার বাইরে থেকে আগমনের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আমাদের দেশে সাধারণত যে কারণে জনসংখ্যা বাড়ছে তা হল জন্মহার ও মৃত্যুহারের ব্যবধান। জনমিতির সখুল জন্মহার, সখুল মৃত্যুহার, স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার, নির্ভরশীলতার অনুপাত ইত্যাদি সূত্রের সাহায্যে কীভাবে নির্ণয় করা যায় তা নিচে উল্লেখ করা হল।

সখুল জন্মহার : কোনো বছরে কোনো দেশে প্রতি হাজার লোকের মধ্যে যে সংখ্যক জীবন্ত শিশু জন্মগ্রহণ করে সেটাই সে দেশের সখুল জন্মহার।

$$\text{সূত্র :} \quad \text{সখুল জন্মহার} = \frac{\text{এক বছরে জীবন্ত জন্মগ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা}}{\text{বছরের মধ্য সময়ের মোট জনসংখ্যা}} \times 1000$$

উদাহরণ : মনে করি একটি গ্রামে এক বছরে ৯৬ জন জীবিত শিশু জন্মগ্রহণ করল। ঐ গ্রামে বছরের মাঝামাঝি সময়ে লোকসংখ্যা ছিল ২০০০ জন। তাহলে ঐ গ্রামের সখুল জন্মহার কত?

$$\begin{aligned} \text{সূত্র অনুসারে, সখুল জন্মহার} &= \frac{৯৬}{২০০০} \times 1000 \\ &= \frac{৯৬}{২} \\ &= ৪৮ \text{ জন (প্রতি হাজারে)} \end{aligned}$$

সখুল মৃত্যুহার : কোনো বছরে কোনো দেশে প্রতি হাজারে সকল বয়সের যত সংখ্যক লোক মারা যায় সেটাই সে দেশের সখুল মৃত্যুহার।

$$\text{সূত্র :} \quad \text{সখুল মৃত্যুহার} = \frac{\text{এক বছরে সকল বয়সের মৃত্যুবরণকারী লোকের সংখ্যা}}{\text{বছরের মধ্য সময়ের মোট জনসংখ্যা}} \times 1000$$

উদাহরণ : মনে করি একটি গ্রামে এক বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে ৪৮ জন লোক। আর বছরের মধ্য সময়ে লোকসংখ্যা ছিল ২০০০ জন। তাহলে ঐ গ্রামের সখুল মৃত্যুহার কত?

$$\begin{aligned} \text{সূত্র অনুসারে, সখুল মৃত্যুহার} &= \frac{৪৮}{২০০০} \times 1000 \\ &= \frac{৪৮}{২} \\ &= ২৪ \text{ জন (প্রতি হাজারে)} \end{aligned}$$

জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার

সখুল জন্মহার থেকে সখুল মৃত্যুহার বিয়োগ করলে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার পাওয়া যাবে। এ বৃদ্ধির হার সাধারণত জনসংখ্যার বার্ষিক শতকরা হার হিসেবে প্রকাশ করা হয়। তাই এ বৃদ্ধির হারকে শতকরায় প্রকাশ করতে হলে ১০ দিয়ে ভাগ করতে হয়। (অর্থাৎ ১০০০ কে ১০ দিয়ে ভাগ করে ১০০ তে বা শতকরায় প্রকাশ করা হয়)।

*বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার ১.৪৮।

$$\text{সূত্র : স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার} = \frac{\text{স্থূল জন্মহার} - \text{স্থূল মৃত্যুহার}}{১০}$$

উপরে উল্লিখিত উদাহরণ দুটিতে স্থূল জন্মহার ৪৮ জন এবং স্থূল মৃত্যুহার ২৪ জন। অতএব সে গ্রামের জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার = $\frac{৪৮ - ২৪}{১০} = \frac{২৪}{১০} = ২.৪$

নির্ভরশীলতার অনুপাত

সাধারণত ১৫ বছরের নিচের ছেলেমেয়ে উপার্জন করতে পারে না। এ বয়সের ছেলেমেয়েদের তাই অন্যের উপর নির্ভরশীল ধরা হয়। একই ভাবে ৬৪ বছরের বেশি বয়সের লোকদেরকে নির্ভরশীল ধরা হয়। কারণ এ বয়সে সাধারণত মানুষ উপার্জনক্ষম থাকে না। কিংবা তাদের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সের জনসংখ্যাকে কর্মক্ষম জনসংখ্যা বলে। এদের উপার্জনের ওপর ১৫ বছরের নিম্ন বয়সের ছেলেমেয়ে ও ৬৪ বছরের উর্ধ্ব বয়সের লোকদেরকে নির্ভরশীল ধরা হয়। নিচের সূত্রের সাহায্যে একটি দেশের বা অঞ্চলের নির্ভরশীলতার অনুপাত নির্ণয় করা যায়।

$$\text{সূত্র : নির্ভরশীলতার অনুপাত} = \frac{১৫ বছরের নিম্ন বয়সের জনসংখ্যা + ৬৪ বছরের উর্ধ্ব বয়সের জনসংখ্যা}{১৫ বছর থেকে ৬৪ বছর বয়সের জনসংখ্যা} \times ১০০$$

উদাহরণ : কোন দেশে ১৫ বছরের নিম্ন বয়সের ছেলেমেয়ে দেশের মোট জনসংখ্যার ৪৩% এবং ৬৪+ বয়সের লোকসংখ্যা ৩%। সেই দেশের নির্ভরশীলতার অনুপাত কত ?

$$\text{সমাধান : উপার্জনক্ষম লোকসংখ্যা} = ১০০ (৪৩+৩) = ১০০ \cdot ৪৬ = ৫৪$$

$$\begin{aligned} \text{সূত্র অনুসারে, নির্ভরশীলতার অনুপাত} &= \frac{৪৩+৩}{৫৪} \times ১০০ \\ &= \frac{৪৬}{৫৪} \times ১০০ \\ &= ৮৫\% \text{ (প্রায়)} \end{aligned}$$

এ অনুপাতে ভগ্নাংশ পরিহার করার জন্য তাকে শতকরায় প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ একশত জন কর্মক্ষম লোকের ওপর ৮৫ জন নির্ভরশীল।

প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল

একটি শিশু জন্ম গ্রহণের পর সে কত বছর বাঁচবে অর্থাৎ তার আয়ু কত হবে তা আমরা বলতে পারি না। কিন্তু তার আয়ুষ্কাল সম্পর্কে আমরা একটা প্রত্যাশা করতে পারি। এক বছরের মধ্যে কোনো দেশে যত লোক মারা যায় তাদের জীবনকাল গণনা করে গড়ে তারা কত বছর বেঁচে ছিল তা আমরা বের করতে পারি। এ গড় বয়সই হল সে সময়ের জন্য ঐ দেশের লোকের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল। এ প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল পরিবর্তনশীল। জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে এ কাল বেড়ে যায়। আর কোন দেশের জনসংখ্যার সীমিত রাখাই হল জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের পূর্বশর্ত। বাংলাদেশে নারী ও পুরুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল ৬০.৮ বছর*।

* আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট, আগস্ট, ২০০১ বিবিএস,

* বাংলাদেশ এ্যাট এ গ্লান্স, মে ২০০১, বিবিএস।

সার সংক্ষেপ

পরিবেশ দূষণ: আমরা পরিবেশের মধ্যে বসবাস করি। অপ্রয়োজনীয় বা ক্ষতিকর কোনো জিনিস ত্যাগ করলে পরিবেশ দূষিত হয়। যে প্রক্রিয়ায় আমরা পরিবেশকে ক্ষতি করে থাকি তাকে পরিবেশ দূষণ বলে।

বায়ু দূষণ : কলকারখানা ও মোটরগাড়ির নির্গত কালো ধোঁয়া, বর্জ্য পদার্থ, ঘরবাড়ির উচ্ছিষ্ট, মলমূত্র, পয়ঃপ্রণালী, পচা ডোবা ও আবর্জনা, রোগীর হাঁচি কাশি ইত্যাদি বায়ু দূষণের কারণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অতিরিক্ত জনগণের চাহিদা মেটাতে গিয়ে বায়ু দূষণ বাড়ছে।

পানি দূষণ : জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাড়তি লোকের জন্য অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন প্রয়োজন। এজন্য জমিতে পানি সেচ দিতে হয়, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ওষুধ ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়। এ সবের ব্যবহার পানি দূষণের অন্যতম কারণ। পানিতে ময়লা, আবর্জনা, জীবজন্তুর মৃতদেহ ইত্যাদি ফেললেও পানি দূষিত হয়।

মাটি দূষণ : যে যে কারণে পানি দূষিত হয় সাধারণত সে সব কারণে মাটিও দূষিত হয়। অতিরিক্ত আবর্জনা, বর্জ্য পদার্থ, পলিথিন ও প্লাস্টিক সামগ্রী নিষ্ক্ষেপ এবং মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার, কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ মাটি দূষণের অন্যতম কারণ।

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ : জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে অপরিষ্কৃতভাবে যেখানে সেখানে ঘরবাড়ি তৈরি ও নোংরা বসতি গড়ে উঠে। এ সব স্থানে লোকজন ঠাসাঠাসি করে বসবাস করে এবং বসতিতে প্রয়োজনীয় আলো বাতাস পায় না, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থাও থাকে না। এ ধরনের পরিবেশকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বলে।

জনমিতি : যে বিষয়ে জনসংখ্যার গঠন, ঘনত্ব, জন্মহার, মৃত্যুহার ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায় তাকে সাধারণভাবে জনমিতি বলে।

জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ : কোনো দেশ বা অঞ্চলের জনসংখ্যার জন্মহার, মৃত্যুহার এবং দেশান্তর এ তিনটি কারণে হ্রাস বৃদ্ধি হয়ে থাকে।

স্থূল জন্মহার : কোনো বছরে কোন দেশে প্রতি হাজার লোকের মধ্যে যে সংখ্যক জীবন্ত শিশু জন্মগ্রহণ করে সেই সংখ্যাকে সে দেশের স্থূল জন্মহার বলে।

স্থূল মৃত্যুহার : কোনো বছরে কোন দেশে প্রতি হাজারে সকল বয়সের যে সংখ্যক লোক মারা যায় সেই সংখ্যাকে সে দেশের স্থূল মৃত্যুহার বলে।

জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার : স্থূল জন্মহার থেকে স্থূল মৃত্যুহার বাদ দিলে যে জনসংখ্যা পাওয়া যায় তাকেই জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি হার বলে।

প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল : এক বছরে কোনো দেশে যত লোক মারা যায় তাদের জীবনকাল গণনা করে গড়ে তারা কত বছর বেঁচে ছিল তা নিরূপণ করা হলে সেটি হবে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন যানবাহনটি দ্বারা বায়ু দূষিত হয় না ?
 ক. মোটর গাড়ি
 গ. পানির জাহাজ
 খ. বাইসাইকেল
 ঘ. উড়োজাহাজ
২. আমাদের দেশের জন সংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ
 ক. জন্মহার ও মৃত্যুহারের ব্যবধান
 গ. কেবল জন্মহার বৃদ্ধি
 খ. বহির্গমন
 ঘ. কেবল বহিরাগমন
৩. পানিদূষণের প্রধান কারণ হচ্ছে
 i. রাসায়নিক সার
 ii. জৈব সার
 iii. কীটনাশক

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i
 গ. i ও ii
 খ. ii
 ঘ. i, ii ও iii
৪. $\frac{\text{এক বছরে সকল বয়সের মৃত্যুবরণকারী লোকের সংখ্যা}}{\text{বছরের মধ্য সময়ের মোট জনসংখ্যা}} \times ১০০$

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. স্থূল জন্ম হার
 গ. জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার
 খ. স্থূল মৃত্যুহার
 ঘ. প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল.

সৃজনশীল প্রশ্ন

- ১। প্রথমবারের মত জরিণা লঞ্চে করে ঢাকা সদরঘাটে পৌঁছে দেখল বুড়িগঙ্গার পানি দুর্গন্ধযুক্ত ও কালো। অতঃপর একটি রিকশাযোগে আজিমপুরে তার আত্মীয়ের বাসায় যাত্রা শুরু করল। কিছুদূর রিকশা চলার পর দেখল রিকশা আর চলছে না। সামনে বিরাট গাড়ির লাইন। অনেকগুলো বাস, ট্রাক কালো ধূয়া ও উর্ধ্ব আওয়াজে হর্ণ বাজিয়ে চলছে। জরিণা তার চোখে নাকে এক ধরনের জ্বালাপোড়া অনুভব করল। সে আরও লক্ষ করল রাস্তার পাশে ডাস্টবিনে উপচেপড়া ময়লা পড়ে আছে। কুকুর, কাক ময়লা টানাটানি করছে। মাছি ভন ভন করছে তা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।
 ক. কী কী কারণে পানি দুর্গন্ধযুক্ত ও কালো হয়েছে।
 খ. জরিণার চোখ ও নাকে জ্বালা পোড়া হচ্ছিল কেন?
 গ. জরিণা বেগমের দেখা দৃশ্যগুলোর আলোকে ঢাকা শহরের পরিবেশ সম্পর্কে মতামত দাও।
 ঘ. উপরে বর্ণিত সমস্যার সঙ্গে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা আধিক্যের সম্পর্ক আলোচনা কর।

২. গ্রাম থেকে আগত রহিমা ও কামাল ঢাকায় কমলাপুর রেললাইনের পাশে থাকে। তাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ নোংরা ও ঘিজি, আলো বাতাস কম ও সঁাতসঁতে। তাদের একটি সন্তান জন্মের পরপরই মারা যায়। প্রায়শই তাদের পেটের অসুখ জ্বর ও সর্দি কাশি হয়। বিভিন্ন রোগে শোকে কাজ করার ক্ষমতাও কমে যাচ্ছে তাদের সমস্যাও অনেক।

- ক. রহিমা যে স্থানে থাকে তাকে কী বলা হয় ?
- খ. রহিমা ও কামালের পরিবারের সদস্যরা প্রায়শই রোগে ভোগে কেন ?
- গ. রহিমা বেগমের পরিবার কীভাবে এ ধরনের অবস্থা থেকে মুক্ত হবে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ঢাকায় এভাবে রহিমার জীবন যাপন করার কারণ বিশ্লেষণ কর।

(গ) নিচে এশিয়া মহাদেশের কয়েকটি দেশের ০-১৪ বছর বয়সের এবং ৬৪+ বয়সের লোকসংখ্যা দেওয়া হল। নির্ভরশীলতার অনুপাত নির্ণয় কর।

দেশের নাম	শতকরা হার (০-১৪ বছর)	শতকরা হার (৬৪+ বছর)
১। জাপান	১৭	১৯
২। মালয়েশিয়া	৩৮	৬
৩। নেপাল	৪৩	৫
৪। ভারত	৩৫	৭
৫। পাকিস্তান	৪৪	৫
৬। থাইল্যান্ড	৩১	৭
৭। বাংলাদেশ	৪৫	৫

অতিরিক্ত কাজ

১। শ্রেণীর কিছু সংখ্যক ছাত্র/ ছাত্রীকে গ্রাম / শহরের কয়েকটি বাড়ি জরিপ করতে বলা যেতে পারে। জরিপের ফলাফল লিপিবদ্ধ করে তা থেকে তারা জনবহুল এলাকা চিহ্নিত করবে এবং পরিবেশ দূষণের কারণগুলো (যেমন জনসংখ্যা আধিক্য, মোটরগাড়ির সংখ্যা ও অবস্থা, রাস্তায় আবর্জনার স্তুপ, পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা ইত্যাদি) বলতে পারবে।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

বাংলাদেশের বন্যা, নদীভাঙন ও খরা

ভৌগোলিক অবস্থান

বাংলাদেশ গ্রীষ্মমণ্ডলের উত্তর প্রান্তের কাছাকাছি $20^{\circ}38'$ উত্তর অক্ষরেখা থেকে $26^{\circ}38'$ উত্তর অক্ষরেখা এবং $88^{\circ}01'$ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা থেকে $92^{\circ}81'$ পূর্ব দ্রাঘিমারেখার মধ্যে অবস্থিত। এটি পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম ব দ্বীপ। পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদী দ্বারা প্রবাহিত পলি এ বিশাল ব দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশের আয়তন $1,47,590$ বর্গ কিলোমিটার। এ দেশের উত্তর ও উত্তর পূর্বের অনতি উঁচু পাহাড়ের পর ভারতের অজরাঙ্গাসমূহ অবস্থিত। এর কিছু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে সুউচ্চ হিমালয় পর্বতমালা। উত্তর পূর্বে রয়েছে গারো, খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়পুঞ্জ। দক্ষিণ পূর্বে ও পূর্বে রয়েছে আরাকান ইয়ামা। বঙ্গোপসাগর দক্ষিণে প্রসারিত হয়ে ভারত মহাসাগরে মিলিত হয়েছে। পশ্চিমে রয়েছে ভারতের বিস্তৃত সমতল ভূমি। এরূপ ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য বাংলাদেশের শীতকাল দীর্ঘমেয়াদী নয়। শীতের তীব্রতাও কম। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। হিমালয় পর্বতমালা শীতকালে বাংলাদেশকে সাইবেরীয় হিমপ্রবাহ থেকে রক্ষা করেছে। বর্ষাকালে বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ দিক থেকে জলীয়বাষ্পপূর্ণ বাতাস বয়ে যায়। এ জলীয়বাষ্পপূর্ণ বাতাস ও মেঘমালা হিমালয়, আরাকান ইয়ামা, গারো, খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়পুঞ্জ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে।

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের পাশাপাশি কিছু ব্যতিক্রমী প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ কারণে বাংলাদেশে প্রায়ই ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাস ও বন্যা হয়। এ ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার কারণগুলো নিম্নরূপ :

- ক) বঙ্গোপসাগরের অবতল উপকূল রেখা
- খ) উপকূলবর্তী দক্ষিণে প্রসারিত বিশাল মহীসোপান
- গ) চট্টগ্রাম উপকূল এলাকায় অন্যান্য এলাকার তুলনায় জোয়ারের অধিক উচ্চতা
- ঘ) দেশের উত্তর অংশ থেকে দক্ষিণ উপকূলের দিকে সমভূমির ক্রমনিম্ন ঢাল
- ঙ) নদীবাহিত পলির নদী গর্ভে অব্যাহত তলানি
- চ) বর্ষাকালে বায়ুপ্রবাহের ফলে উপকূলবর্তী সাগরের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি।

জলবায়ু

বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূপ্রকৃতি নিয়ে গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত বাংলাদেশের জলবায়ু মূলত সমভাবাপন্ন। সমভাবাপন্ন জলবায়ুর জন্য বাংলাদেশে যে আবহাওয়া বিরাজ করে তা হল আবহাওয়ার আনুকূল্য ও আবহাওয়ার প্রতিকূলতা। অনুকূল আবহাওয়া বাংলাদেশের প্রকৃতিকে চির সবুজ, শস্য শ্যামলা রাখে।

আবহাওয়ার প্রতিকূলতা প্রতিবছর আনে দুর্যোগ আর দুর্বিপাক। সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা, কালবৈশাখী টর্নেডো, অতিবৃষ্টি প্রতিকূল আবহাওয়ারই বহিঃপ্রকাশ।

আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের মতে বাংলাদেশে প্রধানত বছরে চারটি মৌসুম বিরাজ করে। এ চার মৌসুম হল প্রাক বর্ষা (মার্চ, এপ্রিল, মে), বর্ষা (জুন, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর), বর্ষা পরবর্তী (অক্টোবর, নভেম্বর) ও শীত (ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি) মৌসুমে। বাংলাদেশের আবহাওয়ার ওপর এর প্রভাব অপরিসীম। মৌসুমী প্রভাবযুক্ত দীর্ঘমেয়াদী সাময়িক আবহাওয়া এ দেশের জলবায়ুর সামগ্রিক রূপ দিয়েছে। তাই বাংলাদেশের জলবায়ুকে ক্রান্তীয় মৌসুমী ভাবাপন্ন বলা চলে।

বাংলাদেশের সব এলাকায় বছরে বৃষ্টিপাত সমান হয় না। তিরিশ বছরের গড় বৃষ্টিপাতের একটি পরিসংখ্যান আছে। সে অনুযায়ী সিলেট এলাকায় বাৎসরিক বৃষ্টিপাত সর্বাধিক। বৃষ্টিপাতের গড় পরিমাণ ৪৫০০ মিলিমিটার। বছরে দ্বিতীয় সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয় কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম এলাকায়। বৃষ্টির গড় পরিমাণ ৩০০০ মিলিমিটার। দেশে বছরে সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাতের স্থান রাজশাহী, পাবনা ও কুষ্টিয়া এলাকা। এ সব এলাকায় বাৎসরিক গড় বৃষ্টির পরিমাণ ১৪০০ মিলিমিটারের কিছু উর্ধ্বে। ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বছরে যে বৃষ্টি হয় তার গড় পরিমাণ প্রায় ২০০০ মিলিমিটার।

বাংলাদেশের সব মৌসুমে সব স্থানে তাপমাত্রা এক রকম থাকে না। তাপমাত্রা প্রাক বর্ষা মৌসুমে সর্বোচ্চ এবং শীত মৌসুমে সর্বনিম্ন থাকে। প্রাক বর্ষাকালে (গ্রীষ্মকালে) দেশের উত্তরাঞ্চল ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৪° ৪৫° এবং অবশিষ্ট অন্যান্য অঞ্চলে ৪১° ৪২° সেলসিয়াসে ওঠে। ১৯৭২ সালের ১৮ মে রাজশাহীতে দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৫.১° সেলসিয়াস ওঠেছিল। শীত মৌসুমে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলে তাপমাত্রা ১৮° ২১° এবং কোনো কোনো সময় সর্বনিম্ন ৪° ৫° সেলসিয়াসে নামে। ১৯৬৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি শ্রীমঙ্গলে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২.৮° সেলসিয়াসে নেমেছিল।

বন্যা

বন্যা কী : পানি বিজ্ঞানীদের মতে নিষ্কাশন পথে ক্ষমতা বহির্ভূত মাত্রার পানি প্রবাহকে বন্যা বলে। বাংলাদেশের উজানে এবং অভ্যন্তরে বর্ষাকালে অতিবৃষ্টি হয়। শাখা নদী বা মূল নদ নদীর অববাহিকা এলাকায় অতিবৃষ্টিপাত হলে পানির চাপ অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। ফলে নদীতে পানির প্রবাহ নদীর ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। দেশ বন্যায় প্রাণিত হয়।

বন্যার প্রকার : বাংলাদেশে চার প্রকার বন্যা সংঘটিত হয়। এগুলো নিম্নরূপ :

- (১) দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলে প্রবাহিত পাহাড়ি নদীতে তাৎক্ষণিক বন্যা,
- (২) প্রবল বর্ষণ ও বর্ষণের পানি প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণজনিত বন্যা,
- (৩) প্রধান নদীসমূহে বর্ষার বৃষ্টিতে সংঘটিত বন্যা এবং
- (৪) উপকূলীয় ও মোহনা এলাকায় ঘূর্ণিঝড়জনিত জলোচ্ছ্বাস বন্যা।

বন্যার কারণ : বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদীসহ মোট ২৩০ টি নদী প্রবাহিত। প্রবাহিত এ সব নদীর মধ্যে মূলত প্রধান তিনটি নদী পদ্মা, যমুনা, মেঘনার অববাহিকা এলাকায় বর্ষার ভারি বৃষ্টিপাত বন্যার প্রধান কারণ। সারা দেশে বছরে যে বৃষ্টিপাত হয় তার শতকরা ৮০ ভাগ ঘটে জুন সেপ্টেম্বর এ চার মাসে। নদী তিনটির অববাহিকা অঞ্চলের মোট আয়তন ১৬,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার যার মাত্র শতকরা ৭.৫ ভাগ বাংলাদেশে অবস্থিত। এ বিশাল অববাহিকা এলাকার বর্ষার পানি বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদী হয়ে বঙ্গোপসাগরে মেশে। এ কারণে বর্ষার মাসগুলোয় বাংলাদেশে কখনও বৃষ্টি কম হলেও অববাহিকা অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে বাংলাদেশে বন্যা হয়ে থাকে। ১৯৯৮ সালের বন্যায় এমনটি ঘটেছিল। বাংলাদেশে বন্যা মাঝারি, ভয়াবহ ও সর্বনাশা রূপ ধারণ করে। সাধারণত মাঝারি, ভয়াবহ, সর্বনাশা বন্যার আবর্তন কাল যথাক্রমে ৩, ৪, ৬ ও ৩০-৩৫ বছরে হয়ে থাকে।

অববাহিকা অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ছাড়াও বাংলাদেশের বন্যার পানি উচ্চতা বাড়াতে আরো কিছু বিষয় ভূমিকা রাখে। এ বিষয়গুলো হল :

- (১) বর্ষার বৃষ্টিপাতে হিমালয় পর্বতমালায় বরফগলা পানির পরিমাণ বৃদ্ধি,
- (২) প্রতি বছর নদীবাহিত প্রচুর পরিমাণ পলি জমায় নদীর গভীরতা হ্রাস,
- (৩) সীমান্তের ওপারে পাহাড়ী এলাকার বনাঞ্চল উজাড়,
- (৪) সড়ক, মহাসড়ক, রেলপথ, বাঁধ, বেড়িবাঁধ ইত্যাদি নির্মাণের কারণে পানির স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি এবং বর্ষাকালে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমে বায়ুর ক্রমাগত প্রবাহের কারণে বঙ্গোপসাগরে উপকূলের কাছাকাছি পানির স্বাভাবিক গড় উচ্চতা বৃদ্ধি।

সংঘটিত সর্বনাশা বন্যা : বাংলাদেশে মাত্র কয়েক বছর আগে ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালে পর পর দুই বছর সর্বনাশা বন্যা সংঘটিত হয়েছে। ১৯৮৮ সালের বন্যা ছিল সর্বনাশা ও ইতিহাস সৃষ্টিকারী। এ বন্যা আগস্ট মাসের প্রায় শেষ হতে শুরু হয়ে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ৬০টি জেলা জুড়ে ১,২০, ৯৭৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়। বন্যায় আক্রান্ত লোকের সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৬৭ লক্ষ এবং মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ২,৩২৯ জন।

১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত হয় শতাব্দীর ভয়াবহতম বন্যা। প্রায় তিন মাস ব্যাপী দীর্ঘস্থায়ী এ বন্যায় দেশের দুই তৃতীয়াংশ এলাকা প্লাবিত হয়। এটি শতাব্দীর সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী বন্যা। বড় বড় নদ নদীগুলোর পানির উচ্চতা পূর্বের রেকর্ড ছাড়িয়ে যায়। মহাপ্রলয়জ্ঞকারী এ বন্যায় সহস্রাধিক লোকের প্রাণহানি ঘটে এবং ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, পুল সেতু, শস্য, চাষাবাদ ও অন্যান্য বিষয় সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। স্মরণাতীতকালের ভয়াবহ এ বন্যা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে ও অবকাঠামোর ওপর মারাত্মক আঘাত হানে।

বন্যা সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা : ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে প্রতিবছর বাংলাদেশের শতকরা ৩৫ ভাগ এলাকা স্বাভাবিক বন্যায় প্লাবিত হয়। আবহমানকাল হতে এ দেশের মানুষ বন্যাকে সঙ্গে নিয়ে বেঁচে আছে।

উন্নয়নের বর্তমান পর্যায়ে বন্যাকে বন্ধ করা বা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তবে আমরা স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদী প্রস্তুতি অবলম্বন করতে পারি। এর ফলে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে অনেকাংশে রক্ষা করা যেতে পারে। এ সব উপায় নিচে উল্লেখ করা হল।

ক) প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো জোরদারকরণ :

যে সব প্রাতিষ্ঠান প্রাকৃতিক দুর্যোগ চিহ্নিত করে এবং পূর্বাভাস দেয় সেগুলোকে জোরদার করা,

উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতির উন্নতি করা,

আধুনিক নির্ভরযোগ্য উপাত্ত ভান্ডার গড়ে তোলা।

খ) বন্যা নিয়ন্ত্রণে কাঠামোগত কৌশল অবলম্বন :

সামগ্রিক বন্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে একাধিক জলাধার নির্মাণ করা,

ড্রেজিং বা নদী খননের মাধ্যমে নদী গর্ভের গভীরতা বৃদ্ধি করে প্রধান নদীসমূহের পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ানো,

বেড়িবাঁধ নির্মাণ।

বন্যা মোকাবিলায় করণীয় : বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বন্যাপূর্ব, বন্যাকালীন ও বন্যা পরবর্তী সময়ে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাাদি গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।

বন্যাপূর্ব সময়ে —

ক) উঁচু জায়গায় বাড়ি নির্মাণ করা,

খ) নদী তীরবর্তী এলাকায় বেড়িবাঁধের বাইরে বাড়ি নির্মাণ না করা,

গ) বন্যার পানির তোড়ে ভিটে বাড়ির ক্ষয়ক্ষতি কমাতে বাড়ির আশেপাশে বেশি করে গাছপালা রোপণ করা,

ঘ) মাটি দিয়ে তৈরি বাড়ির চারপাশে ঘন ঘন বাঁশ অথবা শক্ত কাঠের ঘের দিয়ে রাখা,

ঙ) বন্যার পানিতে যাতে না ডুবে এমন স্থানে টিউবওয়েল স্থাপন করা,

চ) বন্যায় আক্রান্ত হলে কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে অথবা গবাদি পশু বা মূল্যবান মালপত্র স্থানান্তর প্রয়োজন হবে তা পূর্বেই ঠিক করে রাখা,

ছ) বন্যার মাসগুলোয় বাড়িতে মুড়ি, চিড়া, গুড় ইত্যাদি শুকনো খাবার কিছু পরিমাণে মজুদ রাখা,

জ) নৌকা থাকলে ব্যবহারযোগ্য রাখা,

ঝ) এলাকাস্থ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি/ স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা।

বন্যা কালে-

- ক) বন্যার সময় ঐর্ষ না হারিয়ে চিন্তা ভাবনা করে প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা,
- খ) বন্যায় বাড়িঘর ডুবে গেলে নিকটস্থ কোন উঁচু স্থানে/ বাঁধে / আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করা,
- গ) আশ্রয় গ্রহণ করার পূর্বে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পলিথিনে মুড়ে ঘরের চালের নিচে পাটাতনে রাখার ব্যবস্থা করা,
- ঘ) বন্যায় যাতায়াতের জন্য নৌকা না থাকলে কলা গাছের ভেলা প্রস্তুত করা,
- ঙ) টিউবওয়েলের পানি অথবা পানি ফুটিয়ে পান করা। তা সম্ভব না হলে পানিতে বিশুদ্ধকরণ বড়ি অথবা ফিটকিরি ব্যবহার করা,
- চ) বন্যার সময় সাপ ঘরে না ঢুকতে পারে এ জন্য সাবধানতার সঙ্গে ঘরে রক্ষিত কার্বলিক এসিডের বোতলের ছিপি খুলে রাখা,
- ছ) যে সব শিশু সাঁতার জানে না তাদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা,
- জ) বন্যার সময় রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটবার পূর্বেই প্রতিষেধক টিকা/ ইনজেকশন গ্রহণ করা,
- ঝ) বন্যাকবলিত গ্রামের নিরাপত্তার জন্য এলাকাস্থ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা।

বন্যা পরবর্তী সময়ে-

- ক) বন্যার পানি নেমে যাওয়া মাত্র নিজ বাড়িতে ফিরে যাওয়া ও ঘরবাড়ি বাসযোগ্য করা,
- খ) নিজ জমি চাষাবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করা,
- গ) রোগে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে বন্যার পর পরই প্রতিষেধক টিকা/ ইনজেকশন দেওয়া,
- ঘ) ঘরবাড়ি পুনঃ নির্মাণে সাহায্যের জন্য সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।

নদীভাঙন

বাংলাদেশের জনজীবনে নদীর ভূমিকা অপরিসীম। শত শত বছর ধরে মাছ ধরা, কৃষিকাজ, যাতায়াত এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য অর্থাৎ জীবিকার জন্য এ দেশে মানুষের কর্মকান্ড নদীকে অবলম্বন করে পরিচালিত হয়েছে। ফলে অন্যান্য স্থানের তুলনায় নদীতীরে ব্যাপক জনগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের জনজীবনে নদী যেমন অপরিসীম উপকারে আসছে যুগ যুগ ধরে, তেমনি এগুলো থেকে উদ্ভূত সমস্যাও কম নয়। বাংলাদেশের জন্য নদীভাঙন এক বড় সমস্যা। ১৯৭০ হতে ১৯৯০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে কমপক্ষে ৭০ লক্ষ মানুষ নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাংলাদেশে নদী তীরের প্রায় ১৩০টি স্থানে নদীভাঙন ঘটে থাকে। এতে প্রতি বছর কয়েক লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় মারাত্মক বিঘ্ন ঘটে।

নদীভাঙনের কারণ ও ভাঙন এলাকাসমূহ : বাংলাদেশ পাললিক মাটি দ্বারা গঠিত। এ কারণে নদীর গতিশীলতা নদী ভাঙনের প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। পদ্মা, যমুনা ও মেঘনাসহ ৭৫টি নদীতে নিয়মিত নদী ভাঙন ঘটে। নদী তীরে অবস্থিত গ্রাম, গঞ্জ ও শহর সব সময় নদী ভাঙনের হুমকির সম্মুখীন থাকে। যমুনা ও মেঘনা তীরের ভাঙন সর্বাধিক। যমুনা ও মেঘনার ক্রমাগত ভাঙনে যথাক্রমে সিরাজগঞ্জ ও চাঁদপুর জেলা শহর দুইটি বিপদাপন্ন। বড় শিলাখণ্ড ও কংক্রিটের চাপ নদীতে নিক্ষেপ করেও শহর দুইটিকে রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে প্রশস্ত নদীতে বেশি ভাঙন ঘটে। ১৯৮৩-৮৪, ১৯৮৪-৮৫ ও ১৯৮৫-৮৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশের মোট ৪৬২টি উপজেলার মধ্যে যথাক্রমে ৯৪, ৮৫ ও ৫৫টি থানা নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ সব ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমূহ হল বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বাগেরহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বগুড়া, জামালপুর, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, মাদারীপুর, লক্ষ্মীপুর, রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও চাঁদপুর।

ভাঙন রোধের উপায় : বিভিন্ন উপায়ে নদীভাঙন রোধ করা সম্ভব। এ উপায়সমূহ হল :

- ক) নদীর তীর জুড়ে বেড়িবাঁধ নির্মাণ করা,
- খ) নদীর তীরে প্রচুর সংখ্যক বড় শিলাখণ্ড ও কংক্রিটের চাপ নিক্ষেপ করা,
- গ) নদীর তীরে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ করা।

খরা

কোনো এলাকায় পানির অস্বাভাবিক চাহিদার ফলে, বৃষ্টিপাতের দীর্ঘস্থায়ী স্বল্পতা হেতু অথবা কোনো উৎস থেকে পানির প্রয়োজনীয় সরবরাহ না থাকায় যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে খরা বলা যেতে পারে। সাধারণভাবে খরা বলতে যা বুঝায় তা হল প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম কারণে বায়ুমণ্ডলে প্রয়োজনীয় আর্দ্রতার অভাবে সংঘটিত দীর্ঘস্থায়ী বৃষ্টিহীন আবহাওয়া অবস্থা।

খরার কারণ ও প্রকৃতি : মৌসুমী বায়ুর আগে ও পরে অর্থাৎ প্রাক-বর্ষা ও বর্ষা পরবর্তী মৌসুমে বৃষ্টিপাতের দীর্ঘস্থায়ীত্বের অভাবে বাংলাদেশে খরা দেখা দেয়। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উচ্চ চাপ বলয়ের প্রভাবে এ দেশে খরার কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যে বছর এ উচ্চ চাপ বলয়ের তীব্রতা বেশি হয় এবং তার প্রভাব বাংলাদেশ ও কাছাকাছি এলাকা হয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ও দীর্ঘস্থায়ী হয় সে বছর বাংলাদেশ খরা কবলিত হয়।

বাংলাদেশে স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদী খরা হয়ে থাকে। এ ধরনের খরা প্রধানত কৃষি কাজে বিঘ্ন ঘটায়। স্বাভাবিকের চেয়ে সাম্প্রতিক বৃষ্টিপাতের অভাব বা কমতি ২৫-৫০ শতাংশ হলে মাঝারি খরা এবং ৫০ শতাংশের বেশি হলে তীব্র খরা বলা হয়।

খরার প্রতিক্রিয়া : বাংলাদেশে খরার প্রতিক্রিয়া কোনো কোনো বছর ভয়াবহ আকার ধারণ করে। মাঠ ঘাট, খাল বিল, পুকুর, নালা শুকিয়ে যায়। ফলে কৃষিকাজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, মারাত্মক খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য খাবার সংস্থান করতে দেশের উন্নয়ন বাজেটের অর্থ দিয়ে বিদেশ হতে সরকারকে জরুরি ভিত্তিতে খাবার আমদানি করতে হয়। খাদ্য আমদানি কোনো কারণে বিলম্বিত হলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বাংলাদেশে পৃথিবীর অনেক দেশের মতো খরা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এ দেশে খরা অনিয়মিত ও অমেয়াদী। সারা বাংলাদেশ একই সময় খরা কবলিত হয় না। ১৯৫৭ ও ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশে যে বড় ধরনের খরা হয়েছিল তাতে দেশের যথাক্রমে ৪৬.৫৪ শতাংশ এলাকা ও ৫৩.০৩ শতাংশ মানুষ এবং ৪২.০৪ শতাংশ এলাকা ও ৪৩.৯০ শতাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

খরা প্রতিরোধে করণীয় : খরা প্রতিরোধের জন্য রাষ্ট্র, অঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলিক দীর্ঘমেয়াদী ও তাৎক্ষণিক পরিকল্পনার প্রয়োজন। কর্মপরিকল্পনায় যে সব করণীয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে সেগুলো নিম্নরূপ :

- ক) ব্যাপক বনায়ন,
- খ) বন উজাড় বন্ধকরণ,
- গ) মজা পুকুর খনন ও পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ,
- ঘ) পানির অপচয় রোধ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বন্যা কী ?

ক. বরফ গলা পানি প্রবাহ	খ. বর্ষার আকাশে প্রচুর মেঘের আনাগোনা
গ. নদীর ধারণক্ষমতা বহির্ভূত ও পানি প্রবাহ	ঘ. প্রচুর বৃষ্টিপাত
২. যমুনা নদীতীরে নদীভাঙন বেশি কারণ
 - i. নদীগর্ভে অব্যাহত তলানি
 - ii. এ নদীর গভীরতা বেশি
 - iii. এ নদী সর্বাধিক প্রশস্ত

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|--------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i, ii ও iii |
৩. বাংলাদেশে খরার প্রধান কারণ বিবেচিত
 - i. উপকূলবর্তী দক্ষিণে প্রসারিত বিশাল মহীসোপান
 - ii. গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উচ্চচাপ বলয়ের প্রভাব
 - iii. জীবাস্থ জ্বালানির ব্যাপক ব্যবহার

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|---------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i এবং ii | ঘ. ii এবং iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ নদী মাতৃক দেশ। পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা নদীসহ মোট ২৩০টি নদী এদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবস্থা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর এ সব নদীর প্রভাব অতিগুরুত্বপূর্ণ। বর্ষা মৌসুমে এ নদী বাহিত পানি স্বাভাবিক বন্যা ঘটালে ও কোনো কোনো বছর বন্যা ভয়াবহ ও সর্বনাশা রূপ ধারণ করে। এতে আমাদের নানাবিধ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

ক. বন্যা কী ?	খ. বাংলাদেশে বন্যার একটি প্রধান কারণ ব্যাখ্যা কর।
গ. সাম্প্রতিক কালের ভয়াবহ বন্যায় তোমার এলাকার কী কী ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি কর।	ঘ. বাংলাদেশে নদীর প্রভাব আলোচনা কর।

২. জামালদের বাড়ি মানিকগঞ্জের হরিরামপুর উপজেলার পদ্মা নদী তীরবর্তী একটি গ্রামে। তাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ হওয়ায় সে বিদ্যালয়ের বেতন পরিশোধ করতে পারে না কিন্তু বাবার নিকট শুনছে তাদের আর্থিক অবস্থা এরূপ ছিল না। দশ বার বছর পূর্বেও তার বাবা ছিল ধনী কৃষক। তার বাবার অনেক আবাদী জমি ছিল এবং তাতে অনেক ফসল ফলাত। কিন্তু বর্তমানে তাদের সে আবাদী জমি আর নেই। এর কারণ নদী ভাঙন।

ক. বাংলাদেশে কতটি নদীতে নিয়মিত নদী ভাঙন ঘটে।

খ. নদী ভাঙনের একটি কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. জামালদের বর্তমান অবস্থার জন্য কেন নদী ভাঙন দায়ী, বর্ণনা কর।

ঘ. বন্যার অপকারিতা লিখ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

এইডস

বর্তমান বিশ্বে এইডস এমন একটি ব্যাধি যার কারণে সমগ্র মানবসভ্যতা এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশেও এইডস মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। তাই, এইডস সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই জানা প্রয়োজন। ইংরেজি Acquired Immune Deficiency Syndrome শব্দগুলোর প্রত্যেকটির প্রথম অক্ষর নিয়ে এইডস (AIDS) শব্দটি গঠিত হয়েছে। এটি এক ধরনের ভাইরাসজনিত রোগ। এই ভাইরাসটির নাম এইচআইভি যার পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি রূপ হল Human Immunodeficiency Virus (HIV)।

HIV এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে

H	Human	মানুষ
I	Immunodeficiency	শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাব
V	Virus	ভাইরাস

অর্থাৎ, যে ভাইরাস মানুষের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয় তাই এইচআইভি।

AIDS এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে

A	Acquired	অর্জিত বা অন্যের কাছ থেকে পাওয়া
I	Immune	শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা
D	Deficiency	ঘাটতি বা অভাব
S	Syndrome	উপসর্গ বা লক্ষণসমূহ

অর্থাৎ, এইডস হল এইচআইভি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের এমন একটি অবস্থা যাতে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আস্তে আস্তে কমে যায় এবং এক পর্যায়ে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়।

এইচআইভি একটি অতি ক্ষুদ্র বিশেষ ধরনের ভাইরাস যার কারণে মানুষ এইডস এ আক্রান্ত হয়। এ ভাইরাস কয়েকটি উপায়ে মানবদেহে প্রবেশ করে দেহের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দেয়। আক্রান্ত ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এক পর্যায়ে অতিরিক্ত হ্রাস পায়। এইচআইভি সংক্রমণের এই সর্বশেষ পর্যায় হল এইডস। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণে এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি অতি সহজেই অন্য যে কোনো রোগে আক্রান্ত হয়। এইডস এর কোনো কার্যকর প্রতিষেধক এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তাই, মৃত্যুই এইডস রোগীর অনিবার্য পরিণতি। এ জন্যই এইডসকে ঘাতকব্যাধি বা মরণব্যাধি বলা হয়।

এইচআইভি বিভিন্নভাবে মানবদেহে সংক্রমিত হতে পারে। যেমন :

- ১) এইচআইভি সংক্রমিত রক্ত গ্রহণের মাধ্যমে
- ২) একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক ইন্জেকশনের একই সূচ ও সিরিঞ্জ ব্যবহার, অপারেশনের কাজে সংক্রমিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার বা সংক্রমিত অঙ্গ (কিডনি, কর্নিয়া ইত্যাদি) প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে
- ৩) এইচআইভি সংক্রমিত মায়ের দুধ পানের মাধ্যমে।

বায়ু, পানি, খাদ্য অথবা সাধারণ ছোঁয়ায় বা স্পর্শে এইচআইভি ছড়ায় না। এইচআইভি কোনো কোনো উপায়ে সংক্রমিত হয় না এ বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা দেওয়ার জন্য উপায়গুলো নিচে উল্লেখ করা হল :

- ১) এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তি বা এইডস রোগীর সেবা করলে
- ২) তার সাথে একঘরে বসবাস করলে
- ৩) তার বিছানা ব্যবহার করলে
- ৪) তার হাঁচি বা কাশি থেকে
- ৫) তার জামা কাপড় পরলে
- ৬) তাকে স্পর্শ করলে
- ৭) তার সাথে করমর্দন, কোলাকুলি করলে বা এক সঙ্গে খেলাধুলা করলে
- ৮) তার ব্যবহৃত পায়খানা/প্রস্রাবখানা ব্যবহার করলে
- ৯) তার থালা বাসন ব্যবহার করলে
- ১০) তার সাথে একত্রে খাওয়া দাওয়া করলে এবং একই পুকুরে বা একই বাথরুমে গোসল করলে
- ১১) মশা বা অন্য কোনো পোকা মাকড়ের কামড়ে।

যেসব উপায়ে এইচআইভি/এইডস ছড়ায় না তা নিচে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো :



আমাদের দেশে এইডস এখনো ভয়াবহ রূপ না নিলেও বিভিন্ন কারণে অচিরেই এটি মহামারীর আকার ধারণ করতে পারে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। বাংলাদেশেও কিছু লোক এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছে। এইডস এর বিস্তার রোধ করার লক্ষ্যে আত্মসচেতনতা সৃষ্টি করা দরকার।

এ আত্মসচেতনতা বলতে বোঝায়

- নিজের শরীর সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও সচেতনতা
- এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও সচেতনতা
- নিজ অধিকার (সামাজিক ও অর্থনৈতিক) সম্পর্কে সচেতনতা
- নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান
- নিজের শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতনতা
- কিসে নিজের ভালো হয় ও ক্ষতি হয় সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা
- সঠিক বন্ধু/ভালো বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে সচেতনতা।

শিক্ষার্থীদের করণীয় :

তোমার কাছাকাছি বয়সের ভাইবোন / আত্মীয় স্বজন / পাড়া প্রতিবেশীদেরকে (অন্তত পাঁচজন) এইচআইভি/এইডস বিষয়টি জানাবে। আত্মসচেতনতার যে কোন দিক নিয়ে আলোচনা করবে। তারা কি বলে তা শুনবে এবং এ বিষয়ে প্রতিবেদন লিখবে ও শ্রেণীতে উপস্থাপন করবে।

উপরের বিষয়গুলোতে আমরা সচেতনতা অর্জন করব। এর ফলে আমরা এইডস এ আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা পাব। এ সম্পর্কে অন্যদেরও জানাবো। আমরা সকলে সচেতন হলেই সুন্দর সমাজ গড়ে উঠবে।

আমাদের আরও মনে রাখতে হবে যে, ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি নিষেধ মেনে চললে এইডস মহামারী থেকে দেশকে অনেকাংশে রক্ষা করা সম্ভব।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি AIDS এর পূর্ণ রূপ।
 - ক. Acquired Immune Deficiency Syndrome
 - খ. Acquired Deficiency Syndrome
 - গ. Acquired Immuno Deficiency Symptom
 - ঘ. Acquired Immuno Deficit Syndrome.
২. HIV পূর্ণ রূপ
 - ক. Human influennza virus
 - খ. Human immunodeficit virus
 - গ. Human Induced virus
 - ঘ. Human immunodeficiency virus
৩. এইচআইভি/এইডস ছড়ায়
 - ক. বায়ুর মাধ্যমে
 - খ. এইডস রোগীর বিছানা ব্যবহারের মাধ্যমে
 - গ. খাদ্যের মাধ্যমে
 - ঘ. এইচআইভি সংক্রমিত রক্ত গ্রহণের মাধ্যমে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রিমার বয়স ১৬। বেশ কয়েক বছর আগে দুর্ঘটনা জনিত কারণে শারীরিক চিকিৎসার জন্য অসচেতনতাবশত অপরিচিত এক ব্যক্তির কাছ থেকে তাকে রক্ত দেওয়া হয়েছিল। ইদানীং সে প্রায়ই অসুস্থ থাকে। পাতলা পায়খানা জ্বর লেগেই থাকে। দেহের ওজন হ্রাস পাচ্ছে। ডাক্তারের কাছে গেলে রক্ত পরীক্ষা করতে বললেন। রিপোর্ট দেখে ডাক্তার রিমার মাকে বললেন তার মেয়ে এইচআইভি পজেটিভ দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দিলেন।
 - ক. এইচআইভি কি ?
 - খ. উক্ত ভাইরাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।
 - গ. ডাক্তার রিমাকে কেনো দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি হতে পরামর্শ দিলেন ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. এইচ আইভি/এইডস-এর বিস্তার রোধে কি কি বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার।



সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন কর
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিনয়ীকে সবাই পছন্দ করে



২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য